হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

অথবা

প্রাণিবিজ্ঞানের একটি নূতন দিক এবং তৎসহ ভারতে ও য়ুরোপে ঐ
বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস ও উহার উৎপত্তির তুলনামূলক আলোচনা

পঞ্চানন ঘোষাল এম্, এস-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

পাঁচ টাকা

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক—১৩৬৪

To

Prof, J. B. S. Haldane

WITH BEST REGARD

FROM

A DEVOTED DISCIPLE

IN INDIA

পঞ্চাননবাবুর

—অন্যান্য গ্রন্থ—

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম হইতে ৮ম খণ্ড।

প্রতি খণ্ড—৪৲

—উপন্যাস—

তুই পক্ষ	২·৫০
মুণ্ডহীন দেহ	৩৲
অন্ধকারের দেশে	৩·৫০

ভূমিকা

গ্রন্থকার শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম, এস-সি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। আজ তিনি পুলিশ বিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারীর সব দায়িত্ব বহন করেও, তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁর বিরাট গবেষণা-গ্রন্থ "অপরাধ-বিজ্ঞান" ৮ম-খণ্ডে প্রকাশ ক'রেছেন। মানুষের রুগ্ন-প্রকৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে তিনি তাঁর ছাত্রাবস্থার প্রিয় গবেষণা প্রয়োগ করেছেন আর এক অভিনব ক্ষেত্রে; সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপে জান্‌লাম এই গ্রন্থও তিন-খণ্ডে ছাপা হবে: জীবতত্ত্ব (Zoology), উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) এবং অধুনা মুদ্রিত "হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান"। তা'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি শুধু নয়, তাঁর এ গ্রন্থ আমার মত অনেককেই আনন্দ ও চিন্তার খোরাক জোগাবে জেনে সে বিষয়ে কিছু লিখছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০২-১৯০৮ সালের মধ্যে তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ History of Hindu Chemistry (Vol. I and II) প্রকাশ করে সমগ্র জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেছেন। সেই উপলক্ষে এবং তাঁরই প্ররোচনায়, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর Hindu Positive Sciences প্রকাশ করেন। কিন্তু এ-সব গ্রন্থে 'প্রাণী-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ অবদান বিষয়ে আলোচনা কমই হয়েছে; অথচ এই ক্ষেত্রেই তাঁদের কৃতিত্ব হয়ত চরমতম। কারণ বৈদিক যুগের বৈজ্ঞানিক ধন্বন্তরি থেকে সুরু করে চরক, সুশ্রুত, বাগভট প্রভৃতি কত "প্রাণাচার্য্য"দের নাম ও তাঁদের রচিত সূত্র,

শাস্ত্র ও কারিকাদি এতকালের ধ্বংসের পরেও সুরক্ষিত হয়েছে। বৈদিক যজ্ঞে পশু-বলি নিয়ে বিতর্ক অনেক হয়েছে—কিন্তু শারীরিক-বিজ্ঞানের (Anatomy) উদ্ভব সেই যজ্ঞ থেকেই। যজ্ঞের প্রতিবাদ প্রধানত এসেছিল জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে। কিন্তু জৈন তীর্থঙ্করদের প্রেরণায় উমাস্বতি ও হংসদেব প্রভৃতি জৈন পণ্ডিতগণ—দেহ ও মন সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে গেছেন। ভগবান বুদ্ধের জীবে দয়া অমর রূপ লাভ করেছে "জাতকে"। চিকিৎসক "জীবক" এক বিরাট প্রাণাচার্য্য ছিলেন এবং তার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসারও মাধ্যমে (শুধু শাস্ত্রের সাহায্যে নয়)। তাই ২৩ শতাব্দী পূর্ব্বে সম্রাট অশোকের ধর্ম্ম-লিপিতেই অকাট্য সাক্ষ্য পাই যে, তাঁর নির্দ্দেশে সযত্নে "গুল্ম-বৃক্ষাদি রোপন" ও "পশু-চিকিৎসার" সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করতে হবে। তাই মধ্য-এশিয়া ও চীন জাপানে পাই "ভৈষজ্য-গুরু"র মূর্ত্তি ও পূজা; সুদূর ইন্দোচীনে চম্পা ও কাম্বোজের শিলালিপিতে 'বৈদ্যক শাস্ত্র' ও 'আরোগ্যশালা'র (হাসপাতাল) উল্লেখ পাই। আবার বিশ্ববিজয়ী Alexander থেকে সুরু করে বোগদাদের খালিফ্‌রা পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাভরে হিন্দুদের প্রাণ-বিজ্ঞান ও ঔষধাদির সমাদর করেছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের খণ্ডিত অনুবাদ গ্রীক্, ফার্সি ও আরবী, চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল (History of Chemistry in—Ancient and Mediaeval India (১৯৫৬ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু বৈদিক-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যে আয়ুর্ব্বেদ তা'র মূল বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র "প্রাণী-বিজ্ঞান" গেল কোথায়? এই কঠিন প্রশ্ন, ঘোষাল মহাশয়কে উতলা করেছিল। তাই তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের অনেকদিন এরই সন্ধানে নিয়োজিত করেছেন, এবং তাঁ'র ফলও যে

পেয়েছেন সেটি আমরা তাঁর প্রাঞ্জল গ্রন্থখানি পড়ে অনুভব করেছি।
প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এক জার্মান পণ্ডিত প্রশ্ন তোলেন—চাণক্য-নীতিকারের মূল গ্রন্থ গেল কোথায়? হঠাৎ মহীশূর গ্রন্থাগারিক, পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী, কৌটিল্য-চাণক্য প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" আবিষ্কার করেন এবং এযাবৎ শতাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে অমূল্য সেই হিন্দুদের "অর্থ-শাস্ত্র" বিষয়ে। তেমনি ঘোষাল মহাশয়ের "প্রাণী-বিজ্ঞান" পাঠ করে বহু গবেষক এ ক্ষেত্রে কাজে নামবেন এই আশা রেখে তাঁর সৎ সাহসের প্রশংসা করি।

Aristotle (৩৮৪—১২২ খ্রী পূঃ)-এর ন্যায় চরক ও সুশ্রুত 'হৃৎ-পিণ্ডকে'ই প্রাণের অবস্থান বা কেন্দ্রস্থল ভেবেছিলেন। কিন্তু তাদের চেয়ে বহু প্রাচীন ঋষি পতঞ্জলির শিষ্য, ভারতীয় যোগিগণ, "মস্তিষ্ক"কেই প্রাণসত্তার কেন্দ্র বলে গেছেন। সাংখ্য-যোগ ও লোকায়ত এই তিনটি হিন্দু-দর্শনই প্রাচীনতম শাখা; পরে ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসার (বা বেদান্ত) বিকাশ হয়। সাংখ্য ও যোগের প্রভাব বৌদ্ধধর্ম্মেও সুস্পষ্ট, অর্থাৎ ২৫০০ বছরের আগেই সুনির্দ্দিষ্ট গবেষণা ও সূত্রশাস্ত্রাদির' রচনা সুরু হয়েছে। সেকালের গ্রন্থাদি এবং চরক-সুশ্রুত-বাগভটাদির আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মন্থন করে গ্রন্থাকার পুরাণের বিক্ষিপ্ত অংশে, বিশেষ ভাগবত-পুরাণে বহু অমূল্য তথ্য পেয়েছেন (গ্রন্থ-পঞ্জী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এসব তাৎপর্য্য তিনি পরিস্ফুট করতে পারতেন না, যদি একাগ্রভাবে পাশ্চাত্য প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন তিনি না করতেন। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় সাধন করে' তিনি এক্ষেত্রে 'পথিকৃৎ' উপাধি অর্জ্জন করেছেন। ভারতের বাইরে বহু দেশের পণ্ডিতগণ হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের সমাদর করবেন তাই একটি ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করুন।

জগৎ (Cosmos) সৃষ্টি (সংস্কৃত ভাষাবিদগণের মতে) গতি-প্রবাহ থেকে। কিন্তু প্রাণহীন (Azoic) জগতে প্রাণের আবির্ভাব কি করে হল ? এ নিয়ে বাদানুবাদের শেষ নেই। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে Darwin বিবর্ত্তন (Evolution) বিষয়ে যা কিছু বলেছেন তা'র রদবদল অনেক হয়েছে ; এবং ঘোষাল মহাশয় দেখিয়েছেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতের সঙ্গে হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের অনেক মিল দেখা যায়। তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়—'হিন্দু সৃষ্টিক্রম ও ইভোলিউসন' পাঠকদের বিশেষভাবে পড়তে অনুরোধ করি। সৃষ্টিক্রমের মতবাদ ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ এবং হিন্দু মতে 'সৃষ্টি পর্য্যায়' নিয়ে আলোচনা তিনি করেছেন বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক পদ্ধতিতে। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি নক্‌সা-চিত্রাদির সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন ; ফলে সাধারণ মানুষও এই দুরূহ বিষয়গুলি বুঝতে পারবে।

প্রাণী সম্পর্কীয় বীক্ষণাগার (Laboratory) যন্ত্রপাতি (যথা lense ইত্যাদি) ভারতে ছিল কি না—এ আলোচনা করতে গিয়ে দু'হাজার বছরের প্রাচীন লেখক Plinyর লাটিন বই থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, Spherical (বৃত্ত) ও oval (বর্ত্তুল) lense সেকালে ভারতে পাওয়া যেত এবং ঐ যুগে Plinyর মতে ভারতেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কাচ নির্মিত হত। এক মাত্র সুশ্রুত তন্ত্রেই এত রকমের যন্ত্রাদির নাম ও ব্যবহার আছে যে আজও বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন যোগ শাস্ত্র ও তন্ত্রের প্রভাবে শুধু মানসিক ও আধ্যাত্মিক নয়, পরন্তু শরীর-বিজ্ঞানের বিপুল বিস্তার ভারতে হয়েছিল—মধ্যযুগের পুরাণ-তন্ত্রাদি তার সাক্ষ্য বহন করছে (এ বিষয়ে আচার্য্য শীলের ও আচার্য্য রায়ের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

শুধু মানব-পরিবারে নয় জীবমাত্রে মনের প্রভাব দেখা যায় ; সুতরাং

জীবদিগের মানসিক বিভাগ প্রথম ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ও প্রচারিত হয়েছিল; এটি প্রমাণ করতে গ্রন্থকার ২০০ পৃষ্ঠা নিয়োগ করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে।

জীবগণ স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও কর্ম্মবেদী ইত্যাদি পর্য্যায়ে বিভক্ত। তারপর সর্প-বিদ্যা, কীট-বিদ্যা ও কৃমি-বিদ্যার বিকাশ সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সন্ধান করে গ্রন্থকার পেয়েছেন। অথর্ব্ববেদ প্রণেতাগণ যজ্ঞে নিহত পশুদের পাকস্থলী প্রভৃতির মধ্যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ কৃমির সন্ধান পান, তাই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কর্ত্তব্য বৈদিক থেকে সুরু করে আয়ুর্ব্বেদ ও পুরাণ-তন্ত্রাদির গ্রন্থ আধুনিক দৃষ্টিতে পাঠ করা উচিত। শুধু জীব-তত্ত্ব ও শরীর গঠন নয়, দেহের পোষণ সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। রক্তশুদ্ধি ও রক্ত পরিক্রম বিষয়ে গবেষণা হিন্দু বৈদ্যক শাস্ত্রে উঠেছে Harvey (1578-1667) blood circulation তত্ত্বের বহুযুগ পূর্ব্বে। অশ্বশাস্ত্র আছে শুক্রনীতি গ্রন্থে ও হস্তী-বিদ্যায় ভারতই অগ্রণী।

এই সব সুপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য বহু পরিশ্রমে উদ্ধার করে জীব-বৈজ্ঞানিক শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল শুধু বাঙালীদের নয় সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই অতি প্রয়োজনীয় গবেষণা-ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগতি শুভ ও সার্থক হোক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ
এম্-এ., ডি. লিট্ (প্যারিস)
কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটির
ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক
ও
মহর্ষি চরক জয়ন্তীর সদস্য

কোজাগরী পূর্ণিমা
১৩৬৪

পরিচিতি

আমার এই পুস্তকটির (থিসিসটির) আমি নাম দিয়াছি "হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান"। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রাণী-বিজ্ঞান হিন্দু বা অহিন্দু কিরূপে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান নহে। সব দিক হইতে বিচার করিলে আমার এই থিসিসের নিম্নোক্তরূপ নামকরণ করা উচিত ছিল,—

প্রাণী-বিজ্ঞানের একটি নূতন দিক এবং তৎসহ ভারতে ও য়ুরোপে সৃষ্ট ঐ বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস ও উহার উৎপত্তির তুলনামূলক আলোচনা—

A New aspect of zoolgy with a comparative study of its true history and developement in India and Europe.

এইখানে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতে ও য়ুরোপে উদ্ভূত প্রাণী-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা। এইরূপ আলোচনার জন্য য়ুরোপে উদ্ভূত প্রাণী-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু মাল-মশলা য়ুরোপীয়-গণ কর্তৃক বহুদিন হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের হিন্দু মনীষিগণও যে প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বহু তথ্যের স্রষ্টা ছিলেন তাহা পৃথিবীর পণ্ডিতদের নিকট অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে। এইজন্য সর্বপ্রথম আমাকে বহু অনুসন্ধানের দ্বারা হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান যে ছিল তাহা প্রমাণ করিতে হইয়াছে। বহু আয়াসে এই দুরূহ কার্য সমাধা করার পর তবে আমি উহার সহিত য়ুরোপে উদ্ভূত প্রাণী-বিজ্ঞানের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানে এমন

বহু তথ্য আছে যাহা আজও পর্যন্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখেন নি। এইজন্য প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণের অর্জিত জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণের জন্য আমাকে কয়েকটি যন্ত্র পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষান্তে এমন কয়েকটি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাকে জুসজীর কয়েকটি নূতন দিক বলা যাইতে পারে। তবে এই সকল যান্ত্রিক পরীক্ষার বিশদ ফলাফল এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি লিপিবদ্ধ করি নাই। উহা একটি পৃথক থিসিসের বিষয়বস্তু রূপে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দু মতামতের যৌক্তিকতা বুঝাইবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকু পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে প্রণালীতে আমি এই উভয় দেশে উদ্ভূত প্রাণী-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছি তাহা আজও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নূতন। উপরন্তু বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া বর্তমানে চালু প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বহু পাশ্চাত্য মতবাদ আমি খণ্ডন করিয়া নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে হিন্দুস্থানের নিজস্ব প্রাণী-বিজ্ঞানের আবিষ্কারই আমার এই থিসিসের অন্যতম অবদান। প্রকৃতপক্ষে প্রাণী-বিজ্ঞান হিন্দুস্থানে (হিন্দ্) সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এইজন্যই এই পুস্তকটির আমি নামকরণ করিয়াছি "হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান।" এতদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা বিবিধ ধর্মাবলম্বী হইলেও জাতিতে উহারা সকলেই হিন্দ্। এই দিক হইতে বিচার করিলে এই পুস্তকটির নাম হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান রাখিয়া আমি কোনও অন্যায় করি নাই।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল সূচীপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ের কোনটি আমার আবিষ্কার এবং কোনটি বা অপর পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি, তাহা মূল পুস্তকেই বিবৃত করা হইয়াছে।

এই স্থলে উহাদের পুনরুল্লেখ আমি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তবে এ-কথা ঠিক যে আমার এই অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দভাণ্ডার মথিত করার মত যথেষ্ট সময় আমার কোনও দিনই ছিল না, তবে আমি এই পুস্তকে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। আমি আশা করি একদিন মৎ নির্দেশিত পথে গবেষণা করিয়া তাঁহারা আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন। পৃথিবীর প্রাণী-বিজ্ঞানের ক্রম-উৎপত্তির ইতিহাসের উপরই অধিক লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তকটি আমি রচনা করিয়াছি। এজন্য পর্যাপ্ত মালমশলা সংগ্রহ করা সত্ত্বেও প্রাণী-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে আমি অধিক আলোচনা করিনি। উহাদের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা আমি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সমাধা করিব। যে সকল প্রাচীন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও পুঁথি এবং তৎসহ যে সকল য়ুরোপীয় পুস্তকের সাহায্য আমি আমার এই থিসিস্ রচনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি উহাদের নাম আমি পৃথকভাবে পুস্তকের শেষে গ্রন্থ-পঞ্জিতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এই সম্পর্কে আমি আরও বলিতে চাই, যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক ও আখ্যান ভাগ আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রাণী-বিদ্যার ইতিহাস আলোচনার জন্য প্রয়োজন মাত্র সেই শ্লোকগুলিই এই পুস্তকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাকি শ্লোক-গুলি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন অস্থিক ও নীরস্থিক জীবদিগের বহিঃ ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ বিবরণ দিবার জন্য ব্যবহার করা হইবে।

এক্ষণে কি ভাবে আমি হিন্দু জুলজীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম সেই সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে করি। আমি নিজে কলিকাতা ইউনিভারসিটি

হইতে জুলজীতে কৃতিত্বের সহিত M. Sc. পাশ করি। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল গবেষণা কার্যেও নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাকে শাসন বিভাগীয় কর্মকৃত্যে নিযুক্ত হইতে হয়। কিন্তু আমার সম্মুখে শাসন বিভাগীয় প্রাক্তন ইংরাজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আদর্শ সর্বদা জাগরূক ছিল। এই সকল মহান ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই উপমহাদেশের যে যে অঞ্চলে কর্মবহাল হইয়াছেন, শাসন-কার্যের সহিত তাঁহারা সেই সেই দেশের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ ও জীবজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় জ্ঞানেরও উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁদের কর্তব্যকর্মের কোনও হানি ত হয় নি, বরং উহা তাঁরা আরও সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতায় আসীন না থাকিলে অত সহজে অত মালমশলা তাঁহারা কখনই সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। টড্ সাহেব রাজস্থানের পলিটি-ক্যাল এজেন্টের পদে নিযুক্ত না হইলে রাজস্থানের ইতিহাস হয়তো আজও পর্যন্ত অজ্ঞাতই থাকিত। প্রথম জীবনে মিঃ ডে I. C. S. বাংলাদেশের একজন জিলা হাকিমরূপে নিযুক্ত হন, কিন্তু শাসনকার্যের সহিত তিনি স্থানীয় জীব-জন্তুর স্পেশিমেনও সংগ্রহ করিতে থাকেন। নিম্ন স্তন্যপায়ী কয়েকটি জীব যে তখনও এদেশে বর্তমান ছিল, তা তিনি জিলায় জিলায় সফর করিয়া অবগত হইয়াছিলেন, এইজন্য পরবর্তীকালে জুলজী সার্ভেতে আসিয়া তিনি ভারতীয় ফণা (Fauna) সম্পর্কীয় বিরাট প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করিতেপারিয়াছিলেন। এদেশে য়ুরোপীয় পুলিশ সাহেবদেরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই এদেশের স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতিদের ইতিহাস সংগ্রহ এবং তৎসহ পদচিহ্ন ও টিপচিহ্ন শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কার এই দেশে হইতে পারিয়াছিল। এই সম্পর্কে বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ও পালি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় ভাষার পুনরুদ্ধার ও

উহাদের সঙ্কলনের উল্লেখ এক্ষণে আমি করিতে চাই না। বস্তুতঃপক্ষে লাট সাহেব হইতে সুরু করিয়া সামান্য চৌকিদারের পর্যন্ত এই বিষয়ে যথেষ্ট করিবার ছিল, আছেও। প্রমাণস্বরূপ বীরভূম জিলার দুইজন দফাদারের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 'কণ্ঠ-কোকিল' নামক দুর্দান্ত স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিটিকে ইহারাই আবিষ্কার করিয়া উহাদের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বলাবাহুল্য ঐ সকল ইংরাজ রাজপুরুষের বিজ্ঞান চর্চা ও কতিপয় অনুরূপ ভারতীয় রাজপুরুষের সাহিত্য চর্চার কথা আমি কোনও দিনই ভুলিনি। বিশেষরূপে আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষালের (মাসতুত) ভ্রাতা রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় C. I. Eর আদর্শ আমার সম্মুখে ছিল। তাঁহাদের মহান আদর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া আমার দুরূহ কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুযোগ পাইয়াছি তখনই গবেষণা কার্যে লিপ্ত থাকিয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় এই সকল গবেষণার কার্যে কোনও মাইক্রোসকোপ বা বিবিধ যন্ত্রপাতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই সম্পর্কে একমাত্র প্রয়োজন ছিল প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। এই গবেষণা আমি আরম্ভ করি আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভে ১৯৩৩ সালে—নিঃসাড়ে ও নিঃশব্দে। প্রথমতঃ আমি প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এবং ডাঃ সুহৃৎ মিত্র M. A. Ph. D. প্রভৃতি মহোদয়দের উপদেশ অনুসারে শত শত অপরাধীদের পর্যালোচনা করিয়া অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণা সুরু করি। কারণ এই বিশেষ গবেষণার সুযোগ আমাদের ন্যায় বাহিরের অন্য কাহারও ছিল না। কুলজীর ন্যায় এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজীতেও গ্রাজুয়েট হওয়ায় এই কার্যে আমার আরও সুবিধা হয়। [পরবর্তীকালে আমি আমার গবেষণার ফল আটটি খণ্ড সম্বলিত 'অপরাধ-বিজ্ঞান' শীর্ষক

পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।] কিন্তু এই সময় আমার চিন্তা আসে অপরাধ-বিজ্ঞানের সাথে সাথে প্রাণী-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও প্রকার গবেষণা করা যায় কি না? কলিকাতায় কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে এক ইতিহাস ব্যতীত প্রাণী-বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিষয়ের চর্চা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ আমি বিশ্বাস করিতাম, যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার প্রতি আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। অনাগত বংশধরদের করণীয় কার্য কিছু আগাইয়া না রাখা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও বটে। আমাদের একজন ইংরাজ প্রফেসারের কথা আমার প্রায় মনে পড়িত—"দেখ তোমাদের দেশে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা সমাপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাত্র শিক্ষা সুরু হইয়া থাকে।" যে সময় এই সকল চিন্তা আমার মনে উদয় হইতেছিল, ঠিক সেই সময় আমাকে শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি বহু-পুরাতন বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে হয়। তল্লাসীতে আপত্তিজনক কিছু না পাওয়া গেলেও ঐ বাটীর দালানের আড়ার উপর আমি বহু পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি দেখিতে পাই। ঐগুলি নামাইয়া উহাদের মধ্যে কিছু লুকানো আছে কিনা আমি দেখিতেছিলাম। ইহার পর কৌতূহলপরবশ হইয়া ঐ পুঁথিগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় চিত্তাকর্ষক কয়েকটি শ্লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বলাবাহুল্য, পরে অবসরমত আসিয়া ঐখানকার সবকয়টি প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রয়োজনীয় বহু শ্লোক আমি সংগ্রহ করিয়া লই। ইহার পর একটি তদন্তব্যপদেশে গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ঠাকুর এবং তৎ শিষ্য অনন্ত দেবের সহিত আমার প্রগাঢ়রূপ আলাপের সুযোগ ঘটে। ইঁহারা দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতদের লিখিত

বৈষ্ণব দর্শন ও ভাগবত সম্পর্কীয় বহু সংস্কৃত ভাষ্য সংগ্রহ করিতে আমাকে সাহায্য করেন। অপর কয়েকটি তদন্তব্যপদেশে আমার সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্র-শিষ্য সারদেশ্বরি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা গৌরীমাতা এবং ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দজীর সহিত আলাপ হয়। ইঁহারাও গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদের ন্যায় আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের আশ্রম হইতে আমি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হস্তলিখিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ করি। কিন্তু আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান-চর্চা, ধর্ম-চর্চা নয়। মুহুর্মুহুঃ এই সকল মহাপুরুষেব সংস্পর্শে আসিয়া আমি অনুভব করি যে, আমার মধ্যে অহেতুক ভাবে ধর্মভাবের উদ্রেক হইতেছে। এইরূপ ছোঁয়াচে রোগ হইতে দূরে না থাকিলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যহত হইতে পারে বুঝিযা ডাকিয়া না পাঠাইলে ইহাদের নিকট আমি ইচ্ছা করিয়া আর যাই নি। ইগার পর ইঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া এই কার্যের জন্য আমি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী ও সবস্বতী হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত জানকী পণ্ডিত মহাশয় এবং সাহিত্য পবিষদের পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। কয়েক জন বেপরোয়া গুণ্ডা শ্রেণী ব্যক্তির উৎপীড়ন সম্পর্কীয় তদন্তব্যপদেশে ইঁহাদের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আমাকে সৈনিক শাস্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ই আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছেন। স্বীকার করিতে বাধা নেই যে, ইঁহার নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিতে সাহায্য তো করিয়াছিলেনই, উপরন্তু তাঁহার সাহায্যে কয়েকটি দুরূহ শ্লোকের প্রকৃত অর্থও আমি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।

ইহার পর আমি বৎসরে একবার করিয়া 'ছোট ছুটি' (casual leave) লইয়া ভট্টপল্লী, বারাণসী এবং উড়িষ্যার বহু মঠে বিবিধ পুঁথি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে থাকি। এই সকল স্থানে স্থানীয় পুলিস অফিসারদের সাহায্য লইয়া যাওয়ায় আমার বিশেষ সুবিধা হয়। এমন অনেক ঠাকুরবাড়ীতে আমি গিয়াছি যেখান হইতে বহু গবেষক পণ্ডিত পুঁথি চাহিতে গিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় রক্ষীকুলকে মানুষ এতই ভালবাসে যে আমার পদমর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মাত্র তাঁহারা আমাকে খাতির করিয়া বসাইয়াছেন। কলিকাতার এক ঠাকুরবাড়ীর মালিক এমন একটি পুঁথি আমাকে স্পর্শ করিতে দিয়াছিলেন যে পুঁথিটি (ভাগবত) এতদিন বদ্ধ অবস্থায় সিঁদুর রাগে রঞ্জিত হইয়া কেবল পূজিত হইয়াই আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার লাইব্রেরীগুলি হইতেও আমি বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলাম। এই সকল প্রাচীন পুঁথি ও উহার ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি আলোচনা করিব।

ইহার পর ১৯৪৬ সালের পর হইতে সরকারী কাজকর্মে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় বহুদিন এই সম্পর্কে গবেষণা করা হইয়া উঠে নি। সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত বায়লজিষ্ট হালডেন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া প্রাণী-বিজ্ঞানে হিন্দুদের অবদান সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হরেন রায় Ph. D. এবং অধ্যাপক দুর্গা মুখার্জি আমাকেই তাঁহার কাছে পেশ করেন। আলাপ-আলোচনা কালে তিনি আমাকে বারে বারে এই গবেষণা কার্য শেষ করিবার জন্য উপদেশ দেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, ভারতের বাহিরে ইহার প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এতদ্ব্যতীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী এই নূতন থিসিসের প্রকাশন সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করেন। ইহার পর হইতে উক্ত মনীষীদের উপদেশ অনুযায়ী গবেষণা করিয়া এই পুস্তকটির প্রথম খণ্ডের রচনা আমি শেষ করিলাম। এই সম্বন্ধে কতটা সফল হইয়াছি তাহা এই থিসিসের পরীক্ষকরাই বলিতে পারিবেন।

এই পুস্তকে আমি আরও প্রমাণ করিয়াছি যে, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় যে কোন দুরূহ বিষয় ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় অধিকতর সহজ-বোধ্যরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত আমি আশা করি যে, এই একটিমাত্র পুস্তক পাঠ করিলেই যে কোনও একজন সাধারণ মানুষেরও পক্ষে প্রাণী-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্যকরূপে অর্জন করা সম্ভব। এই থিসিস্‌টি বাংলা ভাষায় লিখিবার আরও একটি কারণ ছিল। প্রতিদিনই ইহা বলা হইয়া থাকে যে, আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা কিংবা হিন্দি ভাষা ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত হইবে। কিন্তু এখন হইতে যদি আমরা মৌলিক রচনাসমূহ বাংলা কিংবা হিন্দি ভাষায় রচনা না করিতে থাকি, তাহা হইলে আগামী বিশ বৎসর ত দূরের কথা একশত বৎসরের মধ্যেও এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব না। এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া ইংরাজী ভাষায় রচনা না করিবার জন্য নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমি ইচ্ছা করিয়াই এই পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনা করিলাম।

এই পুস্তকে সংস্কৃত গ্রন্থাদির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল সন বা তারিখের আমি উল্লেখ করিয়াছি ঐ সকল তারিখ ও সন য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ অবশ্য ঐ সকল তারিখ ও সন আরও বহুদূর পিছাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু আমি অযথা

বিতণ্ডা এড়াইবার জন্য য়ুরোপীয়গণ প্রবর্তিত সনগুলিই এই থিসিস্ সম্পর্কে গ্রহণ করেছি।

এই সম্পর্কে অপর একটি তথ্য সম্বন্ধে বলিয়া রাখা উচিত হইবে, প্রাণী সম্পর্কীয় শ্লোকগুলি সংগ্রহকালে অপরাপর বহু বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পর্কীয় শ্লোকও আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পর্কে আমার সমধিক জ্ঞান না থাকায়, আমি কেবলমাত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ সম্পর্কীয় শ্লোকসমূহই সংগ্রহ করিয়া লই। হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা সমাপ্ত করিবার পর আমি হিন্দু উদ্ভিদ-বিদ্যা রচনা সমাপ্ত করিব। ইতিমধ্যে আমি হিন্দু উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের মধ্যে একখানি আমাদের স্বগ্রাম মাদরাইলের প্রাচীন বাস-ভবন হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এই মূল্যবান পুস্তকখানি প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত। ইহাতে ঔষধাদির জন্য প্রয়োজনীয় বহু সংখ্যক গাছগাছড়ার নাম, আকৃতি ও গুণাগুণ লিপিবদ্ধ আছে, এবং উহাদের লিখনের মধ্যে মধ্যে ঐ সকল উদ্ভিদের পাতার কয়েকটি চিত্রও অঙ্কিত আছে। পুস্তকখানির কতকাংশ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় জায়গীর সম্পর্কীয় প্রাচীন দলিলাদির মধ্যে আমি সন্ধান পাই। এই মূল্যবান উদ্ভিদ সম্পর্কীয় গ্রন্থটি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঘোষাল কর্তৃক সঙ্কলিত বা রচিত হইয়াছিল। আমাদের নিম্নলিখিত বংশতালিকা হইতে সহজেই ঐ পুস্তকের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা
দোলগোবিন্দ ঘোষাল
|
ভূস্বামী

রঘুদেব ঘোষাল
*
অনন্তদেব ঘোষাল
|
রাজা
রামশঙ্কর ঘোষাল
|
কবিরত্ন
রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল
|
দেওয়ান
নবকৃষ্ণ ঘোষাল
*
প্রাণকৃষ্ণ ঘোষাল
ত্রিলোকীসুন্দরী দেবী
|
রায় বাহাদুর
কমলাপতি ঘোষাল
(১৮২০—১৯০৯)
|
রায়সাহেব
কালিসদয় ঘোষাল
*
আশুতোষ ঘোষাল

উপরের তালিকাটি হইতে অনুমান করা যাইবে যে, ঐ পুস্তকখানি ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছে। রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল ছিলেন আমার পিতামহ। তিনি সাহিত্য-সম্রাট রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের মাসতুত ভ্রাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমবাবুরা রঘুদেব ঘোষাল হইতে উৎপন্ন এই ঘোষাল বংশেরই একজন দৌহিত্র সন্তান ছিলেন। এই দুই ব্যক্তির জন্ম ও

মৃত্যুকাল হইতে হিসাব করিয়া রাধাকান্ত ঘোষালের জীবনকাল সম্বন্ধে আমি ঐরূপ একটি হিসাব করিয়া লইয়াছি। এই মূল্যবান পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমি আমার হিন্দু উদ্ভিদ-বিদ্যা পুস্তকে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। আমি শুনিয়াছি যে, রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল লিখিত ও সংগৃহীত বহু পুস্তক একদা আমাদের প্রাচীন বাটীতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রায় পাঁচবিঘার উপর অবস্থিত পুরাতন অট্টালিকাটির বহু অংশ আমাদের শৈশবেই ভূমিস্মাৎ হইয়া যায়। আমার পিতা এবং পিতৃব্যগণ কেন যে ঐ সময় বাড়ীর পুরাতন পুস্তকগুলি রক্ষা করেন নি তা আমাদের নিকট আজ অবোধ্য। আমাদের নিজের বাটী হইতেই এইরূপ একটি পুস্তক উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ার কারণে উৎসাহিত হইয়া আমি এক্ষণে আমাদের স্ব গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অন্যান্য প্রাচীন পরিবারগুলির বাসভবনসমূহে আমার আত্মীয়বর্গ দ্বারা সুবিধামত অনুসন্ধান চালাইতেছি। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি সফলতা লাভও করিয়াছি। কারণ ঐ সময় গৃহ-চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক পরিবারের প্রবীণরাই গাছগাছড়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু না কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান শেষ হইবামাত্র আমি 'হিন্দু উদ্ভিদ-বিদ্যা' সম্পর্কীয় পুস্তকটিও প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে বর্তমান পুস্তকটি উক্ত (অপ্রকাশিত) পুস্তক দুইটির বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্ক রহিত একটি পৃথক থিসিস্ রূপে আমার পরীক্ষকদের নিকট আমি পেশ করিতেছি।

তমসা জ্যোতির্গময়

সূচী

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান

অনেকের ধারণা, প্রাণী-বিজ্ঞান একটি অতি আধুনিক শাস্ত্র ও প্রধানতঃ য়ুরোপীয়গণই ইহার উদ্ভাবক। প্রাণিজগতের সম্যক্ ও ধারাবাহিক পর্যালোচনা মাত্র দুই এক শত বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত, কিন্তু ইহা ভুল। আমাদের দেশের মনীষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই জীবগণের রীতি-নীতি, স্বভাব, গঠন, জননক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তানপালন প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থে, নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, জীবগণের বিভিন্নরূপ শ্রেণী বিভাগও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; জীবগণের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর বীজ বিজ্ঞান ও ভ্রূণশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা নির্ভুল ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে শত সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্যই অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা বহু প্রাণী বিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। কথা ও উপমাচ্ছলে শ্লোকগুলির অবতারণা করা হইলেও উহা হইতে আমরা বহু মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাই। এই

বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি সঙ্কলন করিয়া একত্রিত করিলে উহাই একটি সুচিন্তিত প্রাণী-বিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে পূর্বে শুধু প্রাণী-বিজ্ঞান বলিয়া কোন পুস্তক ছিল কি না? কে বলিতে পারে যে, ছিল না? পূর্বেকার কয়খানি পুস্তকই বা আমরা পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবশতঃ অনেক প্রাচীন পুস্তকই গ্রন্থকীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে কত পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ পুস্তকাগার যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া প্রয়োজনের সময় নিছক ধর্ম ও দর্শনমূলক গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্যবিষয়ক পুস্তকগুলির রক্ষাকল্পে ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ তত সচেষ্ট হন নাই। ফলে দর্শন ও ধর্মপুস্তকগুলির ন্যায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি, বিপর্যয়ের মধ্যে প্রায়ই রক্ষা পায় নাই। কয়েকখানি চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সমুদয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক রক্ষা পায় নাই। যে দুই একখানি আমরা এখন পাইয়া থাকি, তাহাদের বিষয়বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়গুলি এদেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে বহুবিধ সুলিখিত পুস্তক সে যুগে প্রচলিত ছিল। কিরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা চরক ও সুশ্রুত আদি পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সে যুগে বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ মৃত্যুকালে "অমুক বৃক্ষের তলদেশে তাম্র-পেটিকায় আয়ুর্বেদপুস্তকাদি প্রোথিত আছে" বলিয়া তাঁহাদের সন্ততি-দিগকে নির্দেশ দিয়া যাইতেন। রাজ্যবিপ্লবের পর সন্ততিগণ সেই নির্দেশ বা উইল অনুযায়ী পিতা বা পিতামহের মৃত্যুর বহু বৎসর পর সেই সকল পুস্তক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। এইরূপ প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ধর্ম, দর্শন ও চিকিৎসাপুস্তকগুলিই রক্ষিত হইয়াছিল।

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ধর্ম ও দর্শনপুস্তকাদির তুলনায় সে যুগে অল্পপ্রয়োজন বিধায় এই ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অনেক তথ্য বা জ্ঞান আবার এদেশে শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইত। কদাচিৎ উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধুনাপ্রাপ্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে কথাচ্ছলে প্রাণী বিষয়ক তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়, কে বলিতে পারে যে, তাহা কোনও একখানি সুলিখিত তৎকালীন প্রাণী-বিজ্ঞান পুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই? বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শ্লোক কোনও একখানি অধুনালুপ্ত প্রাণী-বিজ্ঞানের পুস্তক হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অনেক সময় একই প্রাণী বিষয়ক শ্লোক বিভিন্ন পুস্তকগুলির মধ্যে সমভাবেই পাইয়া থাকি। এমন কি, কোনও কোনও শ্লোকে উহাদের ভাষা ও শব্দের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি তুলনামূলক শ্লোক বিভিন্ন পুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই বিষ্ণুপুরাণ C ১০০-৪০০ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত বা সঙ্কলিত হইয়াছে।

পরাশর উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
উর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ সতু মানুষঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫ অঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ।
ততোহর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ॥
ততোহর্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গা সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটিতে যে সকল জীব চারিটি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে ও তজ্জনিত তির্ধক্ গতিতে আহারাদি গ্রহণ করে, তাহাদের তির্ধক্ জীব বলা হইয়াছে ও যে সকল জীব সোজা হইয়া চলে ও তাহার ফলে আহারাদি উপর হইতে নিম্নে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অর্বাক্ জীব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শব্দ দুইটি শ্রেণীবাচক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণকার পরাশরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন? দ্বিতীয় শ্লোকটি মার্কণ্ডেয় তাঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিজের নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, গ্রন্থকারদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৎকালীন কোনও একখানি পুস্তকবিশেষ হইতে শ্লোক দুইটি নিজ নিজ গ্রন্থে তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র। আর দুইটি অনুরূপ শ্লোক উক্ত পুস্তক দুইখানি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

পরাশর উবাচ

গৌরজঃ মহিষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫ অঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত সরীসৃপাঃ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়

হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতির খেয়ালে বিভিন্ন যুগে আব-হাওয়া এবং পৃথিবীর (ভূমি) পরিবর্তন ঘটিত এবং তৎজনিত জীব-দিগের স্বভাবেরও পরিবর্তন হইত, এবং এইরূপ পরিবর্তনের কারণে এক জীববংশ হইতে অপর জীববংশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাত্যান্তরবাদ বা সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে কোনও একটি সুলিখিত পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইরূপ মতবাদসম্পর্কীয় একার্থবোধাত্মক একই প্রকার শ্লোক বিবিধ পুস্তকে আমরা পাইয়া থাকি। শ্লোকগুলির ভাব ও ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, অন্য কোনও এক পুস্তক হইতে বিবিধ পুস্তকে উহারা উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত, এই উভয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এই পাতঞ্জল এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যথাক্রমে ২০০ খৃঃ পূঃ এবং ৫০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত বা সঙ্কলিত হইয়াছে।

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদানুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥

পাতঞ্জল

এই সম্পর্কে নিম্নে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ হইতে অপর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। এই শ্লোকের শেষ দুই ছত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে

যে, সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন কবি (এই যুগে বিষয়বস্তুমাত্র কবিতায় লেখা হইত) বিভিন্নরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন। এই শ্লোকে উল্লিখিত "স্বভামেক কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ" বাক্য কয়টি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। উপনিষৎ গ্রন্থগুলি ১২০০—১৫০০ খৃঃ পূর্বকালের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যং।

* * *

স্বভামেক কবয়ো বদন্তি।
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ ॥

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টি ছাড়া বিভিন্ন পুরাণাদি পুস্তক হইতে এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আরও চারিটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে শ্লোক কয়টি লিখিত। উহা পাঠে শত শত বৎসর পূর্বেকার হিন্দুদিগের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে গভীব জ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। শ্লোক কয়টিতে জলজ জীব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থলজ জীবের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়, তাহারও একটা হিসাব দেওযা হইয়াছে। শ্লোক কয়টির রচনা বিভিন্নরূপ হইলেও বক্তব্য বিষয় একই। সময় নির্দেশ ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্লোক-রচয়িতাগণ সম্পূর্ণরূপেই একমত। শ্লোক কয়টিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কথাচ্ছলে বিজ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল পুরাণ গ্রন্থের মধ্যে গরুড়পুরাণ খৃষ্টীয় দশম এবং বিষ্ণুপুরাণাদি ১০০-৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত বা সঙ্কলিত হইয়াছে।

চতুরশীতিলক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চঃ জরায়ুজাঃ॥
একবিংশতিলক্ষাণি হ্যণ্ডজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎপ্রমাণতঃ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্॥

—গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায়

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশলক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

—নিবন্ধধৃতবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

—কর্মবিপাক

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষঃ পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

এইরূপে পুরাণ ও তৎকালীন বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি পাঠে দেখা

যায় যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আখ্যানভাগেই উক্তরূপ একার্থক শ্লোক পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাদের ভাষার মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির দর্শন সম্বন্ধীয় আখ্যানভাগে ভাষা, অর্থ ও ভাবের প্রচুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। দর্শনভাগে তাঁহারা ভিন্নমত হইলেও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোকে তাঁহারা এক মতই প্রকাশ করেন; শব্দগুলিও ব্যবহার করেন এক রকমের। তাহার পর ঐ শ্লোকগুলির লিখনভঙ্গি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্লোকগুলি অধুনালুপ্ত তৎকালীন কোনও বিজ্ঞান পুস্তকে প্রচলিত মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতক বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; কতকগুলি বা হুবহু নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে "পরিকীর্তিতা" শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। তাহার পর ধারাবাহিক ও সুলিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রমাত্রেই কতকগুলি পরিভাষামূলক বা technical বৈজ্ঞানিক শব্দ থাকে। আমাদের প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলিতেও ঐরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, রসজ, স্বেদজ, পোতজ, উদ্ভিজ্জ, ঊর্ধক, অধক, অর্বাক্, ঔদক, সরীসৃপ, একতোদত, উভয়তোদত, একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ, গন্ধবেদী, স্পর্শবেদী, শব্দবেদী কর্মবেদী, রূপবেদী, শফ, নখ, অনস্থিকা, অপাদা, কোশস্থ, চর্মপক্ষ, গণ্ডুপদী, নূপুরক, খড়্গা, শৃঙ্গী, জঙ্ঘাল প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলি যে প্রাণী-বিজ্ঞানের পরিভাষামূলক বা technical শব্দ, তাহাতে কোন ভুল নাই। ঋগ্‌বেদ হইতে পুরাণ এবং উহার পর পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে উক্ত শব্দগুলির সম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে মাত্র কয়েকটি শ্লোকাংশ প্রদত্ত হইল। এই শ্লোকাংশগুলি ঋক্‌বেদ, ভাগবত এবং মনুসংহিতা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বেদ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ; যথাক্রমে ২০০০—১৫০০ খৃ পূঃ এবং ৮০০—৬০০ খৃঃ পূঃ কালে, মতান্তরে বেদ ৪৫০০ খৃঃ পূঃ। সূত্র, মনু, পুরাণ ভাগবতাদি বিবিধ ধর্মশাস্ত্র; যথাক্রমে ৮০০ খৃঃ পূঃ কাল হইতে ৬০০ খৃঃ পর কালের মধ্যে প্রণীত বা সঙ্কলিত হয়।

> যে কে **চোভয়তোদতঃ**—ঋগ্‌বেদ, পুরুষসূক্ত
> রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চো**ভয়তোদতং**—শ্রীমদ্ভাগবত
> পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়**তোদতঃ**।—মনুসংহিতা
> ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাং**শ্চৈকতোদতঃ**॥
>
> মনুসংহিতা, ৫ অঃ

উক্ত উদ্ধৃতি কয়টি যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ (২০০০ খৃঃ পূঃ), ভাগবত (৫০০-৬০০ খৃষ্ট পর) ও মনুসংহিতা (৫০০ খৃঃ পূঃ) হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনখানি গ্রন্থই বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা বিভিন্ন যুগে লিখিত বা সঙ্কলিত হয়। কিন্তু তিনখানি গ্রন্থেই আমরা এই 'উভয়তোদত' ও 'একতোদত' শব্দ দুইটি একই অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানে 'একতোদত' অর্থে যে সকল জীবের একবার করিয়া দাঁত উঠে, তাহাদের বুঝায় ও 'উভয়তোদত' অর্থে যে সকল জীবের দুইবার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুধ-দাঁত পড়িয়া গিয়া তেলা-দাঁত উঠে, তাহাদিগকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। এখন এই শব্দ দুইটির বিভিন্ন গ্রন্থে একই অর্থে উক্তরূপ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই দুইটি শব্দ পরিভাষামূলক বৈজ্ঞানিক শব্দরূপেই তৎকালে ব্যবহৃত হইত। এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রাচুর্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, প্রাণী-বিজ্ঞান বলিয়া একখানি পৃথক বিজ্ঞানশাস্ত্র নিশ্চয়ই আমাদের দেশে পুরাকালে

প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া শাস্ত্রকারগণ নিজ শাস্ত্রে প্রাণী সম্বন্ধীয় শ্লোক-গুলির উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "ইতি কথিতঃ" বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। ইহার কারণ, বোধহয় পুরাকালে অপর কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার গ্রন্থের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিবার প্রথা ছিল না। কিংবা হস্তলিখিত পুঁথিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও কবিতাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই এই রীতির প্রচলন ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পঙ্‌ক্তি কয়টি দাল্‌ভ্য কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি রুরু, কারণ্ডব ও কঙ্কজীব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ যে কোন একখানি অনুক্তনামা (unnamed) পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন। উপরিউক্ত পক্ষী ও হরিণ জীব সম্বন্ধে বিবরণসম্বলিত নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টি অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে কোন্ পুস্তক হইতে পঙ্‌ক্তি কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। দালভ্য ঋষি ১০০-২০০ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

"**কূলেচরমাহ**······রুরুঃ শরদি শৃঙ্গত্যাগী।
তল্লক্ষণং উচ্যতে—বিকটবহুবিষাণঃ শম্বরাকারদেহঃ,
সলিলতটচরিত্বাৎ সঞ্চরেভ্যো বিচিত্রঃ। ত্যজতি
শরদি শৃঙ্গং রৌতি—ইত্যসৌ রুরুঃ স্যাৎ।
কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্পঃ **অন্যে করহরমাহুঃ**।
উক্তঞ্চ—কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্‌ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্ ইতি।
প্রসহানাহ···কঙ্কঃ দীর্ঘচঞ্চুর্ম্মহাপ্রাণঃ।
উক্তঞ্চ—কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ।
লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্॥ ইতি।

দর্শন পুস্তকাদিতেই আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রাণী বিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। ধরা যাউক, কোনও একজন দার্শনিক দর্শন সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সহজেই বুঝা যায় যে, একজন দার্শনিকের পক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিশেষ করিয়া প্রাণি-জগতের তথ্যসমুদয় স্বকীয় জীবনে সংগ্রহ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। অথচ তাঁহার সেই দর্শনশাস্ত্রে নানা কথা ও উপমাচ্ছলে তাঁহাকে শুধু প্রাণী বিষয়ক কেন, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে দেখা গেল। এখন আমরা যদি বলি যে, পূর্বে প্রাণী-বিজ্ঞান বলিয়া একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং উহা হইতেই নানা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নানা প্রাণী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ অন্যায় বলা হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণী-বিজ্ঞান বলিয়া একটি পৃথক্ বিদ্যা যে পুরাকালে এদেশে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নলিখিত উক্তিটিতে পাইয়া থাকি। শুধু প্রাণী-বিজ্ঞান কেন, অন্যান্য বহুবিধ অধুনালুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ হহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। উহাতে নারদ, সনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি কি শাস্ত্র বা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন। অধীত বিষয়গুলির মধ্যে আমরা ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিত্র্য বা পিতৃসম্বন্ধীয়, রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বা আবহাওয়া, নিধি বা ধনবিদ্যা, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন বা নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা বা ভূমিকম্পাদি উৎপাতসম্বন্ধীয় বিদ্যা, **ভূতবিদ্যা বা প্রাণী-বিজ্ঞান**, ক্ষত্রবিদ্যা বা যুদ্ধশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, **সর্পবিদ্যা**, দেবজন বা সুগন্ধিবিদ্যার বা শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোকটি ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি ১৫০০-১২০০ খৃঃ পূর্বকালে প্রণীত হইয়াছে।

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং, দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাম্ এতদ্‌ভগবোঽধ্যেমি ॥"—ছান্দোগ্য, ৭অ ১খণ্ড, ২।

ভূত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকেই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে মনুষ্যদিগের তিন প্রকার দুঃখের কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ হিংস্র জন্তু আদি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্রে ভূতবলি অর্থে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ভূত অর্থে যে প্রাণিবর্গই বুঝাইয়া থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্বভূতে দয়া অর্থে সর্বপ্রাণীতে দয়া বুঝায়। সংস্কৃত অভিধান মতেও ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী এইজন্য "ভূতবিদ্যা" অর্থে আমরা প্রাণিবিদ্যাই বুঝিয়াছি। এই ভূতবিদ্যা ছাড়া 'ভূততন্ত্র' বলিয়া অপর একটি বিদ্যার উল্লেখ আমরা কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পাই বটে, কিন্তু আমার মতে উহা একটি পৃথক্ শাস্ত্র। ভূতবিদ্যা বলিতে প্রাণিবিদ্যা ও ভূততন্ত্র বলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসামূলক কোনও গ্রন্থ বুঝাইত বলিয়াই মনে হয়। পূর্বোক্ত শ্লোকে ভূতবিদ্যা বা প্রাণী-বিজ্ঞান ব্যতীত সর্পবিদ্যারূপ প্রাণী-বিজ্ঞানের একটি বিভাগবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে সর্পের সংখ্যাধিক্যবশতঃ সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় বিশেষ করিয়া এই সর্পবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। তাই আয়ুর্বেদাদি পাঠে কৃমি-কীটাদির ন্যায় সর্পাদি সম্বন্ধেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া প্রাণী বিষয়ক বহু বিজ্ঞানশাস্ত্র যে পূর্বে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে আমরা পাইয়া থাকি। প্রমাণস্বরূপ শালিহোত্র

গ্রন্থের কথা বলা যাইতে পারে। শালিহোত্রই ইহার রচয়িতা ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যানে (১৬০০ খৃঃ পূঃ) আমরা ইহার উল্লেখ পাই মাত্র। কতিপয় অশ্ব ও বানর পুড়িয়া গেলে, কোনও রাজা এই শালিহোত্রের সন্ধান লন। পঞ্চতন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শালিহোত্র এখন একখানি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ। ইহার কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'আগদ তন্ত্র' নামক এক প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ আমরা আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থে পাই। কীটবিদ্যা এই আগদ তন্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এই তন্ত্রের একখানি পুস্তকও আমরা পাই নাই। তবে পালকপীয়-প্রণীত গজায়ুর্বেদ এবং জয়দত্ত ও নকুল-প্রণীত অশ্ব-গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি কয়েকখানি চিকিৎসামূলক প্রাণী-বিজ্ঞান এখনও পাওয়া যায়। সে যুগে অশ্ব, গজ ও গবাদির রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়-তার জন্য হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইহাদের কয়েকখানি এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই চিকিৎসামূলক প্রাণী-বিজ্ঞান ছাড়া কয়েকখানি সাধারণ প্রাণী-বিজ্ঞানও আমরা পাইয়াছি এ সম্বন্ধে শৈনিকশাস্ত্রম্ (Hucking birds) ও মৃগ-পক্ষিশাস্ত্রম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করেন, দ্বিতীয়খানি স্বর্গীয় ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বিহার হইতে প্রাপ্ত হন। দুইখানিই প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ। পুস্তক দুইখানি যে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই বুঝা যায়। মৃগপক্ষীশাস্ত্রের রচয়িতা হংসদেব একজন জৈন কবি এবং তিনি মোটামুটি ১৩০০ খৃঃ জীবিত ছিলেন। ইহা ছাড়া আর একখানি সুলিখিত প্রাণী-বিজ্ঞান পুস্তকও পাওয়া যায়; উহার নাম তত্ত্বার্থাধিগম। উমাস্বতি নামক একজন জৈন কবি উহার রচয়িতা। জৈনবংশ তালিকা অনুযায়ী উমাস্বতি ৪০ বা ৫০ খৃঃ জীবিত ছিলেন। ইহা ছাড়া

দালভ্য এ লাদায়নের প্রাণী সম্বন্ধীয় বিবরণও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাদের একজন ১০০ হইতে ২০০ খৃঃ পর কালের মধ্যে এবং অপরজন খৃঃ পূঃ কালে (C ২০০ খৃঃ পূঃ) জীবিত ছিলেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালে হিন্দুস্থানে প্রাণী-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন ছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ আরও গ্রন্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি প্রাচীন প্রাণী-বিজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহাদের একখানিও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয়ত সব কয়খানিই লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহাদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হইল। এই লুপ্ত গ্রন্থগুলির নাম জনৈক বৃদ্ধ পণ্ডিত হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কোনও প্রকাশিত সংস্কৃত ক্যাটালগে এই সকল লুপ্ত পুস্তকের নাম আমি অদ্যাবধি পাই নাই।

ক। সরীসৃপবিষয়ক। ১। লতাবিস্ফোটক। ২। উজ্জয়িনী গ্রন্থ। ৩। ভূসরীসৃপ রাজভাষা। ৪। নাগার্জুনতন্ত্র। ৫। মণিলতা গ্রন্থ।

খ। পক্ষিবিষয়ক। ১। খেচরীমালা। ২। বিহঙ্গমতন্ত্র। ৩। হিমাদ্রি-শাখাতন্ত্র। ৪। ভূমালা গ্রন্থ। ৫। ভীমরী গ্রন্থ।

গ। স্তন্যপায়িবিষয়ক। ১। পুষ্পমালা গ্রন্থ। ২। শকুন্ত লেখ। ৩। নিষাদতন্ত্র। ৪। নিষাদমহাভাষ্য। ৫। জীবধর্ম। ৬। সংগোপন গ্রন্থ। ৭। শাখামৃগ গ্রন্থ। ৮। হস্তী এবং ৯। অশ্বতন্ত্র।

ঘ। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি। ১। মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্। ২। তত্ত্বার্থাধিগম।

৩। শৈনিকশাস্ত্রম্। ৪। গজায়ুর্বেদ। ৫। অশ্বায়ুর্বেদ।
৬। দালভ্যবিবরণ। ৭। লাদায়নবিবরণ।

এইবার কি ভাবে আমাদের নষ্ট প্রাণী-বিজ্ঞান উদ্ধার করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব। আমরা জানি, পূর্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতিতে রক্ষিত ছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণের সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ নেপালে নীত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি নেপাল দরবার-পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ঐ সকল দেশে শীতের প্রাধান্য হেতু গ্রন্থকীটের উপদ্রব নাই। পুস্তকগুলিও নষ্ট হয় নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐ দুইটি দেশ হইতে হিন্দুর অধুনালুপ্ত প্রাণী-বিজ্ঞানের উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু উহা যদি নাও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র-সমুদয়ে বিক্ষিপ্ত প্রাণী সম্বন্ধীয় তথ্যসকল একত্র সংগ্রহ করিলে উহাই একটি ধারাবাহিক প্রাণী-বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে। লুপ্ত প্রাণী-বিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ঐ তথ্য সমুদয় এত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে যে, সাধারণের পক্ষে উহার প্রকৃত অর্থ সব সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। কোন কোন শ্লোক আবার রূপকচ্ছলে লিখিত। সেইজন্য তাহার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিক শ্লোকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির তাঁহারা প্রায়ই ভুল অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, গত পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবৎ চর্চার অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে জোর করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির আবার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; উহাদের

যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগ দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে কথাচ্ছলে লিখিত হওয়ায় তাঁহারা ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। এই রূপকাত্মক শ্লোকগুলির বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথার্থ অর্থ নির্ণয় দ্বারাই এখন হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত প্রাণী সম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই আমি আমাদের দেশের প্রাণী-বিজ্ঞান উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, লুপ্ত প্রাণী-বিজ্ঞান হইতেই ঐ শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ প্রণালীতে উহা সম্ভব হইবে, তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

ধরা যাউক, কোন একজন লোক ছোট ছোট কাঠের টুকরা দিয়া তৈয়ারী একটি খেলনার বাড়ী টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কয় দিন পরে বাটী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সেই খেলনার বাড়ীখানি কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও উহার টুকরাগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টুকরাগুলি কোনটি উঠান, কোনটি ছাদ, কোনটি রাস্তা, কোনটি বা রোয়াক হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় গৃহখানি তৈয়ারী করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টুকরাগুলি সম্ভবমত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করার পর দেখা গেল যে, একটি থাম, রোয়াকের কিছু অংশ ও একটি জানালা পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু লোকটি হতাশ হইল না। সে জানালার ফাঁকের উপযুক্ত একটি জানালা গৃহের অপর একটি প্রাপ্ত জানালার অনুরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়া লইল। তাহার পর রোয়াকের অপ্রাপ্ত অংশ ও থামটাও ঐরূপ ভাবে তৈয়ারী করিয়া, গৃহখানি পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ ভাবে নষ্ট প্রাণী-বিজ্ঞান আমরাও উদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে উহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়া

আমার বক্তব্য শেষ করিব। একশফ ও দ্বিশফ বলিয়া দুইটি বৈজ্ঞানিক শব্দ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্যে হইতে আমি উদ্ধার করিলাম। একখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "একশফ" ও দ্বিখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "দ্বিশফ"। কিন্তু হস্তী প্রভৃতি পঞ্চখুরবিশিষ্ট জীবও আমরা দেখিতে পাই। হস্তীর ন্যায় পাঁচ-খুরো জীবের সন্ধান হিন্দুগণ জানিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সহজেই বুঝা যায় যে, যাঁহারা দ্বিশফ, একশফ প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা পঞ্চশফ শব্দটিও অনুরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমরা এখন পাইতেছি না। এ স্থলে আমরা এই একশফ ও দ্বিশফ শব্দের অনুকরণে পঞ্চশফ শব্দটিও বর্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। ধরা যাউক, অশ্ব সম্পর্কীয় একটি সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইল এবং এই সম্পর্কে সকল তথ্য একত্রে কোনও প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া গেল না। কিন্তু বিবিধ পুস্তক ও পুঁথি পাঠে দেখা গেল, কোনও পুস্তকে অশ্বের দেহাকৃতি ও স্বভাবাদির বর্ণনা আছে। আর এক পুস্তকের কোনও এক শ্লোকে উহার পার্শ্ব অস্থি সম্পর্কে মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য এক পুস্তকের শ্লোকে উহার মস্তকের অস্থি সম্বন্ধে মাত্র বলা হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকে হয়তো উহার হৃদয়যন্ত্র ধমনী বা স্নায়ু সম্পর্কে মাত্র বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যদি ঐ শ্লোকগুলি পর পর সাজাইয়া লইতে পারি তাহা হইলে স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্গত এই অশ্ব জীবের ব্যবচ্ছেদিক তথ্য, বহির্বিবরণ, স্বভাব ও বাসস্থান এবং উহাদের বিভিন্ন যোনি (Species) সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক পুস্তক পুনরুদ্ধার করিতে পারিব। বলা বাহুল্য এই অশ্ব, সর্প, ভেক ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রাণী সম্পর্কে অনুরূপ বহুবিধ

শ্লোক নানা কথা ও উপমাস্থলে বিবিধ পুস্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রূপে লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। এইরূপে অধুনা প্রাপ্ত কয়েকখানি প্রাণী-বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও পূর্বোক্ত উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাণী বিষয়ক বিক্ষিপ্ত * শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিয়া যে একখানি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা আমি পরে দেখাইব। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এইরূপ ধারাবাহিক ও সুগঠিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টির প্রয়োজন প্রাচীন যুগে কেন হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব প্রাচীন ভারতে কয়েকটি কারণে এই বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়োজন বিশেষরূপে উপলব্ধি হইয়াছিল, এবং এই সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমি ইহা বিশদরূপে আলোচনা করিব।

অনেকে বলিবেন প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান ছিল, কিন্তু ইহার জন্য কোনও পৃথক পুস্তক ছিল না। আমার মতে বৈদিক যুগ হইতে এই জ্ঞান সৃষ্ট হইতে থাকে এবং পৌরাণিক যুগের পূর্বে ইহা পরিপুষ্ট হয়। ধারাবাহিকরূপে অর্জিত এই জ্ঞানকে আমি সুসংবদ্ধ প্রাণী-বিজ্ঞানই বলিব। খুবই সম্ভবতঃ ৬০০ খৃঃ পূঃ কাল বরাবর এই

---

* তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজে রূপক শ্লোক লেখা একটা বাহাদুরীর বিষয় ছিল। যে সকল শ্লোকে সহজ অর্থ দেওয়া হইত, তাহাও আবার অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। গুরুর আশ্রমে শিষ্যগণ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহজ অর্থ বুঝিয়া লইয়া মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্য পঠিত শাস্ত্রগুলির সারস্বরূপ ঐ সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি লিখিয়া লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিত। এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিখনপদ্ধতির প্রচলন থাকায় এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও আমরা সংক্ষিপ্ত পুরাণ শ্লোকেই পাইয়া থাকি। এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ বুঝাইবার জন্য পরে পণ্ডিতগণ পরস্পরবিরোধী বহু টীকা লিখিতে বাধ্য হন। মধ্য যুগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত বিদ্যাপীঠগুলির লোপই ইহার কারণ। [illegible] আপেক্ষা [illegible] আরও সংক্ষিপ্ততর হইত।

জ্ঞান সম্পর্কে পৃথক পুস্তক লিখিত হইতে থাকে ; এবং খৃষ্ট পর কালে ৬০০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহার চর্চা অব্যাহত ভাবে চলে। যে ভাবে ভারতবর্ষে বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হইয়াছিল তাহা এই দেশে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণের জন্য অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে নাই। অন্যথায় পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা এই দেশে আজ হইতে সহস্র বৎসর পূর্বেই সৃষ্ট হইতে পারিত বলিয়া আমি মনে করি।

ভারতীয় প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার য়ুরোপীয় প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিব। য়ুরোপীয় গ্রীস দেশ এবং এশিয়ার ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এই বিদ্যার উদ্ভব হয় নাই। একমাত্র মধ্যযুগীয় চীনদেশে রেশম পোকা সম্বন্ধে যা' কিছু আলোচনা হইয়াছিল। অবশ্য হিন্দুস্থানের রেশম পোকার জ্ঞানও চীনদেশের জ্ঞানের মতই সুপ্রাচীন। য়ুরোপে এ্যারিষ্টল সাহিত্যে (৩৪৪—৩২২ খৃঃ পূঃ) সর্ব প্রথম প্রাণী সম্বন্ধীয় আলোচনা দেখা যায়। মহামতি এ্যারিষ্টলের মৃত্যুর পর ছয় শত বৎসর যাবৎ প্রাণী-বিজ্ঞানের আর কোনও প্রকাশ বা চর্চা য়ুরোপে হয় নাই। ইহা য়ুরোপের এক অন্ধকার যুগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ্যারিষ্টলের পূর্বে এবং পরে য়ুরোপে এই বিদ্যার লেশমাত্র সন্ধান না পাওয়া তাৎপর্য-পূর্ণ, যদিও পণ্ডিত উইলিয়াম লোসি সাহেব অনুমান করেন যে এ্যারিষ্টলের জন্মের পূর্ব হইতে গ্রীসদেশে প্রাণিবিদ্যার প্রচলন ছিল এবং কোনও না কোনও কারণে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে পূর্বে হতে এই বিদ্যা বর্তমান না থাকিলে এ্যারিষ্টল সাহিত্যে অতো [illegible]

প্রাচীন প্রাণী-বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উইলিয়াম এ লোসি Ph.D. Sc.D. প্রণীত নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত * 'জীব-বিজ্ঞান এবং উহার স্রষ্টা' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, একথা অতীব সত্য যে এ্যারিষ্টলের জন্মের বহু পূর্ব হতে ভারতবর্ষে (২০০০—৬০০ খৃঃ পূঃ) বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর আধুনিক প্রাণী-বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত প্রাণিবিদ্যা হিন্দুগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, এবং ইসলাম আক্রমণের পূর্বকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই বিদ্যার সবিশেষ চর্চা ছিল। এ্যারিষ্টল যুগের পূর্বে য়ুরোপীয় প্রাণিবিদ্যার যে উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহার কোনও প্রমাণ নাই, উইলিয়ম সাহেব এই সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞান ঋগ্‌বেদের যুগ হইতে (২০০০ খৃঃ পূঃ, মতান্তরে ৪৫০০ খৃঃ পূঃ) যে সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করারও যথেষ্ট কারণ আছে যে বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি এই বিদ্যাকে বীজগণিতের ন্যায় এ্যারিষ্টল পূর্ব গ্রীক দেশের সীমানা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছে। তবে মূলতঃ হিন্দু এবং গ্রীক প্রাণী-বিজ্ঞান যে পৃথক ভাবে সৃষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞান বেদ † বেদান্ত, উপনিষদ, প্রাচীন ব্রাহ্মণ,

* Biology and its makers by William A Locy Ph. D. Sc. D. New York, 3rd Edition, Henry Halt & Co 1915 page 9.

সূত্র, মনু, পুরাণ, ভাগবৎ, পাণিনি, পাতাঞ্জল, বিবিধ ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থ এ্যারিষ্টলের জন্মের বহু পূর্বে প্রণীত হইয়াছে। হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমি কাল নির্ণয় শীর্ষক পরিচ্ছেদের পৃথকভাবে আলোচনা করিব।

পরবর্তীযুগে পুনরায় ৪৩-১০০ খৃষ্টাব্দে জৈন পণ্ডিতগণ যাঁরা পুনরায় ভারতবর্ষে (উমাস্বতি, হংসদেব প্রভৃতি) প্রাণী-বিজ্ঞানের চর্চা হইতে থাকে। এইরূপ চর্চা ভাগবতের সময় অর্থাৎ ৫০০-৬০০ খৃঃ পর্যন্ত চলিয়াছিল, তবে ভাগবত প্রাচীন জ্ঞানসমূহ সগ্রন্থে সংগ্রহ করেন মাত্র।

এ্যারিষ্টলের ৬০০ বৎসর পর পর্যন্ত যেমন গ্রীকদেশে রোমক আধিপত্য ও ধর্মান্ধতাব কারণে এই বিজ্ঞানের চর্চা হয় নাই, * তেমনি মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষেও শক, হুণ প্রভৃতি বিদেশীদের আক্রমণের কারণে

---

* রোমক বা রোমাণদের আলেকজেন্ড্রিয়া, গ্রীস, সিসিলির উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে এবং তৎকালীন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার জন্য য়ুরোপে বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হইয়া যায়। [illegible] য়ুরোপে [illegible] [illegible] কয়েক শতাব্দী কাটাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের [illegible] [illegible] মুসলিম [illegible] [illegible] বিহার [illegible] [illegible] আক্রমণে এই দেশে বহু প্রাচীন পুস্তকাগার ও সংগ্রহশালার [illegible]

এই বিদ্যার প্রতি ভারতবাসী সম্যকরূপে দৃকপাত করিতে পারে নাই। ইহার পর মোসলেম আক্রমণের সহিত ভারতবর্ষে অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। এই যুগে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাহিত্য গড়িয়া উঠিলেও বিজ্ঞান পুরাপুরি বিদায় লইয়াছিল।

এই জীব-বিজ্ঞান বা বায়োলজীর সম্পর্কে দুইজন মহান সম্রাটের নাম উল্লেখ না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই দুইটি সম্রাটের একজনের নাম আলেক্সাণ্ডার এবং অপর জনের নাম অশোক। গ্রীসে আলেক্সাণ্ডারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ্যারিষ্টলের শিষ্যগণ প্রাণিগণ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। এই সময় বিবিধ প্রাণীর মৃত দেহ সকল গ্রীক দেবতা মিউসের (Muse) মন্দিরে রক্ষিত হইত। আজ আর কাহারও অজানা নাই যে এই মিউস দেবের নাম হইতে মিউসিয়াম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের আনুকূল্যে উদ্ভিদ * সমূহের উপর পরীক্ষা এবং উহাদের স্পেশিমন সমূহ বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংগৃহীত হইতে থাকে।

[illegible] বৌদ্ধযুগের পর জী[illegible] [illegible] দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে চলিতে থাকে। হিন্দুগণ [illegible] [illegible] জ্ঞান অর্জন করিতে থাকেন। অপর দিকে [illegible] অহিংসানীতির [illegible] চিকিৎসায় [illegible] দেন এবং জৈনরা অনুরূপ কারণে [illegible] স্বভাব ও মনস্তত্ত্বের [illegible] উপর মনোনিবেশ করেন।]

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই [illegible] বা 'ভূত-বিদ্যা' পৃথিবীর আদিতম বিজ্ঞান-শাস্ত্র, এবং ইহার প্রথম উদ্ভব ভারতবর্ষেই হইয়াছিল।

---

* Experiment in acclimatisation and Plant Collection.

য়ুরোপে জন্ রে (১৬৯৩) এর সময় পর্যন্ত প্রকৃত প্রাণিবিদ্যার চর্চা মূলতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্ত করা হয়। ভারতবর্ষেও প্রাণিবিদ্যা চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত গড়িয়া উঠিলেও উহার উন্নতির আরও দুইটি কারণ ছিল। এই কারণ দুইটি হইতেছে, (১) যজ্ঞার্থে পশুবলি এবং (২) যোগ-বিদ্যার অনুশীলন। এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। ইংরাজি 'জুলজি' (Zoology) নাম একটি অতি আধুনিক অবদান। কিন্তু উহার ভারতীয় প্রতিশব্দ 'ভূত-বিদ্যা' ১৫০০-১২০০ খৃঃ পূঃ কালে সৃষ্ট হয়। ভাগবতকার (৫০০-৬০০ খৃষ্টাব্দে) প্রভৃতি হিন্দু মনীষিগণ উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীকে 'একত্রে জীব' বলিতেন ; তাঁহাদের মতে উদ্ভিদবিদ্যা ও ভূতবিদ্যা (প্রাণিবিদ্যা) জীব-বিদ্যার অন্তর্গত দুইটি পৃথক বিভাগ। জীব-বিদ্যার য়ুরোপীয় প্রতিশব্দ 'বায়লজি'। কিন্তু এই 'বায়লজি' প্রতিশব্দটি য়ুরোপে Treviranus সাহেব কর্তৃক মাত্র ১৮০২ সালে সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রেণী বিভাগ

প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে জীবদিগের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কীয় বহু শ্লোক আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল শ্লোক খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকে উল্লিখিত শ্রেণীবাচক শব্দের কয়েকটি সৃষ্টিক্রমের ধারা (Evolution) লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের মধ্যে কয়েকটি 'হাইপথিটিক্যাল' ক্রমলুপ্ত (কাললুপ্ত) জীবও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্বাক, তির্যক, শফ, নখ প্রভৃতি জীবের কথা বলা যাইতে পারে। এই 'শফজীব' হইতেছে একশফ, দ্বিশফ এবং চতুর্শফ (অশ্ব, গরু ও হস্তী) জীবের পূর্বপুরুষ এবং নখ-জীব হইতেছে পঞ্চনখ (ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি) এবং চতুর্নখ (শশকাদি) জীবের পূর্বপুরুষ ; এবং 'তির্যক' জীব (চতুষ্পদ) এই শফ এবং নখ, এই উভয় শ্রেণীর জীবেরই 'কমন এনসেস্‌টার' বা গোত্রগত পূর্বপুরুষ। য়ুরোপে সর্বপ্রথম Ernsf Hackel সাহেব (১৮২৫-১৮৯৫ খৃঃ) আর্যঋষিগণের ন্যায় 'ইভোলিউসন্' থিওরির উপর নির্ভর করিয়া জীবদিগের শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করেন। একটি জীব-গোষ্ঠীর সহিত অপর এক জীব-গোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিরূপণের জন্য তিনিও কয়েকটি 'হাই-পোথেটিক্যাল এনসেস্ট্রাল (ancestral) জীবের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আর্যঋষিগণ পরিকল্পিত বহুবিধ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে একটি ভৌগোলিক বিস্তার এবং একটি জীব-স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়াও সৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজিতে শেষোক্ত রীতিকে Ecological শ্রেণী বিভাগ বলা হইয়া থাকে। জার্মাণীর HACKEL সাহেব

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই Ecology শব্দটির সৃষ্টি করেন। হিন্দুগণ এইরূপ বিভাগ সু-প্রাচীন যুগে পরিকল্পনা করিলেও, কোনও কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিত ইহা সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছেন।

য়ুরোপে Linnaeus সাহেব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধভাবে শ্রেণী গোত্র, গণ, বংশ (genera, order, class) ইত্যাদি পরিভাষা সহ জীবদিগের শ্রেণী বিভাগের প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে, উপরোক্ত য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের জন্মের বহুকাল পূর্ব (১০০-২০০ খৃষ্টাব্দ এবং তৎপূর্ব কালেও) হইতে উহাদের অনুক্রমিক শ্রেণীবাচক পরিভাষাসমূহ (বর্ণ, কুল, জাত, দ্বীপ, গ্রাম, বংশ, গোত্র) আমরা দেখিতে পাই। এই ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি মূলতঃ একপ্রকার হইলেও উহাদের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট আছে। এক্ষণে তুলনামূলকভাবে এই উভয় দেশের জীব-বিভাগ এবং উহাদের ক্রমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব।

শ্রেণী বিভাগ প্রাণী-বিজ্ঞানমাত্রেরই প্রথম অধ্যায়। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবদিগের দৈহিক গঠনের বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবদিগের শ্রেণী বিভাগ করেন। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন অনুসারেই তাঁহারা জগতের যাবতীয় প্রাণিগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন 'আমিবা' প্রভৃতি এককোষ জীবগণকে এককোষ ও বহুকোষ উর্ধ্বতন জীবনকে বহুকোষ জীব বলিয়াছেন। বহুকোষ জীবগণের মধ্যে যাহাদের অস্থি আছে, তাহাদিগকে অস্থিক বা দণ্ডী জীব ও যাহাদের অস্থি নাই, তাহাদিগকে নিরস্থিক জীব বলা হইয়াছে। এই অস্থিক বা দণ্ডী জীবগণও আবার তাহাদের দেহের গঠন অনুসারে চক্রতুণ্ডি, শ্বাসপটী, মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী, এই সাতটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। অপর দিকে

নিরস্থিক জীবগণকেও আবার এই একই নিয়ম অনুসারে পর্বপদী, চিপিট জীব, বর্তুল কৃমি প্রভৃতি "দেশে" ভাগ করা হয়। পূর্বকথিত হস্তিদেশের ন্যায় এই সকল জীবদেশও বহু বিভাগে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্বপদী-দেশের কথা বলা যাইতে পারে। এই পর্বপদীদেশ বা phylum, খোলকী, স্রোতের, সন্দংশমুখী, দ্বিযুগ্মপদী ও ষট্‌পদী, এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এইগুলিকে দৈহিক বিভাগ বলা হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের আধুনিক য়ুরোপীয় বিভাগগুলি উহাদের দৈহিক (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক) গঠনের উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছে। এই আধুনিক শ্রেণী বিভাগের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

রাজ্য বা Kingdom—জঙ্গম
দেশ বা Phylum—অস্থিক
শ্রেণী বা Class—স্তন্যপায়ী
গণ বা Order—হিংস্র
গোত্র বা Genus—বৈড়াল
বংশ বা Species—বিড়াল
জাতি, পরিবার বা Family—কাবলী বা দেশী

হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণও শ্রেণী বিভাগ বুঝাইবার জন্য এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই সকল শব্দ দ্বারা তাঁরা প্রাণীদিগের ন্যায় স্বরতানলয়ের শ্রেণী বিভাগও করিয়াছেন। নিম্নের শ্লোকটি এই সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য যে 'গ্রাম' কুল, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি জীব সম্পর্কীয় শ্রেণী বাচক শব্দ। নিম্নের শ্লোকটিতে ইহাদের সাহায্যে সঙ্গীতেরও শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ এই সকল শব্দ দ্বারা যে প্রাণীদিগেরই শ্রেণী বিভাগ করা হইত তাহাতে কোনওরূপ

সন্দেহ নাই। প্রমাণ স্বরূপ সুশ্রুত সংহিতার (১০০-২০০ খৃষ্টাব্দ) সূত্রস্থানের ১৯ শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে জঙ্গমের প্রকার ভেদ বর্ণিত হইতেছে। ভূত গ্রাম (জীবদিগের 'গ্রাম বা শ্রেণী') চতুর্বিধ, যথা স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ'। ইহা ব্যতীত ভাষ্যমতী টীকান্বিত শঙ্কর ভাষ্যসহিতম্ বেদান্তদর্শনম্ গ্রন্থেও এইরূপ লিখা আছে; 'অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজম্, ইত্যত্র ত্রিবিধ ভূত গ্রাম শ্রূয়তে কথং চতুর্বিধত্বং ভূত গ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমি ত্যত্রোচ্যতে'।

কুলানি জাতয়ো বর্ণা দ্বীপাস্ত্বার্ষ্যঞ্চ দৈবতম্।
ছন্দাংসি বিয়োগাশ্চ স্বরাণাং শ্রুতিজাতয়॥
গ্রামাশ্চ মূর্চ্ছানাস্তানাঃ শুদ্ধাঃ কূটাশ্চ সংখ্যয়া।
প্রস্তাবঃ খণ্ডমেরুশ্চ নষ্টোদ্দিষ্টং প্রবোধনঃ॥

* সঙ্গীতদর্পণ—১।৭—১৬

উপরের শ্লোকটিতে আমরা কুল, জাত, বর্ণ, দ্বীপ, গ্রাম প্রভৃতি পাঁচটি শ্রেণীবাচক প্রতিশব্দ পাইয়া থাকি। কিন্তু এই সকল ছাড়া আমরা বর্ষ, শ্রেণী, গণ ও বংশ প্রভৃতি প্রতিশব্দও সংস্কৃত সাহিত্যে পাইয়াছি। হিন্দুগণ সমস্ত পৃথিবীকে কয়েকটি দ্বীপে বিভক্ত করেন। এই দ্বীপগুলিকে আবার কয়েকটি করিয়া বর্ষে বিভক্ত করা হয়। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ ছিল একটি বর্ষ। এইবার নিম্নের তালিকাটি অনুধাবন করিলে হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কিরূপ প্রণালীতে শ্রেণী বিভাগ করিতেন তাহা বুঝা যাইবে। আর্যঋষিগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিবিধ শ্রেণী বিভাগ-বোধক শব্দ একত্রিত করিয়া ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে।

---

* সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম গ্রন্থেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে।

দ্বীপ—জঙ্গম

বর্ষ—অস্থিকা

গ্রাম—জরায়ুজ

শ্রেণী—অর্বাক

কুল—শফ

গণ—একশফ

বংশ—অশ্ব

বর্ণ—ভারতীয়

বা—আরবীয়

যোনি—ইত্যাদি।

দৈহিক বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাণীদিগের সুসংবদ্ধভাবে শ্রেণী বিভাগ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হিন্দু মনীষিগণের, প্রাণীদিগের এই দৈহিক বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা সত্বেও তাহারা প্রাণীদিগের মানসিক ও জনন-বিভাগ ও স্বভাব-বিভাগ রূপ আরও তিনটি শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহাদের যথাক্রমে মানসিক, জনন, দৈহিক ও স্বভাব বিভাগ বলা হইত। শেষোক্ত বিভাগটি প্রাণীদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তজ্জনিত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এই চতুর্বিধ শ্রেণী বিভাগই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহারা প্রথম দুইটি বিভাগের উপর বেশী প্রাধান্য দিতেন। দার্শনিক মতগুলির ন্যায় এই কয় প্রকার বিভাগই বহুকাল হইতে শিষ্য পরম্পরায় (Parallel School of Thought) একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে ও পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। একটির পর অপরটি উদ্ভব হইয়াছে

কি না তাহা বলা বড় কঠিন। কারণ প্রামাণ্য পুস্তকগুলির সব কয়খানিই প্রাচীন পুস্তক এবং ঐ সকল গ্রন্থের কয়েকটি প্রায় সমসাময়িক মনীষিগণের দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। এইবার প্রাণীদিগের এই চতুর্বিধ শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

মানসিক বিভাগ

জীবদিগের মানসিক বিভাগ, একমাত্র ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। য়ুরোপে আজও পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। জীবদিগের চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া উহা সৃষ্ট হইয়াছে।

জীবদিগের এই চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা তাহা য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাত্র আরম্ভ হয়। 'মার্গারেট্' সাহেব তাঁহার 'দি এ্যানিম্যাল মাইণ্ড' নামক পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে এই বিজ্ঞান সবে মাত্র সুরু হইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও অনেক দেরী। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বরাবর Jennings সাহেব সর্বপ্রথম জীবস্বভাব ও তাহাদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আপতদৃষ্টে ভারতবর্ষে ৪০ খৃষ্টাব্দে উমস্বাতি প্রভৃতি জৈন পণ্ডিতগণ জীবদিগের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করেন। ইহার পর ৫০০-৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভাগবতকার ইহার আলোচনা সুরু করেন। কিন্তু ভাগবত একটি সঙ্কলিত গ্রন্থ এবং উহাতে উক্ত মতবাদ এই দেশে খৃঃ পূঃ কাল হইতে প্রচলিত আছে। এইজন্য আমরা প্রথমে ভাগবতোক্ত জীবদিগের মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভাগবত পাঠে বুঝা যায় যে প্রাচীন হিন্দুগণ জীবচিত্ত (Animal Psychology) সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা করিয়াছিলেন। নিম্নতম প্রাণীদিগের মন বা চিত্ত আছে কিনা, এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সবে মাত্র চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,

কিন্তু হিন্দু-মনীষিগণ বহুকাল পূর্বে এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন।

ভাগবতের মতে প্রাণী ও বৃক্ষাদিতে কোনও প্রভেদ নাই; উভয়েরই মধ্যে প্রাণ আছে এবং উভয়েই জীব। মনুও (C ৬০০ খৃঃ পূঃ) তাঁহার সংহিতায় * এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাগবতকার জীব বলিতে প্রাণীর সহিত উদ্ভিদ্‌ও বুঝিতেন। নিম্নের শ্লোক হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। এই শ্লোকে ভাগবতকার উদ্ভিদ্‌কে 'স্থাবর' নামে এবং প্রাণীকে 'জঙ্গম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'স্থাবর' অর্থে যে-সকল জীব স্থির থাকে তাহাদের এবং 'জঙ্গম' অর্থে যে-সকল জীব ইচ্ছামত চলাফিরা করে—(পুনঃ পুনঃ গচ্ছতি— জঙ্গম্যতে + কক্) তাহাদের বুঝানো হইয়াছে।

"পশুবৃক্ষাদি ভেদেন জীব এব স্বতঃ স্থিতিঃ।
সংসৃতৌ ব্যত্যয়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতা॥
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ
তেভ্যো মানুষমুক্তশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ॥"

—ভাগবত

---

* উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

তাৎপর্য—বৃহৎকাণ্ড বিশিষ্ট, পুষ্পশোভিত; ফলবন্ত, ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জীব, যাহারা কর্মহেতু তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের প্রজ্ঞা বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু যাহারা ভিতরে ভিতরে সুখদুঃখ অনুভব করে, যাহাদের অন্তরে প্রাণ আছে, তাহাদের সকলকে উদ্ভিদ্ জীব বলা হয়। —মনুসংহিতা।

[বর্তমানকালে স্যার জগদীশচন্দ্র বোস যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন]

ভাগবতকারের মতে প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ উভয়েরই জীববিভার অন্তর্গত এক একটি বিভাগ। এই শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, পৃথিবীতে প্রথমে 'স্থাবর-জীবের' এবং তাহার পর 'জঙ্গম-জীবের' সৃষ্টি হয়। পরিশেষে এই 'জঙ্গম-জীবের' মধ্য হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের সৃষ্টি হয়। এই 'জঙ্গম-জীবকে' ভাগবতকার মানসিক পর্যায় যথাক্রমে—'স্পর্শবেদী', 'রসবেদী', 'গন্ধবেদী', 'শব্দবেদী', 'রূপবেদী', ও 'কর্মবেদী' এই ছয় রূপ বিভাগে বিভক্ত করেন। নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে। উহা মূল ভাগবত হইতে লওয়া হইয়াছে।

[মাদ্রাজের পাজকা ক্ষেত্রের মাধবাচার্য নামক এক পণ্ডিত ১১৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'ভাগবত-তাৎপর্য' নামক গ্রন্থে এই শ্লোকটির বিশদ্ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। তবে তিনি ইহাতে স্বীকার করেন যে এই সকল তথ্য তিনি সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত কপিল মুনির 'কাপিলেয়' শীর্ষক গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।]
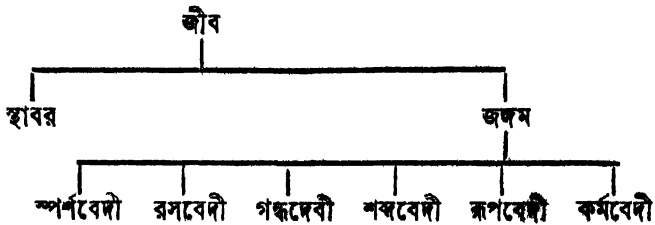
জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাঃ ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
অত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ চতুষ্পাদঃ ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারঃ তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।

—ভাগবত

শ্লোকটিতে প্রথমে প্রস্তরাদি অজীব, তাহার পর প্রাণবন্ত জীবদিগের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) কথা বলা হইয়াছে। এই প্রাণবন্ত জীবদিগের মধ্যে যাদের মন বা চিত্ত আছে তাহারা ভাগবতের মতে 'সচিত্ত' জীব। 'সচিত্ত' জীব বলিতে ভাগবতকার 'জঙ্গম' (Animal) জীবকেই বুঝিয়াছেন। 'সচিত্ত' জীবদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই প্রকাশ পায়। এইজন্য ইন্দ্রিয়বোধের উপর নির্ভর করিয়া এই মানসিক বিভাগ পরিকল্পিত হয়। ভাগবতকার কীটপতঙ্গ (Insects) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীবদের 'স্পর্শবেদী', মৎস্যদিগকে 'রসবেদী', কীটপতঙ্গাদিকে গন্ধবেদী * সরীসৃপদিগকে 'শব্দবেদী', পক্ষীকুলকে 'রূপবেদী' এবং স্তন্যপায়ীদিগকে 'কর্মবেদী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিদ্ ধাতু হইতে বেদী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার অর্থ বিশেষ রূপ জ্ঞান যাহার আছে। ভাগবতকারের মতে বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এক একটি 'জীবগোষ্ঠী' এক একটি চিত্তবোধের উপর অত্যন্তরূপ নির্ভরশীল এবং তৎজনিত (অতিব্যবহারের কারণে ?) তাহারা তৎ তৎ বোধের বিবিধ স্বরূপ (power of

* পতঙ্গদেহে মাত্র কয়েকটি গন্ধকোষ বিদ্যমান থাকিলেও, উহাদের দেহে গন্ধবোধের কোন সুগঠিত special organ অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। অথচ পতঙ্গজীবের গন্ধবোধ অপরিসীম ও মনুষ্য অপেক্ষাও উহা শক্তিশালী। এইজন্য বোধাধিক্য সম্পর্কে বিশেষ ইন্দ্রিয়াদির বা মস্তিষ্কের গঠনের বিশ্লেষণ যথেষ্ট নহে।

discrimination) নিরূপণেও * সক্ষম থাকে। ভাগবতকারের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মন বা চিত্ত আছে, এইজন্য 'জঙ্গম' জীবকে তাঁহারা 'সচিত্ত' জীব বলিয়াছেন। ভাগবত পাঠে আরও বুঝা যায় যে, বোধসমূহ (senses) তৎ তৎ সম্পর্কীয় সুগঠিত ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকেই জীবে আবির্ভূত হইতে পারে। ভাগবতকার আরও বিশ্বাস করিতেন যে, বিশেষ পরিবেশে, প্রয়োজন মত, জীবে এই সকল বোধ প্রথমে (বোধ-কোষ রূপে) আবির্ভূত হয় এবং পরে উহাদের আধারস্বরূপ তৎ তৎ বোধ সম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইতে থাকে। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টির কারণে ইন্দ্রিয়বোধের উদ্ভব হয় নাই ; বরং ইন্দ্রিয়বোধের সৃষ্টি ও উহার ক্রমবিকাশের জন্যই উহাদের আধারস্বরূপ সুগঠিত ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের মতে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে রসনেন্দ্রিয়, গন্ধেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। [স্পর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্পর্শ, রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রস, গন্ধেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধ ইত্যাদি, ইতি ভাগবত] তাঁহাদের মতে আলো, শব্দ ও গন্ধ প্রভৃতির সংস্পর্শজনিত প্রথমে তৎ তৎ সম্পর্কীয় বোধ এবং তাহার পর উহাদের আধারস্বরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হইয়াছে। দেহের একই অংশে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ সংঘর্ষণের (irritation) এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এইরূপ হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য বলিয়া আমি মনে করি।

* পক্ষী সম্পর্কে যেমন উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে—'রূপভেদবিদস্তত্র'। অর্থাৎ পাখী একটি রূপ বা বর্ণ হইতে অপর একটি রূপ বা বর্ণের প্রভেদ বুঝিতে পারে। এমন কি তাহারা একপ্রকারের লাল বর্ণ হইতে অপর এক প্রকারের লাল রংয়ের প্রভেদও বুঝিতে সক্ষম।

[কোনও কোনও হিন্দুপণ্ডিতের ইহাও ধারণা ছিল যে, বোধ ও বুদ্ধির ক্রমাবির্ভাবের ফলে উহাদের আধারস্বরূপ জীবের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মস্তিষ্কেরও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জীব যতই উন্নত হইতেছে তাহাদের মস্তিষ্কের পরিধিরও ততই বৃদ্ধি ঘটিতেছে। নিম্নের চিত্রটি দেখিলে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাইবে।

তাঁহাদের এই মতবাদ হইতে বুঝা যায় যে, দেহের সহিত মনের ক্রম-বিকাশের প্রশ্নও তাঁহাদের মনে উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু মনের প্রয়োজনে দেহ, না দেহের প্রয়োজনে মন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় তাহা আজও অমীমাংসিত। এইজন্য এই সম্পর্কে অধিক আলোচনা না করাই ভাল। তবে হিন্দুদিগের এই মতবাদের সমর্থনসূচক একটি অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান হইতে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনুষ্যজাতি ছিল 'NEANDERTHAL' নামক মানুষ। ইহাদের প্রশীল-কঙ্কাল হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মুখ ও অঙ্গাদি বানরের ন্যায় ছিল। এমন কি ইহারা বানরদিগের ন্যায় নিম্নমুখী হইয়া দুই পাশে ঝুঁকিয়া (SHAMBLING GAIT) চলাফিরা করিত। কিন্তু

ইহা সত্ত্বেও জানা গিয়াছে যে তাহারা যন্ত্রপাতি নির্মাণ তো করিতই, এমন কি তাহারা মৃতদেহ মৃতের জীবিত অবস্থায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ কবর পর্যন্ত দিত। ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হইবে, মন সম্ভবতঃ দেহ তথা ব্রেণ হইতে এক পৃথক বস্তু এবং উহার ক্রমোন্নতির সহিত জীবের দেহের (ব্রেণের) ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিত BERGSON সাহেবের মতে জীবের পার্থিব ব্রেণ বা মস্তিষ্ককে একটি বিরাট টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দেহের বহুবিধ তার মুহুর্মুহুঃ বহির্দেশ হইতে এই কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে এবং উহার অন্যান্য তারসমূহ ঐ সংবাদজনিত নির্দেশ দেহের পেশীসমূহে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং জীবসমূহের মন বা মাইণ্ড এই বিরাট এক্সচেঞ্জের মধ্যস্থানে থাকিয়া উহার পরিচালনা (operates) করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সুপ্রাচীনকালে আর্য ঋষিগণও BERGSON সাহেবের মতের হুবহু অনুরূপ এক মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোক * কয়টি যথাক্রমে কঠোপনিষৎ, (১৫০০—১২০০ খৃঃ পূঃ) পঞ্চদশী এবং গীতা হইতে নিম্নের পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হইল। উহাদের একটি শ্লোকে আবার বলা হইয়াছে যে, রথ হইতেছে দেহ, অশ্ব হইতেছে উহাদের ইন্দ্রিয় এবং রথি হইতেছে মন। অর্থাৎ সর্বাগ্রে মন, তাহার পর ইন্দ্রিয় ও তাঁহার পরে দেহ।

(১) আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুঃ শরীরং রথমেবচ
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি—ইত্যাদি। কঠোপনিষৎ

(২) পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্।
অপঞ্চিকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসিদ্ধতে॥ পঞ্চদশী

মনুষ্যপদবাচ্য নিয়েন্‌ডের্‌থাল ম্যান (আদিম মনুষ্যগোষ্ঠী)

ইহা সত্ত্বেও জানা গিয়াছে যে তাহারা যন্ত্রপাতি নির্মাণ তো করিতই, এমন কি তাহারা মৃতদেহ মৃতের জীবিত অবস্থায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ কবর পর্যন্ত দিত। ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হইবে, মন সম্ভবতঃ দেহ তথা ব্রেণ হইতে এক পৃথক বস্তু এবং উহার ক্রমোন্নতির সহিত জীবের দেহের (ব্রেণের) ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে।

আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিত BERGSON সাহেবের মতে জীবের পার্থিব ব্রেণ বা মস্তিষ্ককে একটি বিরাট টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দেহের বহুবিধ তার মুহুর্মুহুঃ বহির্দেশ হইতে এই কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে এবং উহার অন্যান্য তারসমূহ ঐ সংবাদজনিত নির্দেশ দেহের পেশীসমূহে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং জীবসমূহের মন বা মাইণ্ড এই বিরাট এক্সচেঞ্জের মধ্যস্থানে থাকিয়া উহার পরিচালনা (operates) করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সুপ্রাচীনকালে আর্য ঋষিগণও BERGSON সাহেবের মতের হুবহু অনুরূপ এক মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোক * কয়টি যথাক্রমে কঠোপনিষৎ, (১৫০০—১২০০ খৃঃ পূঃ) পঞ্চদশী এবং গীতা হইতে নিম্নের পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হইল। উহাদের একটি শ্লোকে আবার বলা হইয়াছে যে, রথ হইতেছে দেহ, অশ্ব হইতেছে উহাদের ইন্দ্রিয় এবং রথি হইতেছে মন। অর্থাৎ সর্বাগ্রে মন, তাহার পর ইন্দ্রিয় ও তাহার পরে দেহ।

(১) আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুঃ শরীরং রথমেবচ
বুদ্ধিন্তং সারথিং বিদ্ধি—ইত্যাদি। কঠোপনিষৎ

(২) পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্।
অপঞ্চিকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসিদ্ধতে॥ পঞ্চদশী

ঐ সময় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সৃষ্টি না হওয়ায় ইহা হইতে ভাল উপমা আর কল্পনা করা যায় নি। ব্রেণ ডেমেজড্ হইলে ইন্দ্রিয় ডেমেজড্ হয় বটে, কিন্তু উহার জন্য মন বিকৃত নাও হইতে পারে। প্রাচীন হিন্দুগণ সম্ভবতঃ এই তথ্যটি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। য়ুরোপে স্যার অলিভার লজ্ F. R. S., D. Sc. সাহেবও (১৮৫১ খৃঃ) এই সম্পর্কে হুবহু হিন্দুদের মতেরই অনুরূপ মত তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।]

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ভাগবতোক্ত শ্লোকে আরও বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যথাক্রমে (পর পর) স্পর্শবেদী (কীটপতঙ্গ ব্যতীত সমুদয় অনস্থিকা জীব) রসবেদী (মৎস্যাদি), গন্ধবেদী (কীটপতঙ্গাদি), রূপবেদী (পক্ষী) এবং কর্মবেদী (চতুষ্পদ ও দ্বিপদ, স্তনপায়ী) জীব সৃষ্ট হইয়াছিল; এই কারণে উহাদের একটি জীব হইতে অপর একটি জীব বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হইতে পারে আর্য ঋষিগণ ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কীটপতঙ্গ বা INSECT রূপ একটি নিকৃষ্ট জীবকে মৎস্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট দেহধারী একটি জীবের উপরে স্থান দিলেন কেন? কিন্তু ভূতাত্ত্বিক তালিকাটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আর্যগণ এই বিষয়ে একটুমাত্রও ভুল করেন নি। পর পৃষ্ঠার তালিকাতে বিভিন্ন যুগের ভূস্তরে বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি সম্পর্কীয় চিহ্ন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত তালিকাটিতে মানসিক পর্যায়ে কোন্ কোন্ জীব পর পর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। স্পর্শবেদীর পর রসবেদী, রসবেদীর পর 'গন্ধবেদী, গন্ধবেদীর পর শব্দবেদী ও শব্দবেদীর পর যে রূপবেদী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত তালিকাটি তাহা সপ্রমাণ করে। ভূতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া এই প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে,

আর্যগণ রসবেদী জীবের পর গন্ধবেদী জীবের স্থান দিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই।

বর্তমান রসবেদী মৎস্যকুল এবং গন্ধবেদী কীট-পতঙ্গ, এই উভয়শ্রেণীর জীবই কোনও এক স্পর্শবেদী অনস্থিকা জীব হইতে উদ্ভূত হইলেও

জুরাসিক ...	পক্ষী জীব	রূপবেদী
ট্রিয়াসিক ... পারমিয়ান ...	ডাইনেসিরাস সরীসৃপ ও উভচর ভেকাদি	শব্দবেদী
কারবনিফিরাস ...	ষট্পদী জীব (কীট পতঙ্গাদি)	গন্ধবেদী
ডিভোনিয়ান ... সুলেরিয়ান ... ওডোভিসান ...	নিম্নোভচর (সালেমেণ্ডার) ফুসফুস মাছ মৎস্য জীব	রসবেদী
ক্যামব্রিয়ান ...	যাবতীয় নিরস্থিক জীব— ষট্পদী ব্যতীত	স্পর্শবেদী
আরকিয়ান ...		

'রসবেদী মৎস্যে'র সৃষ্টি হওয়ার পর 'গন্ধবেদী কীটপতঙ্গে'র জন্ম হয়। এই কারণেই কি, প্রাচীন হিন্দুগণ এই গন্ধবেদী জীবের স্থান, রসবেদী জীবের পরে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ নির্ভুলরূপেই (righty) বিশ্বাস করিতেন যে চিত্তবৃত্তি বা বোধের ক্রমিক উৎপত্তির ফলে বিবিধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা চালিত অভ্যাস বা কার্যাদি দ্বারা জীবগণ নূতন নূতন দেহাকৃতি লাভ করিয়াছে। এইভাবে পৃথিবীতে নূতন নূতন যোনি বা জীববিশেষের সৃষ্টি হয়। জীবদিগের এই মানসিক বিভাগ যে জীবদিগের ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে।

ভাগবতকারের মতে এক একটি জীবগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক বাসস্থান বা পরিবেশ অনুযায়ী তাহাদের বিবিধ ইন্দ্রিয়াদি মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়ই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়, কালক্রমে উহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসমূহের সামান্য প্রভেদ পর্যন্তও তাহাদের বোধগম্য হয়। পক্ষীকে এইজন্য ভাগবতকার বলিয়াছেন, "রূপভেদবিদ্" অর্থাৎ তাহারা একটি রূপ বা বর্ণ হইতে অপর একটি রূপ বা বর্ণের ভেদ বুঝে (Colour discrimination)। এইখানে নীল রং হইতে সবুজ রং বাছিবার ক্ষমতার প্রশ্নই শুধু উঠে না, উপরন্তু একটি লাল বা নীল রং হইতে অপর একটি নীল বা লাল রং বাছিয়া লইবার ক্ষমতারও প্রশ্ন উঠে।

ভাগবতকার উপরোক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী কীট-পতঙ্গ ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবদিগকে বলিয়াছেন, "স্পর্শবেদী" অর্থাৎ উহারা একটি স্পর্শের স্বরূপ হইতে অপর একটি স্পর্শের স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম। অনুরূপ কারণে, তাহারা মৎস্যকুলকে বলিয়াছেন, "রসবেদী" অর্থাৎ একটি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্বাদ হইতে ঐ প্রকার অপর একটি স্বাদের তারতম্য উহারা বুঝিতে পারে। কীটপতঙ্গকে তাঁহারা বলিয়াছেন, "গন্ধবেদী" জীব—কারণ তাঁহাদের মতে ইহারা একটি গন্ধ হইতে অপর একটি গন্ধের

যৎসামান্য প্রভেদও বুঝিতে অধিকতর রূপে সক্ষম। অনুরূপ কারণে তাঁহারা সরীসৃপদের 'শব্দবেদী' এবং পক্ষীকুলকে 'রূপবেদী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের মতে 'সরীসৃপ' এবং 'পক্ষী' যথাক্রমে একপ্রকার শব্দ হইতে অপর একপ্রকার শব্দ এবং একপ্রকার বর্ণ হইতে অপর একপ্রকার বর্ণের যৎসামান্য প্রভেদও বুঝিতে পারে।

ভাগবতকার কিরূপ অবলোকন বা পরীক্ষার পর এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা বর্তমানে বলা দুষ্কর। যতদুর বুঝা যায়, তাঁহারা 'স্পর্শবেদী' জীবদিগের ক্ষেত্রে 'স্পর্শবোধ' বলিতে উহার সহিত রসায়নবোধও (chemical sense) বুঝিতেন। এই রসায়নবোধের মধ্যে গন্ধ ও রসবোধও আছে। সম্ভবতঃ কীটপতঙ্গ ব্যতীত নিরস্থিক জীবগণ সুগঠিত ইন্দ্রিয়াদির অভাবে কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারাই এই সকল বোধ লাভ করিতে পারিত বলিয়া তাঁহারা উহাদের 'স্পর্শবেদী' জীব নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অনুরূপভাবে 'রসবেদী' জীবদিগের ক্ষেত্রে রসবোধ বলিতে উহার সহিত তাহারা গন্ধবোধও বুঝিয়া থাকিবেন, কারণ গন্ধও রসের ন্যায় জলমিশ্রিত হইয়া রসের আকারেই ঐ সকল জীবের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এইজন্য তাঁহারা মৎস্যজীবকে সাধারণভাবে 'রসবেদী' জীব নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সর্পদিগকে তাঁহারা 'শব্দবেদী' জীব বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অথচ, সর্পাদির সুগঠিত কর্ণ নাই; কিন্তু আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সাপ অন্য উপায়ে শুনিতে পায়। প্রাণীদিগের শব্দগোচর দুইটি উপায়ে হইতে পারে, উহাদের যথাক্রমে বলা হয় "বোন্ কন্‌ডাকশান্ (bone conduction) এবং 'এয়ার কন্‌ডাকসান্' (air conduction)। সাপের শ্রবণশক্তি নির্ভর করে মূলতঃ 'বোন্ কন্‌ডাকশানের উপর। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশেষে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিব। পক্ষী-

কুল ভূমি হইতে বহু উর্ধ্বে বিচরণ করে—এইজন্ত তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। অতিব্যবহারের কারণে তাহাদের চক্ষু যে অতীব শক্তিশালী তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন।

ভাগবতকৃত মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি প্রবর্তিত অপর এক প্রকার মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে বলিব। জৈন পণ্ডিতকৃত জীবদিগের মানসিক বিভাগ এবং ভাগবতে উল্লিখিত মানসিক বিভাগের যা কিছু প্রভেদ তাহা বিষয়বস্তুর নয়, উহাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা গুরুত্বের অর্থাৎ ভাগবতকার প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়বোধের (discriminaion power) উপর এবং জৈন পণ্ডিতগণ উহাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের (sense) উপর নির্ভর করিয়া মানসিক পর্যায়ে উহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

এই বিশেষ মানসিক বিভাগের প্রথম প্রচলন করেন জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি। মহামতি উমাস্বতি আনুমানিক ৪০ খৃঃ অঃ তাঁহার তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র গ্রন্থে এই মানসিক বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের নিম্নোক্তরূপ অংশটি (২য় অধ্যায়—সূত্র ২৪) বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"কৃম্যাদীনাং পিপীলিকাদিনাং ভ্রমরাদীনাং মনুষ্যাদীনাং চ যথা সংখ্যমেকৈক বৃদ্ধানি ইন্দ্রিয়ানি ভবন্তি। যথাক্রমম্। তদ্ যথা কৃম্যাদীনাং অপাদিক-নূপুরক-গণ্ডুপদশঙ্খ-শুক্তিক-শম্বুক-জলুকা প্রভৃতীনাং স্পর্শনরস-নেন্দ্রিয়ে ভবতঃ। পিপীলিকা-রোহিনিকা-উপচিকা-কন্থ-তুবুরক-ত্রপুসবীজ কর্পাসাস্থিকা-শতপদ্যুৎপতক (শতপদী উৎপতক) তৃণপত্র-কাষ্ঠহারক প্রভৃত্তানাং ত্রীনি স্পর্শনরসনঘ্রাণানি। ভ্রমর-বরট-সারঙ্গ মক্ষিকা-পুত্রিকা-দংশ-বৃশ্চিক-নন্দ্যাবর্ত্ত-কীট-পতঙ্গাদীনাং চত্বারি স্পর্শনরস-ঘ্রাণ-

চক্ষুংষি। শেষানাঞ্চ তির্য্যগ্‌যোনিজানাং মৎস্যোরগ-ভুজঙ্গপক্ষি-চতুষ্পদানাং সর্ব্বেষাং চ নারকমনুষ্য দেবানাং পঞ্চেন্দ্রিয়ানি।"

উপরের রচনাটি হইতে প্রতীত হইবে যে, মহামতি উমাস্বতি বিশেষরূপ গবেষণার পর মানসিক পর্যায়ে নিম্নোক্তরূপে বিবিধ প্রকার প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন।

১। যে সকল প্রাণী দুইটি মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবন যাপন করিয়া থাকে; অর্থাৎ খাদ্যাহরণ, প্রজনন এবং ভ্রমণাদি কার্য যাহারা স্পর্শ ও রস বা স্বাদ, এই দুইটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমাধা করিয়া থাকে। যথা—

(ক) 'অপাদিক' অর্থাৎ যাহাদের পদাস্বরূপ কোনও প্রকার অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নাই। কেহ কেহ মনে করেন এই 'অপাদিক' শব্দটি দ্বারা লেখক 'scolecids' জীবকে বুঝিয়াছেন, আবার কেহ কেহ মনে করেন, 'আমিবা' আদি এককোষ জীব, যাহাদের কোন স্থায়ী অঙ্গাদি নাই, তাহাদেরই সম্বন্ধে ঐ শব্দটি প্রয়োগ করা হইত।

(খ) 'নূপুরিক' অর্থাৎ যে সকল অপাদিক জীবের গাত্রে নূপুরের মত গোল গোল দাগ আছে। এইরূপ গোলাকার দাগ কেঁচুয়া আদি জীবের গাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 'নূপুরিক' জীবগণকে ইংরাজীতে বলা হইয়া থাকে 'Annelids.' কাহারও মতে যে সকল নিরস্থিক জীবগণের পদসমূহ চিংড়ি আদি জীবের ন্যায় যুক্ত নয় তাঁহাদেরও নূপুরিক জীব বলা হইত। তবে অঙ্গাদি থাকুক বা না থাকুক নূপুরের ন্যায় গোল গোল দাগ ইহাদের দেহে ধারণ করা চাই-ই, কারণ নূপুরিক জীবের উহাই হইতেছে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(গ) 'গণ্ডুপদ' অর্থাৎ যুগ্মপদী জীব। এই সকল জীবদের পদাস্বরূপ অঙ্গাদি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন খণ্ড যুক্ত হইয়া উহাদের

ঐ পার্শ্ব অঙ্গাদি সকল সৃষ্টি করিয়াছে। গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া আদি জীবগণ এই গণ্ডূপদ জীবের অন্তর্গত জীব। চিত্রে প্রদর্শিত কাঁকড়া ও গলদা চিংড়ি জীবের পার্শ্ব অঙ্গগুলি (পদ) ভালরূপে নিরীক্ষণ করিলে বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে।

(ঘ) কোষস্থ জীব Mollusca অর্থাৎ যাহারা কোষের মধ্যে অবস্থান করে। এইথানে. মাত্র শঙ্খ (conchifera) এবং শুক্তি (Pearl mussel) এবং শম্বুক (Helix) জীবের কথা বলা হইয়াছে।

(ঙ) জলৌকা অর্থাৎ ক্ষোত্তব্যা বা Elastic জীব। ক্ষোত্তব্যা বলিতে যে সকল জীবদিগকে পিষিয়া দিলেও মরিয়া যায় না তাহাদের বুঝায়। জোঁক বা জলৌকা হইতেছে ক্ষোত্তব্যা জীব।

২। যে সকল প্রাণী তিনটি মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ খাদ্যাহরণ, পরিভ্রমণ এবং প্রজননের কার্যাদি যাহারা স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধ এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমাধা করিয়া থাকে, যথা :—

(ক) পিপীলিকা বা ডেঁয়ো পিঁপড়া।

(খ) রোহিণিকা বা লাল পিঁপড়া।

(গ) উপচিকা, কন্থু বা ছারপোকা ; ভুবুরক বা মাছি।

(ঘ) ত্রপুস বীজ, কর্পাসাস্থিকা বা উকুন।

(ঙ) শতপদী বা তেঁতুলে বিছা, উৎপতক বা উচ্চিংড়ে।

(চ) তৃণপত্র বা বৃক্ষউকুন।

(ছ) কাষ্ঠহারক বা উইপোকা।

৩। যে-সকল জীব চারিটি মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ খাদ্যাহরণ, পরিভ্রমণ এবং প্রজননের কার্যাদি যাহারা স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ এবং দৃষ্টি, এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমাধা করিয়া থাকে। যথা :—

(ক) ভ্রমর, ভরট, ম্নারঙ্গ অর্থাৎ বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি।

(খ) মক্ষিকা, পুত্তিকা, দংশ, মশক অর্থাৎ মৌমাছি, বড় মাছি, মশা ইত্যাদি।

(গ) বৃশ্চিক, নন্দাবর্ত অর্থাৎ কাঁকড়া বিছা, মাকড়সা ইত্যাদি।

(ঘ) কীট অর্থাৎ প্রজাপতি ইত্যাদি।

(ঙ) পতঙ্গ অর্থাৎ পঙ্গপাল ইত্যাদি।

৪। যে-সকল প্রাণী পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবন ধারণ করে; অর্থাৎ যাহারা খাদ্যাহরণ, প্রজনন এবং পরিভ্রমণের কার্যাদি, রূপ[৫], রস[২], গন্ধ[৩], শব্দ[৪] এবং স্পর্শের[১] দ্বারা সমাধা করিয়া থাকে। যথা:—

(ক) মৎস্য বা মাছ।

(খ) উরগ, অর্থাৎ যে-সকল অপাদ্য সরীসৃপ বুকে হাঁটিয়া চলাফিরা করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্পের কথা বলা যাইতে পারে।

(গ) ভুজঙ্গ অর্থাৎ পাদী বা পদযুক্ত সরীসৃপ, গোহাড়গিল বা গোসাপ ইত্যাদি।

(ঘ) পক্ষী বা পাখী।

(ঙ) চতুষ্পদ, চারিটি পদযুক্ত স্তন্যপায়ী জীবকেই চতুষ্পদ জীব বলা হইয়া থাকে; যেমন গরু, ঘোড়া ইত্যাদি।

উপরিউক্ত রূপ মানসিক বিভাগ সুপণ্ডিত উমাস্বতি কিরূপ প্রামাণ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বলা অতীব কঠিন। তবে উমাস্বতি প্রণীত এই প্রাণী বিষয়ক আখ্যান ভাগ হইতে আমরা কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষা পাইয়া থাকি। উহাদের কয়েকটির সহিত আধুনিক য়ুরোপীয় পরিভাষার আশ্চর্যজনক মিলও দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নূপুরিক এবং গণ্ডুপদীর কথা বলা যাইতে পারে। এই নূপুরিকার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক নাম Annelid বা

Ringike এবং গণ্ডুপদীর ইংরাজী নাম Arthopoda বা knotty-legged, যাহাকে আমরা যুগ্মপদী বলিয়া থাকি। আশ্চর্যের বিষয় এই সংস্কৃত পরিভাষাগুলি সৃষ্ট হইয়াছিল ৪০ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে; কিন্তু ইংরাজী পরিভাষা দুইটি Lenckart সাহেব (১৮২৩-১৮৯৮ খৃঃ) এবং Von Sicbold সাহেব মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে প্রথম ব্যবহার করেন। বর্তমান কালে, আমরা এই Arthopoda-র বাংলা পরিভাষা 'যুগ্মপদী'র সৃষ্টি করিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকি, কিন্তু আমরা অবগত নই যে, বহু পূর্বে আমরাই ঐ একই অর্থে 'গণ্ডুপদ' পরিভাষাটি সৃষ্ট করিয়াছিলাম। আমার মতে বাংলা পরিভাষাগুলি ইচ্ছামত সৃষ্টি করিবার পূর্বে আমাদের উচিত সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত শব্দ ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা।

জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি জীবদিগের ইন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কীয় পরীক্ষায় যে আধুনিক পণ্ডিতদের ন্যায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত আখ্যানভাগ হইতে বুঝা যায়। তাঁহার মতে জীবদেহে 'খর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও শীত সম্পর্কীয় স্পর্শেন্দ্রিয় বিভিন্ন কণাকারে (spot) প্রথম জন্মে। পরে রস, গন্ধ ও রূপ (আলোক বোধ?) সম্পর্কীয় ইন্দ্রিয় কণাকারে উদ্ভূত হইয়া পূর্বোক্ত স্পর্শকণার সহিত জীবদেহে (নিম্নশ্রেণীর জীব?) একত্রে অবস্থান করিতে থাকে। এইসকল কণা বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা একত্রে (aggregate) জীবদেহোপরি অবস্থান করিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রস ও গন্ধ কণা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু পরমাণুরূপে জীবদেহের অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় কণাসমূহে স্পর্শ করিলে তবে রস ও গন্ধের বোধ জন্মে। প্রকারান্তরে উমাস্বতি বলিতে চাহিয়াছেন যে, মিষ্টি চিনিতে নাই, মিষ্টি আছে জীবদেহের রসকোষে। চিনিজাত কণাসমূহ ঐ সকল রসকোষকে উদ্বেলিত করে বলিয়াই জীব মিষ্টস্বাদ উপভোগ করে। ইহা ছাড়া

উমাস্বতি আরও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়স্থান প্রথমে জীবের (নিম্নশ্রেণীর ?) সারা দেহেই ব্যাপ্ত থাকে পরে স্পর্শ ব্যতীত বাকি ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে জীবের সম্মুখভাবে মাত্র সন্নিবেশিত হয়।

উমাস্বতির মতে স্পর্শজ্ঞানের স্বরূপ আট প্রকার, যথা—কঠিন, মৃদু, গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ; রসজ্ঞানের স্বরূপ পাঁচ প্রকার, যথা, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল ও মধুর। মনুষ্যেতর জীবগণের গন্ধজ্ঞান মাত্র দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—সুরভি বা প্রীতিকর এবং অসুরভি বা অপ্রীতিকর এবং ঐরূপ জীবদের নিকট বর্ণ পাঁচ প্রকার, যথা—কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুভ্র। সম্ভবতঃ উমাস্বতি মনে করিতেন যে, মনুষ্যেতর জীবগণ ইহার অধিক বর্ণ (কিংবা মিশ্রবর্ণ) উপলব্ধি করিতে পারে না। উমাস্বতির মতে শব্দজ্ঞান ছয় প্রকার হইয়া থাকে, যথা—ততো, বিততো, ঘনঃ, শুশিরো, ঘর্ষো ও ভাষো।

"অজবোকায়া ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশ পুদ্গলাঃ। পুদ্গল জীবাস্তু ক্রিয়াবন্তঃ, সংখ্যেয়াসংখ্যেয়াশ্চ পুদ্গলানাং। শনোঃ, স্পর্শরসগন্ধবর্ণবন্তঃ পুদ্গলাঃ। তত্র স্পর্শোস্থবিধঃ কঠিনোঃ মৃদু গুরু লঘু শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ, ইতি। বসঃ পঞ্চবিধিস্তিক্ত কটুঃ কষায়োহম্লোমধুর ইতি। গন্ধো দ্বিবিধ সুরভি-সুরভিশ্চ। বর্ণ পঞ্চবিধ কৃষ্ণো, নীল, লোহিতঃ পীতঃ শুক্ল ইতি। তত্র শব্দ ষড়্‌বিধোঃ ততোঃ বিততো ঘনঃ শুশিরো ঘর্ষো ভাষো ইতি। অনবঃ স্কন্ধাশ্চ, তত্রাণবোহবন্ধাঃ স্কন্ধাস্তু বন্ধা এব। স্কন্ধাস্তাবৎ সংঘাত ভেদভ্য উৎপদ্যন্তে, অত্রাহ, কিং ·····, অত্রোচ্যতে।"

এই আখ্যানভাগ এ্যাটমিক থিওরী বা অণুপরমাণু বুঝাইবার জন্য উমাস্বতি অবতারণ করিলেও উহার সহিত জীবদেহের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। এই আখ্যানভাগের সহিত উমাস্বতি প্রণীত অন্যান্য আখ্যান ভাগ একত্রে অনুধাবন করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। অতীব

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই আধুনিক বিজ্ঞানোক্ত বিষয়বস্তুসমূহ উমাস্বাতি খৃষ্টজন্মের প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই উমাস্বতি 'অত্রাহ, অত্রোচ্যতে' অর্থাৎ এইরূপ কথিত হইয়াছে ইত্যাদি বাক্যসমূহ তাঁহার আখ্যানভাগে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল বাক্য হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই সকল পরীক্ষা কার্য খৃষ্টপূর্বকাল হইতেই এই দেশে চলিয়া আসিতেছিল।

এইবার জীবদিগের ভাগবতোক্ত হিন্দু এবং উমাস্বতি কথিত জৈন মতানুযায়ী মানসিক বিভাগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি যৎসামান্য আলোচনা করিব। উমাস্বতি তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। জীবদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্তমান য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা সমর্থিত হইবে। কিন্তু ভাগবতকার জীবদিগের ইন্দ্রিয় বোধ সম্পর্কীয় মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া যান নি। সেই জন্য নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে আমি মূলতঃ এই ভাগবতোক্ত মতবাদ সম্বন্ধেই সবিশেষ মনোযোগ দিয়াছি।

স্পর্শবেদী

[পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, নিম্নতম জীবদেরও মন বলিয়া এক বস্তু আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ অবশ্য সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে, এই সকল জীবদেরও মন বলিয়া এক বস্তু আছে। অবশ্য আমাদের মন হইতে উহাদের মনের প্রভেদ যে যথেষ্ট তাহা স্বীকার করা উচিত হবে।]

প্রথমে 'স্পর্শবেদী' জীবদিগের কথা বলা যাউক। 'স্পর্শবেদী' জীব বলিতে ভাগবতকার এমন এক জীব বুঝিয়াছেন যাহারা একটি স্পর্শ হইতে অপর স্পর্শের প্রভেদ বুঝে এবং যাহারা আহারাদি সংগ্রহ, চলা-ফিরা, প্রজনন প্রভৃতি কার্যে এই স্পর্শবোধের উপর অধিকতরভাবে নির্ভরশীল। তাঁহাদের মতে এই সকল জীবদিগের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও উহাদের সবগুলির বোধ নাই। ভাগবতকার কীট-পতঙ্গ ব্যতীত যাবতীয় অনস্থিক জীবদিগকে ''স্পর্শবেদী জীব' বলিয়াছেন। নিম্নতম জীবগণ তাহাদের জীবনধারণের জন্য যে স্পর্শবোধের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল একথা অতীব সত্য। কিন্তু তাহা সত্বেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি জীবের (গলদা চিংড়ী ইত্যাদি) চক্ষুও দেখা যায়। এই সম্বন্ধে আমি এইবার বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। এই সকল জীবদের মধ্যে স্পর্শবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অপর এক বোধও দেখা যায়। উহাদের আমরা খাদ্যবোধ বলিতে পারি। আমরা সাধারণতঃ বিবিধ প্রাণীদের মধ্যে চার প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের সন্ধান পাইয়া থাকি; যথা— (১) স্পর্শবোধ (২) রসায়নবোধ
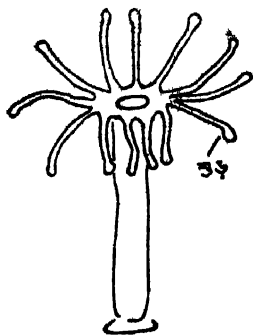
এক প্রকার হাইড্রা জীব

আমিবা ও সিলিয়েটা জীব

দুই কোষস্তর যুক্ত হাইড্রা জীব
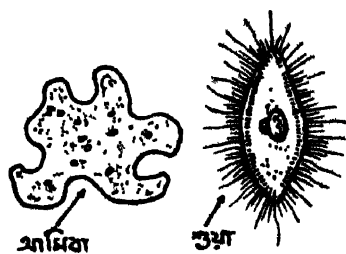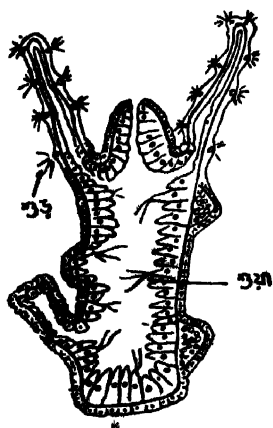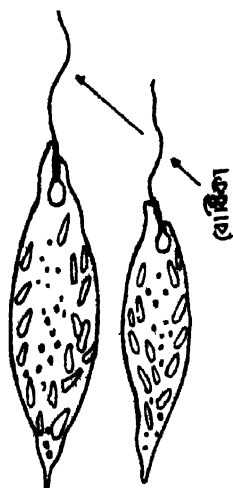
প্যারেমেসিয়াম জীব

(Chemical Sense); ইহার মধ্যে স্বাদ ও গন্ধও আছে, (৩) শব্দবোধ এবং (৪) দৃষ্টিবোধ। কিন্তু নিম্নতম প্রাণিগণ এই রসায়নবোধ দ্বারা যেমন খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লয়, তেমনি উহার দ্বারা তাহারা বিবিধ দ্রব্যাদির স্বরূপও বুঝিয়া লয়। এইজন্য নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে দৃষ্ট এই রসায়নবোধ হইতে প্রকৃত স্পর্শবোধ পৃথক করা সুকঠিন। গন্ধ, আলো ও রসের সংস্পর্শে উহাদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে বলিয়াই আমরা ধরিয়া লই যে, উহাদের ঐ সকল বোধ আছে, যদিও উহাদের অনেকেরই দেহে এই সকল বোধের জন্য কোনও সুগঠিত ইন্দ্রিয় দেখা যায় না। অধিকন্তু এই সকল বিবিধরূপ বোধ সম্পর্কীয় স্থান (seat) ঐ সকল জীবদেহের একই অংশেও একত্রে নিরূপিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে বোধ হয়, ভাগবতকার এই রসায়নবোধকেও স্পর্শবোধের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই স্পর্শবোধের পার্থক্য বুঝা এই যুগের ন্যায় সেই যুগেও কঠিন ছিল। এতদ্ব্যতীত জীবসার (protoplasm) মাত্রই স্পর্শধর্মী। এমন কি, রসায়নবোধও উহারা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও পর্যন্ত এই সম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষার পরও পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে ভাগবতপন্থিগণ তাঁহাদের ধারণা অনুযায়ী কীট পতঙ্গ ব্যতীত সমুদয় অনস্থিকাদের একত্রে স্পর্শবেদী জীব বলিয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে আরও পরীক্ষা করার জন্য আমি নিজেও নিম্নোক্তরূপ একটি 'স্পর্শবিদ্' যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলাম। (তাহা পর পৃষ্ঠায় দেখ) আমি মনে করি আলোক, উত্তাপ ও শব্দ (কম্পন) অধিকাংশ অনস্থিকা জীবদিগের মধ্যে স্পর্শবোধাত্মক, কিন্তু তৎসহ উহাদের রসায়ন ও খাদ্যবোধও আছে। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে প্রভেদ বুঝা কঠিন।

আলোকপাতে বহু প্রটোজোয়া বা এককোষ জীবের ব্যবহারের তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের কাহারও কাহারও দেহে লোহিতবর্ণের eye spot বা চক্ষুকণা দেখা যায়। সম্ভবতঃ উহাদের আলোকবোধের সহিত এই কণাটির সম্পর্ক আছে। এতদ্ব্যতীত

স্পর্শবিদ্ যন্ত্রম্
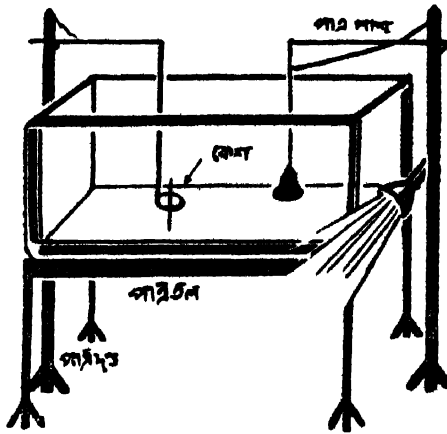
কেঁচুয়া আদি জীবের দেহে অত্যুগ্র আলোকপাত হওয়ামাত্র উহারা পলায়নপর হয়। কিন্তু তাই বলিয়া দৃষ্টি বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহা ইহাদের নাই। কেঁচুয়া জীবের দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছেদন করিলেও কোন দর্শনেন্দ্রিয়ের চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। মনুষ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহারা অন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সকল অনস্থিকা জীবের মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র চক্ষুবিন্দু আছে তাহারাও মাত্র আলোছায়ার প্রভেদ অর্থাৎ কোন দিক হইতে ছায়া পড়িতেছে তাহাই মাত্র বুঝিতে পারে। অতি দ্রুত কোনও জীব না নড়িলে তাহারা

উহাকে জীব বলিয়া বুঝিতে পারে না। গণ্ডুপদী (Arthopoda) জীবদিগের চক্ষু বহুলাংশে উন্নত, বিশেষ করিয়া শম্বুক জীবের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে সত্য, কিন্তু তাহারাও একজন মানুষ চলিতেছে বা বৃক্ষ চলিতেছে তাহা বুঝিতে পারে না এবং কোনও জীব তাহাদের চক্ষু ও আলোকের মধ্যবর্তী স্থানে আসিলে তবে তাহাকে উহারা ছায়াকারে দেখিতে পায়। তবে অধিকাংশ অনস্থিকাদের চক্ষু আদপেই নাই এবং যাহাদের উহা আছে তাহারাও মাত্র অল্প দূরের বস্তু ছায়াকারে দেখিয়া থাকে।

গল্‌দা চিংড়ী, শম্বুক, কাঁকড়া প্রভৃতি কয়েকটি জীবের স্বল্পায়তন চক্ষু থাকা সত্বেও ভাগবতকার উহাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই, কেন সেই সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য যে, এই সকল জীব দ্রব্যাদি মাত্র অতি নিকটে থাকিলে উহা ছায়াকারে দেখিয়া থাকে এবং উহা না নড়িলে উহাকে দ্রব্য বলিয়া বুঝিতে পারে না। অনেকের মতে একটি বর্ণ হইতে অপর একটি বর্ণের প্রভেদ উহারা বুঝিতে পারে না। নিরস্থিক জীবদের মধ্যে কেহ কেহ যৎসামান্য দেখিতে পাইলেও, উহাদের অধিকাংশের বর্ণবোধ নাই বলিয়া মনে হয়; কাহারও কাহারও মধ্যে উহা যৎসামান্য থাকিলে উহা একটি বা দুইটি বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইখানে 'দৃষ্টিবোধ' এবং 'বর্ণবোধ' এক কথা নয়। এতদ্ব্যতীত এই চিংড়ী ইত্যাদি জীবের চক্ষু বিনষ্ট করিয়া দিলেও উহারা তাহাদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে পারে বলিয়া মনে হয়। স্বাভাবিক জীবনে তথাকথিত স্পর্শবোধ (chemical বোধসহ) অপেক্ষা উহাদের যৎসামান্য দৃষ্টিবোধ নিতান্তই নগণ্য হইবে। হেস্ সাহেব এই চিংড়ী আদি খোলকী জীব লইয়া এই সম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে খোলকী

(crustacean) জীবমাত্রই বর্ণান্ধ (এ্যানিম্যাল মাইণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হেস্ সাহেব ইহাদের বর্ণবোধ সম্পর্কে আরও কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া সুস্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরস্থিক জীব মাত্রেই বর্ণান্ধ ('এ্যানিম্যাল মাইণ্ড'—১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে ঐ সকল জীবের বর্ণ বা রূপভেদ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই একজন বৈজ্ঞানিক ভিন্নরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁরা ইহাও বলিয়াছেন যে, মাত্র একটি বা দুইটি বর্ণের বোধ তাদের থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক বর্ণবোধ তাহাদের নাই।

ভাগবতকার চিংড়ী ইত্যাদি জীবের স্বল্পায়তন চক্ষু দেখিয়া হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে চক্ষুহীন জীব হইতেই চক্ষুষ্মান জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। চক্ষুহীন জীব হইতে চক্ষুষ্মান জীবের সৃষ্টির (ক্রমপথে) মধ্যপথে যে-সকল জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল গলদা চিংড়ী ইত্যাদি জীব তাহাদের একটির বংশধর হইবে। যতই ইহাদের পূর্বপুরুষদের দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে ততই ঐ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারও বর্ধিত হইয়াছে। তবে এই সম্বন্ধে সঠিকভাবে মতামত প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নাই।

নিরস্থিক জীবদের বর্ণবোধ সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার উহাদের শব্দবোধ সম্বন্ধে বলা যাউক। আধুনিক পণ্ডিতগণ খোলকী (crustacean), শম্বুক প্রভৃতি কোষস্থ জীব, 'তারামাছ', কেঁচুয়া প্রভৃতি নূপুরক জীব, কৃমি ইত্যাদি জীব প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাদের যা' কিছু শব্দজ্ঞান তাহা স্পর্শবোধাত্মক, বায়ুর কম্পনজনিত তাহাদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার যা' কিছু তারতম্য ঘটে। মাকড়সা জীব সম্বন্ধেও তাঁহারা এই একইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মাকড়সার জালে কম্পনহেতু স্পর্শবোধরূপে তাহাদের
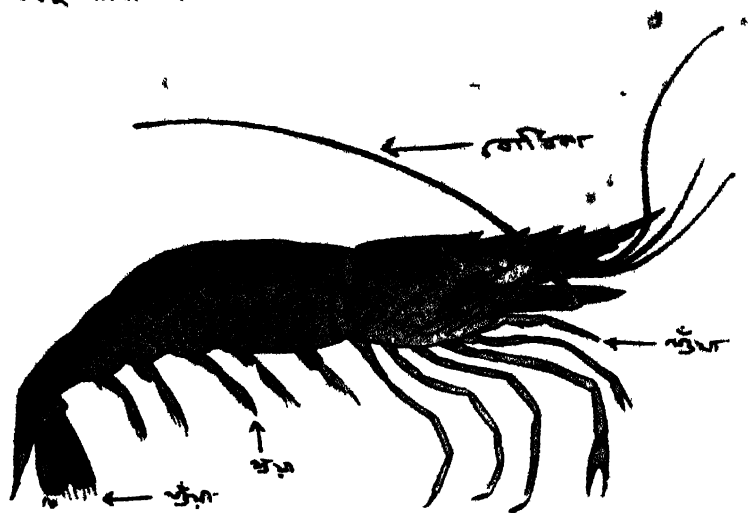
গলদাচিঙড়ী বা ক্রে-ফিস্

তারামাছ বা ষ্টার ফিস্
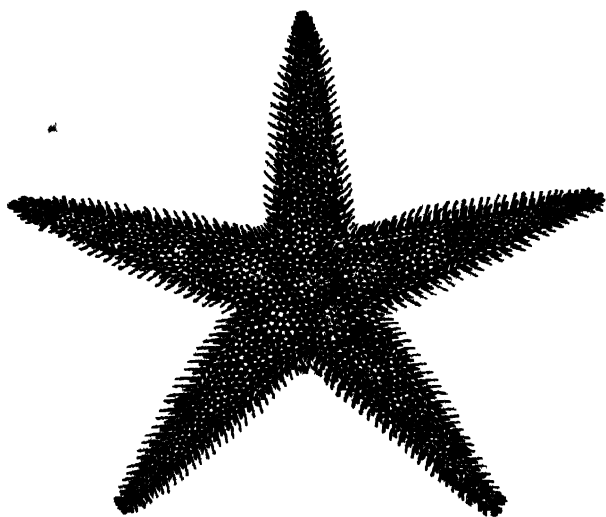
ব্যবহারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই সম্পর্কে 'এ্যানিম্যাল মাইণ্ড' নামক প্রামাণ্য পুস্তকের ১১৬-১২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বহু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে উপরোক্ত জীবদের বর্ণবোধ নাই এবং উহাদের মধ্যে একাধারে শব্দবোধ ও শব্দজ্ঞানও নাই। কিন্তু তাঁহাদের মতে ইহাদের মধ্যে স্পর্শবোধ এবং রসায়নবোধ বর্তমান আছে। আমি 'এ্যানিম্যাল মাইণ্ড' নামক পুস্তক হইতে মাত্র এইরূপ কয়েকটি জীবের উদাহরণ দিব। 'প্যারামিসিয়াম' জীব সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহাদের প্রতিক্রিয়া হইতে উহার কারণ 'কেমিক্যাল' বা 'মেকানিক্যাল' তাহা বলা দুষ্কর (পৃঃ ৬৭)। 'হাইড্রা' জীব সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহাদের প্রতিক্রিয়া 'কেমিক্যাল' ও 'মেকানিক্যাল'—এই উভয় বোধেরই সমর্থনসূচক (পৃঃ ৭০)। ইহাদের মতে 'হাইড্রা' জীব স্পর্শ দ্বারা খাদ্য হইতে অখাদ্য বাছিয়া লইতে পারে। একখণ্ড মাংস তাহাদের শুঁড়ে ছুঁয়াইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, কিন্তু মাংসের পরিবর্তে কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করিলে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায় না। অপর এক 'হাইড্রা' জীব সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে 'কেমিক্যাল' মনে হইলেও, উহাদের ব্যবহার ছিল প্রকৃতপক্ষে স্পর্শবোধক (পৃঃ ৭১)। উক্ত পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'প্ল্যানোরিয়া' জীবের খাদ্যগ্রহণ একত্রে 'কেমিক্যাল' ও 'মেকানিক্যাল' বোধের উপর নির্ভর করে। উক্ত পুস্তকের ৮৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, গলদা চিংড়ী ইত্যাদি খোলকী জীবের দেহ শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা বলিয়া ইহাদের দেহে ও বোধিকাতে (feeler) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কেশ আছে। ইহাদের স্পর্শবোধ এবং রসায়নবোধ এই উভয়বিধ বোধই এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেশরাজির সহিত সংশ্লিষ্ট।

সকল দিক হইতে বিচার করিলে কীটপতঙ্গ ব্যতীত অপরাপর

নিরস্থিকগণের অন্যান্য বোধ অপেক্ষা স্পর্শবোধই যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। বস্তুতপক্ষে শুঁয়াপোকা, কেন্নো প্রভৃতি জীব স্পর্শদ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কেঁচুয়া আদি জীবের স্পর্শবোধ এত অধিক যে, পদশব্দজনিত সামান্য ভূমির কম্পনের কারণেও তাহারা পলায়নপর হয়। স্পর্শবোধ জীবদিগের আদিবোধ। এ জন্য যৌনমিলনের পূর্বে courtship বা পূর্বরাগের জন্য স্পর্শবেদী জীব স্পর্শের সাহায্যই অধিক নেয়। পার্শ্বের চিত্রটিতে দুইটি শম্বুককে যৌন মিলনের পূর্বে courtship বা পূর্বরাগের জন্য স্পর্শের সাহায্য লইতে দেখা যায়।

এই সকল নিরস্থিকদের মধ্যে শৈত্যবোধ বা উষ্মাবোধ আছে কিনা এবং প্রাচীন হিন্দুগণ এই বোধদ্বয়কেও রসায়নবোধের ন্যায় স্পর্শবোধাত্মক মনে করিতেন কিনা সে সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করিব। এই শৈত্য ও উষ্মাবোধের তারতম্য অনুসারে নিরস্থিকদের ভৌগোলিক বিস্তার সাধিত হয় কিনা সেই সঙ্গে ইহাও আমার আলোচ্য বিষয় হইবে।

আমি নিজেও এই দেশের কয়েকটি নিরস্থিক জীব লইয়া এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষার জন্য আমি সর্বপ্রথম শুঁয়াপোকা ও কেন্নো জীবকে বাছিয়া লই। এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উহাদের কোনও প্রকার পছন্দাপছন্দ (PLEASANT & UNPLEASANT) জ্ঞান আছে কিনা এবং উহারা মূলতঃ স্পর্শ কিংবা রস পছন্দ করে কিনা তাহা অবগত হওয়া। তবে এই পরীক্ষার জন্য আমি স্বনির্মিত একটি যন্ত্রের সাহায্য লই। এই যন্ত্রটির একটি চিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। এই যন্ত্রটি নির্মাণের জন্য প্রথমে একটি চারিপদ যুক্ত লৌহ ফ্রেম তৈরী করিয়া লই এবং তাহার পর চিত্রে প্রদর্শিত দুইটি লৌহ নির্মিত

ক

মনো-বীক্ষণ যন্ত্র
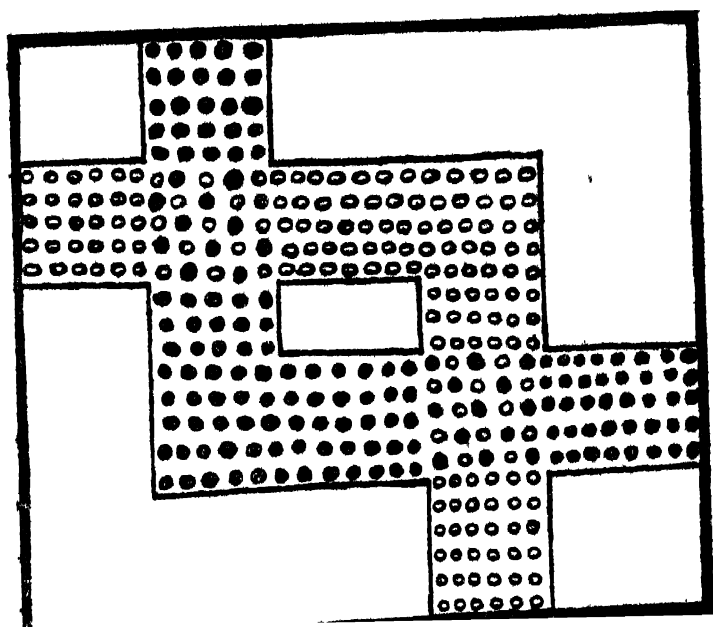
পথ তৈয়ারী করিয়া উহার উপর উহাদের সংলগ্ন করি। এই দেশে শুঁয়া-পোকা সকল 'নাজনা' গাছের পাতায় অধিক সংখ্যায় জন্মে। এইজন্য স্বাভাবিক নাজনা পাতা চূর্ণীকৃত করিয়া আমি চিত্রের 'ক' চিহ্নিত পথে লেপন করিয়া দিই এবং তাহার পর ঐ বৃক্ষের রসযুক্ত পাতা বাটিয়া রসাল করিয়া ঐ যন্ত্রের 'খ' চিহ্নিত পথে লেপন করিয়া দিই। কিন্তু ঐ দুইটি পথের সংযোগস্থল দুইটিতে আমি এই উভয়বিধ (শুষ্ক ও রসাল) পদার্থের বিন্দু বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করি। ইহার পর একটি শুঁয়াপোকা পথদ্বয়ের সংযোগ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা উভয় পথের সংযোগ-স্থলে কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা করিয়া বারে বারে 'ক' চিহ্নিত পথটিই বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে এক একটি নিরস্থিক জীব এক একটি বৃক্ষের পাতা যে পছন্দ বা অপছন্দ করে তা প্রমাণ করা যায়।

এদেশের পল্লী অঞ্চলে গলদা চিংড়ী জীবটি লইয়া পরীক্ষা করা অতি সহজ কাজ। কারণ শীতকালে কুয়াশা হওয়া মাত্র ইহারা পুষ্করিণীর কিনারায় আসিয়া জড় হয়। এইজন্য মানুষ ও শেয়াল ইহাদের সহজেই ধরিয়া লইয়া থাকে। এই সময় কুয়াশার তলায় এদের জীবনযাত্রা অনুধাবন করা অধিক সহজ। কারণ কুয়াশার কারণে এই সময় এরা ছায়াকারেও কোনও দ্রব্য দেখিতে পায় না। এই সময় আমি দেখিয়াছি যে, ইহারা তাহাদের লম্বমান বোধিকা বা শুঁয়ার সাহায্যে লতাগুল্ম স্পর্শ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সুযোগে আমি ইহাদের বর্ণবোধ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। এই পরীক্ষার জন্য আমি একটি সরলমুখী এবং একটি বক্রমুখী শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চের সাহায্য লই। প্রয়োজনমত ইহাদের মুখ বিভিন্ন রঙের চক্রাকার কাঁচ দ্বারা আবৃত করিয়া দিই। আমি দেখিয়াছি যে, এই জীব শ্বেত

স্পর্শজ্ঞান সহযোগে শম্বুকের পূর্বরাগ

(Oourtship of Garden snail)

আলোক আদপেই পছন্দ করে না। তবে যদি লোহিত আলো উপর হইতে (Vertically) সরলভাবে তাহাদের উপর ফেলা যায় তাহা হইলে অন্ধকার অপেক্ষা উহারা লোহিত আলোকই বেশী পছন্দ করে। কিন্তু এই লোহিত আলোক বক্র মুখী টর্চের সাহায্যে পার্শ্ব হইতে (Horizontally) ফেলিলে উহা তাহারা পছন্দ করে নাই। এই লোহিত আলোক ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ তাদের উপর কিছুমাত্র কার্যকরী হয় নি ; এইরূপ পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, এই জীবে বর্ণবোধ সবে সুরু হইয়াছে।

এই গলদা চিংড়ী ব্যতীত এদেশের পল্লী অঞ্চলে শম্বুক জীব লইয়া পরীক্ষা করারও সুযোগ আছে। গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যাইলে ইহারা স্থলপথে অন্য এক পুষ্করিণীর সন্ধানে বাহির হয় ; কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, বহুক্ষেত্রে ইহাদের চলার পথে বৃক্ষ পড়িলে ঐ বৃক্ষের উপর ইহারা উঠিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কিছুদূর উঠিয়া স্পর্শ দ্বারা অন্য বস্তু বুঝিয়া পুনরায় নিম্নে আসিয়াছে, কখনও কখনও ইহারা তাহাদের পূর্ববাসস্থান ঐ পুষ্করিণীতেই নামিয়া গিয়াছে। এইভাবে চলিয়া মাত্র সামান্য সংখ্যক শম্বুক পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে পৌঁছাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবনযাত্রার জন্য দৃষ্টিবোধ ইহাদের খুব বেশী কাজে আসে না। তবে এই সুযোগে আমি অপর একটি অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ইহাদের উপর করিয়া লই। আমি ইহাদের চলার পথে এক বালতি জল ঢালিয়া দেখিয়াছি যে, অস্বাভাবিক ভাবে ইহারা এই জলসিক্ত পথ এড়াইয়া চলিতেছে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে, ইহাদেরও মন বলিয়া এক পদার্থ বিদ্যমান আছে। এই সামান্য রূপ-জলসিক্ত পথে আসিয়া নিশ্চয়ই তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা বুঝি তাহাদের পূর্বতন বাসস্থান ঐ বিশুষ্ক প্রায় পুষ্করিণীটিতেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই শম্বুক জীব একখণ্ড কাষ্ঠকে স্পর্শমাত্র এড়াইয়া চলে, কিন্তু ব্যাক্‌টিুয়ার লাম্প স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ থামিয়া উহাদের সে ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহাদের এইরূপ ব্যবহার হইতেই ইঁহাদের যে মন আছে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু মৎকৃত উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা উহাদের অধিকতর মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পর্শবেদী জীবের স্পর্শ জ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইল। লঘু, গুরু, উষ্মা, শৈত্য প্রভৃতি এই স্পর্শ জ্ঞানের এক একটি অংশ বিশেষ।* ইহাদের সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করিব। এইবার রসবেদী জীবের রসবোধ সম্বন্ধে বলা যাউক।

---

* Hot বা অতি উষ্ণ (warm নহে) এবং অতি শৈত্য, Pain বা কষ্টবোধের সামিল। অতি শৈত্য বা অতি উষ্মা জীবের মূল টিসুকে আহত করে, এইজন্য তারা জ্বালা বা কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার কষ্টবোধের কথা এইখানে বলা হইতেছে না।

রসবেদী জীব

সাধারণভাবে মৎস্যকুলের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে অবগত থাকা সত্বেও ভাগবতকার মৎস্যজীবকে রসবেদী জীব বলিলেন কেন এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, মৎস্য একপ্রকার স্বাদের সহিত অপর প্রকার স্বাদের সামান্য প্রভেদও বুঝিতে সক্ষম। অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান থাকিলেও উহার সম্যকরূপ বোধ তাহাদের নাই। বলা বাহুল্য যে, বহুক্ষেত্রে জ্ঞান থাকিলেও কদাচ উহার বোধ জন্মিয়া থাকে। এক পৃথিবীতে বাস করিলেও এক একটি জীবের জন্য উহা ভিন্নরূপের হইয়া থাকে। মানুষের পৃথিবী ও মৎস্যের পৃথিবী কদাচ এক হইতে পারে না। আমি মৎস্যজীবের আবাসভূমির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বিবিধ ইন্দ্রিয়াদির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মানুষের ন্যায় মৎস্যের চক্ষু অত সুগঠিত নয়, কারণ গভীর জলে বাস করায় উহাদের দৃষ্টিশক্তির সবিশেষ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাদা বালি মিশ্রিত গাছগাছড়া লাঞ্ছিতজল দৃষ্টি প্রতিহত করিতে বাধ্য। জল অতীব স্বচ্ছ হইলেও মৎস্য অধিক দূর পর্যন্ত দেখিতে সক্ষম হয় না। সামান্য দূরের দ্রব্যাদিও তাহারা ছায়ার আকারে দেখিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মৎস্যের চক্ষু দুই পার্শ্বে থাকায় আমাদের চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি ইহারা একীভূত (focus) করিতে সক্ষম হয় না। কোন স্থির দ্রব্য নড়িয়া না উঠিলে উহাকে তাহারা বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না। উহাদের চক্ষুদ্বয় কোনও প্রকারে focus করিতে সক্ষম হইলেও এক ফুট আন্দাজ দূর পর্যন্ত তাহা উহারা করিতে পারে। অতি বৃহৎ মৎস্য অবশ্য

ইহা অপেক্ষা আরও দূরের দ্রব্য এই উপায়ে দেখিতে সক্ষম। কিন্তু ক্ষুদ্র মৎস্যগণ এক ফুটের ওপারের কোন দ্রব্য ছায়াকারেও দেখিতে পায় না।

ইহা ছাড়া গভীর জলে বর্ণবোধ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা জানি বেগুনি, নীল, সবুজ, পীত, কমলা প্রভৃতি সাতটি বর্ণের সমষ্টি দ্বারা শ্বেত আলোক গঠিত। জলমধ্যে লোহিতালোক একশ মিটারের* নিম্নে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ পাঁচশত মিটারের নীচে জলমধ্যে সমস্ত সবুজ আলোক বিনষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র বেগুনি রং-ই এক হাজার মিটার নিম্ন পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। ডুবুরিরা মাত্র তিরিশ মিটার জলের মধ্যে নামিলে লোহিত বর্ণকে আর লোহিত বলিয়া বুঝিতে পারে না। জলমধ্যেও প্রতিহত (refraction) আলোকের কারণে দৃষ্টিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বল্পায়তন স্থানের মধ্যে মৎস্য যে দেখিতে পায় তাহা স্বীকার্য। তবে গভীর জলে উহা তাহাদের জীবনধারণের জন্য কতটুকু সাহায্যে আসে তাহা বলা বড় শক্ত।

জলরাশি † উত্তম দৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ নয় তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মৎস্যের সুবৃহৎ চক্ষু আছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি হইতে পারে তাহা বিবেচ্য। কিন্তু মৎস্যের চক্ষু আলোক দর্শন ছাড়া আলোক শোষণও করিতে পারে। আমরা জানি জীব জগতে অনুকরণ বা MIMICRY বলিয়া একটি ধর্ম আছে। বহু জীব তাহাদের দেহের বর্ণ তাহাদের বাসস্থানের বর্ণের অনুরূপ করিয়া এমন ভাবে মিশাইয়া থাকে যে শত্রুগণ সহজে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির

* এক মিটার প্রায় ১'১ গজের সমান।

† পুস্তকের পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জী

করিতে পারে না। এমন বহু কীট-পতঙ্গ আছে যাহারা এমনভাবে বৃক্ষপত্রাদি মধ্যে আত্মগোপন করে যাহাতে তাহাদের মনে হয় উহারা বুঝি ঐ বৃক্ষেরই একটি পত্র বা কোন অংশবিশেষ। কোনও পতঙ্গের শূককীট উর্ধ্বদেহী হইয়া এমনভাবে বৃক্ষাদির শাখায় নিজেদের আটকাইয়া রাখে যাহাতে মনে হয় উহারা বুঝি ঐ বৃক্ষেরই একটি twig হইবে। কেহ কেহ শত্রু দর্শনে শুইয়া পড়িয়া মৃতের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে। অনুরূপ ভাবে বহু মৎস্য সম্পর্কেও দেখা গিয়াছে যে, উহারা নীল, সবুজ, পীত, কমলা, ধূসর উদকে থাকিলে তাহাদের দেহের বর্ণ যথাক্রমে নীল সবুজ পীত কমলা ও ধূসব আভাযুক্ত হইয়া গিয়াছে। [তবে লাল আলো বিশেষ কার্যকরী হয় নি।] য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহাদের চর্মে বিশেষ একপ্রকার বর্ণসম্ভূত (Pigment controlling) ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ব্যবস্থার সহিত উহাদের সিমপ্যাথেটিক নারভাস সিস্টেমের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। কিন্তু এইরূপ কলার স্টিমিউলাস জনিত বর্ণ পরিবর্তন ইহাদের চক্ষুর মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে, কারণ ইহাদের চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া দিলে উহাদের দেহের বর্ণ এই অবস্থায় কখনও পরিবর্তিত হয় নি। ইহাদের একটি চক্ষু কৃষ্ণ বর্ণের এবং অপর চক্ষু শ্বেত বর্ণের groundএ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের চর্ম ধূসর বর্ণের হইয়া গিয়াছে।

[ডাঃ KAMMERER সাহেব য়ুরোপের স্যালাম্যাণ্ডার জীবের টেডপোল বিভিন্ন বর্ণের বাক্সের জলে পুষিয়া অনুরূপ ফলই পাইয়াছেন। ইহাদের কয়েক পুরুষ যাবৎ হলদে তল ও পার্শ্ব যুক্ত বাক্সে পুষিয়া ইনি দেখিয়াছেন যে হলদে রেখা যুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের এই সকল জীব পুরাপুরি হরিদ্রা বর্ণের হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য য়ুরোপীয় পণ্ডিত এক প্রকার ভেক লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা দ্বারা ঐ একই রূপ ফল পাইয়াছেন। আমি

স্বয়ং আমার বাটীর একটি কক্ষের দেওয়াল ও ছাদতল নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখিয়াছি যে ঐ স্থানের পূর্ব বাসিন্দা প্রায় শ্বেত বর্ণের টিকটিকি তিন পুরুষ বাদে নীলাভ বর্ণের হইয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য ইহাদের এই বর্ণ পরিবর্তন মৎস্যের ন্যায় অনুরূপ কারণে চক্ষুর মাধ্যমে হইয়া থাকে। তবে ইহাদের আশৈশব একই প্রকার বর্ণযুক্ত আবাসে কয়েক পুরুষ বাস করা চায় বলিয়া মনে হয়।

একণে উপরোক্ত তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, ঐ সকল জীবের চক্ষু একটি specialized ইন্দ্রিয় নয়। যে ইন্দ্রিয় বা অপাঙ্গ দ্বারা দুইটি কার্য একত্রে সমাধা হইতে পারে তাহাদের স্পেশিয়ালাইজড্ ইন্দ্রিয় বা অপাঙ্গ বলা যাইতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে ইহাদের চক্ষু দর্শন সম্পর্কে এক শক্তিশালী ইন্দ্রিয় নাও হইতে পারে। উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহ সত্য হইলে ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিবোধ থাকিলেও অধিক বর্ণ বোধ না থাকাই স্বাভাবিক।]

মৎস্যজীবের কর্ণযন্ত্র আছে বটে। কিন্তু উহার দ্বারা তাহারা দেহভার (balance) রক্ষা করে মাত্র। কর্ণের দ্বারা জীবগণ শ্রবণ ও ভাররক্ষা, এই উভয়বিধ কার্য সমাধা করে। কর্ণযন্ত্র অপসারিত করিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। কর্ণের অংশবিশেষ অর্ধচন্দ্রাকার নলীত্রয়ে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। এই জলীয় পদার্থের উত্থান ও পতন হইতে জীবগণ তাহাদের দেহের সমতা বা ভার রক্ষা করিতে পারে। মৎস্যজীবের কর্ণের এই বিশেষ অংশ বর্তমান থাকিলেও উহার শ্রবণাংশ বা কোচেলা ইহাদের নাই বলিলেই চলে। এইজন্য মৎস্য কর্ণের দ্বারা তাহাদের ভারসাম্য রক্ষা করে মাত্র। বহু বৈজ্ঞানিকের মতে মৎস্য একেবারেই শুনিতে পায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জলের ভিতর বা বাহিরে শব্দ করিলে উহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

আনয়ন করে। জলের উপর হইতে উচ্চ শব্দ করিলে যে, চারের মাছ পলাইয়া যায় ইহা অতীব সত্য। কিন্তু ইহা স্পর্শবোধাত্মক (tactile) রূপে জলের কম্পনজনিত ঘটে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই শব্দ তাহারা (bone conduction) অস্থিসঞ্চার দ্বারা লাভ করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মৎস্য একটি শব্দ হইতে অপর একটি শব্দের স্বরূপ বা প্রভেদ বুঝিতে কখনও সমর্থ হয় নাই।

আমরা জানি যে, মৎস্যের দেহে পটকা (air bludder) নামক একটি অপাঙ্গ আছে। এই পটকার মধ্যে গ্ল্যাণ্ড বা পিণ্ড হইতে গ্যাসের সৃষ্টি করিয়া বা দেহ হইতে উহা নির্গত করিয়া সাবমেরিনের ন্যায় উহারা জলমধ্যে উঠা-নামা করে। সাবমেরিনে গ্যাসের বদলে জলভরা হয়। এই পটকার একটি মুখের সহিত ইহাদের কর্ণযন্ত্রের তিনখণ্ড অস্থির সংযোগ আছে। এমনও হইতে পারে যে মৎস্যজীবের পার্শ্বরেখা বা lateral lineএর বা মস্তক বা লেজের অস্থির মধ্য দিয়া ঐ পটকার সাহায্যে শব্দের কম্পন অস্থিবাহী হইয়া থাকে। যেরূপেই হউক মৎস্যজীবের যৎসামান্য শব্দবোধ নিশ্চয়ই আছে।

মৎস্যজীবের এই যৎসামান্য শব্দবোধ এই দেশের পল্লীঅঞ্চলের মৎস্যশিকারিগণ পরিলক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞানের কারণে ছিপের সাহায্যে মৎস্য শিকারকালে তাঁহারা জলের নিকট কাহাকেও উচ্চ শব্দ করিতে দেন না।

এই মৎস্যজীবের দেহের দুই পার্শ্বের দুইটি পার্শ্বরেখা (lateral line) যে আছে তাহা আমি উপরের অনুচ্ছেদে বলিয়াছি, কিন্তু উহাদের প্রকৃত ধর্ম কি তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণিত হয় নাই। কেহ কেহ উহাদের স্পর্শবোধক বা জলের গভীরতা বা চাপ নির্দেশক বলিয়া মনে করেন। আমি কিন্তু উহাদের রসবোধাত্মক বলিয়া মনে করি।

জলের মধ্যে তাপের সমতা থাকায় ইহাদের উষ্মা বা শৈত্যবোধের সুবিধা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের দেহ কঠিন শলাকার দ্বারা আবৃত থাকায় উহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্পর্শবোধের সুযোগ কম। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে অবশ্য ইহাদের স্পর্শ, কষ্ট, চাপ প্রভৃতির জ্ঞান প্রায় মানুষেরই অনুরূপ। যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলেও ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ তাহাদের কোথায়? আমার মতে ইহাদের সামান্য স্পর্শ জ্ঞান থাকিলেও উহার বোধ তাহাদের নাই, এবং উহা তাহাদের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে অপ্রতুল।

মৎস্যজীবের গন্ধবোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সন্দেহ আসিতে পারে। কারণ, তাহাদের ধারণায় জল বায়ুব ন্যায় গন্ধের উপযুক্ত বাহক হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গন্ধকণা নাসারন্ধ্রে অবস্থিত জলীয় পদার্থে মিশ্রিত হইয়া গন্ধবোধ আনয়ন করে। বাস্তবক্ষেত্রে মৎস্যজীবে আমাদের মতই গন্ধবোধ ও রসবোধ বর্তমান। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উহাদের প্রভেদ বুঝা কঠিন। কারণ এই গন্ধও রসের সহিত রসের আকারে মৎস্যের নিকট পৌঁছে।

সম্ভবতঃ এই কারণে প্রাচীন হিন্দুগণ উহাদেব 'রসবেদী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখন বিবেচনা করিতে হইবে এই গন্ধবোধ হইতে উহাদের রসবোধ বহুগুণে শক্তিশালী কিনা? বস্তুতঃপক্ষে রসকোষ (taste buds) মৎস্যের শুধু মুখবিবরে নয়, উহাদের মস্তকে, পুচ্ছে ও সারা দেহে উহারা বিস্তৃত আছে। এই সম্পর্কে পার্কার হ্যাসওয়েল Vol. I ১০৫ পৃঃ এবং 'সায়ন্স অফ্ লাইফ' Part III—৮১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ইহাদের গুম্ফানুরূপ বোধিকাতে পর্যন্ত বহু রসকোষ আছে। এইজন্য উহার দ্বারা তাহারা ভূমির স্বরূপ বুঝে এবং উহা হইতে খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লইতে পারে। কয়েকটি মৎস্য তাহাদের
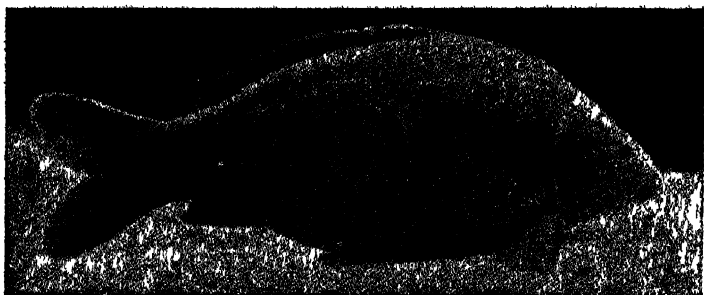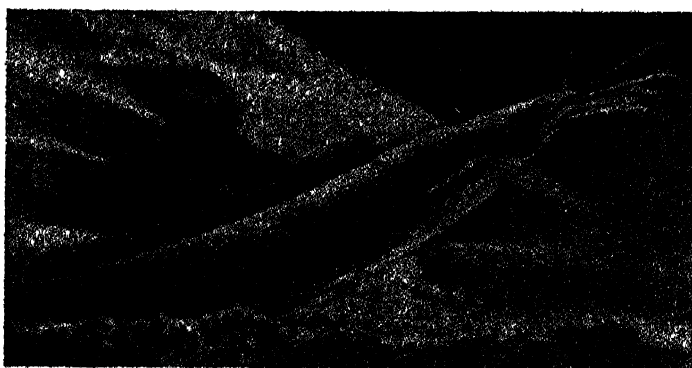
সারা দেহ দ্বারা রস আস্বাদন (Carp-fish)

সারা দেহ দ্বারা রস আস্বাদন (Cat-fish)

সারা দেহের দ্বারা ছুঁদির স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এদেশের কৈ, শিঙি প্রভৃতি এবং য়ুরোপের কার্প, ক্যাট প্রভৃতি মৎস্যের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। পার্শ্বে 'সায়েন্স অফ্ লাইফ্' হইতে উদ্ধৃত দুইটি ফটো চিত্র হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, মৎস্যের রসবোধ উহার গন্ধবোধ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। যে কোন কারণেই হউক ভাগবতকার বিশ্বাস করিতেন যে, মৎস্যজীব একটি স্বাদের সহিত অপর স্বাদের প্রভেদ বুঝিতে পারে।

আমি এই সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নদর্শিতরূপ একটি 'রসবিদ্', যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলাম। খাদ্যমিশ্রিত উদক্ জলতলে পৌঁছানোর সময় osmetic pressure যাহাতে না প্রতিবন্ধক ঘটাইতে পারে এইজন্য কাচনির্মিত একটি সরু নলের মধ্যে একটি লৌহ শিক বা তার নামাইয়া দিয়া উহার প্রান্তে একটি রবার আবৃত লৌহের চাকৃতি সংযুক্ত করা হয়—যাহাতে উপর হইতে ঐ শিক বা তার টানিলে ঐ নলের নিম্নের মুখ বন্ধ হইবে এবং উহা ঠেলিয়া দিলে উহার মুখ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। জলমধ্যে কম্পন রোধ করিবার জন্য এই তারযুক্ত চাকতি সহ সরু কাচের নলটি অপর একটি স্থূলকায় কাচের নলের মধ্য দিয়া নামাইয়া দেওয়া হইত। ইহার পর পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ স্বচ্ছ নলের মধ্যকার খাবার দেখিয়া নিকটবর্তী মৎস্যরা ঐখানে আসিলেও দূরবর্তী কোনও মৎস্য উহার নিকটে আসে নাই। কিন্তু ঐ খাদ্য জলের সাহত মিশ্রিত হইবামাত্র দূরবর্তী মৎস্যগণও চতুর্দিক হইতে উহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। এই পরীক্ষা আমি একটি নাতিবৃহৎ আলোকজ্জল কাচের আধারের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মৎস্যের সাহায্যে সমাধা করি।

পর পৃষ্ঠার যন্ত্রের সাহায্যে আমি উহাদের গন্ধবোধ সম্পর্কেও পরীক্ষা

করিয়াছি। আমার মতে গন্ধ উগ্র হইলে তবে উহারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণ গন্ধ উহাদের খাদ্যের নিকট আকৃষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু অপর দিকে সামান্য মাত্র রস দূর হইতে তাহাদের খাদ্যকণার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে। ইহা ছাড়া সরল ও বক্রমুখী ইলেকট্রিক টর্চের

রসবিদ্ যন্ত্রম
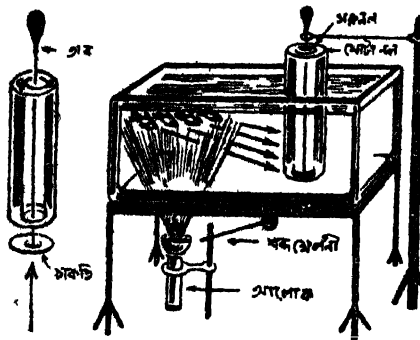
মুখে প্রয়োজন মত বিবিধ রঙিন গোল কাঁচ সংলগ্ন করিয়া উহাদের যথাক্রমে ঐ জলাধারে অনুরূপভাবে নামাইয়া দিয়া আমি দেখিয়াছি যে উহারা অত্যুগ্র শ্বেত আলোক আদপেই পছন্দ করে নি। কিন্তু স্বল্প শ্বেতালোক এবং নীল ও সবুজ বর্ণ তাহারা পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য রঙিন আলোকে উহাদের ব্যবহারের কোনও তারতম্য ঘটে নি। গলদা প্রভৃতি খোলকী জীব অপেক্ষা ইহাদের বর্ণবোধ সামান্য অধিক হইলেও পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় উহা নিতান্ত নগণ্য।

এতদ্ব্যতীত আমি এই মৎস্যদিগের জীবনপদ্ধতি এদেশের পুষ্করিণী ও তড়াগাদিতেও লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপ অবলোকন দ্বারা আমি বুঝিয়াছি যে রুই, কাতলা, পোনা প্রভৃতি কয়েকটি মৎস্য টাটকা দ্রব্যের উগ্র গন্ধ দ্বারা সহজে আকৃষ্ট হয়। এই জন্য এদেশের মৎস্য-

শিকারীরা উগ্র গন্ধযুক্ত টাটকা চার জলে ফেলিয়া উহাদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু যেহেতু এই গন্ধ জলমধ্যে অধিক দূর যায় না সেইহেতু ঐরূপ চারে ঐ সকল মৎস্য আসিতে দেরী হয়। কিন্তু কই, শিঙি, মাগুর প্রভৃতি যে সকল মৎস্যকে এদেশে জাওলা মাছ বলা হয় তাহাদের রস বা স্বাদ-পূর্ণ চার দ্বারা সহজে আকৃষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের কিনারার নিকট অতি সহজে আনিবার জন্য মৎস্যশিকারীরা পচ্যমান চার প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ষার সময় কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মৎস্য ভূমির স্বাদ সারা দেহ দ্বারা গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

তবে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, স্বাদযুক্ত চার এদেশে বহু মৎস্যকেই কম বা বেশী সময় সাপেক্ষ জলের কিনারার নিকট আনয়ন করিতে সক্ষম। কারণ মৎস্য মাত্রেরই সারা দেহব্যাপী অল্পাধিক রসকোষ বিদ্যমান থাকে।

ঋতুকালে কোনও কোনও জাতীয় স্ত্রী-মৎস্যদিগের দেহ হইতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ (Secretion) নির্গত হয়। উহা ঐজাতীয় পুং-মৎস্যের দেহ স্পর্শ করা মাত্র তাহারাও জনন-বীজ ছাড়ে। অর্থাৎ এইভাবে পরস্পর পরস্পরের সন্নিধান অবগত হইয়া তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে জনন-বীজ ছাড়িতে থাকে। ভাসিতে ভাসিতে এই পুং-বীজ স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইলে ঐজাতীয় মৎস্যশিশু উৎপন্ন হয়।

ইহা ছাড়া জননকালে কোনও কোনও মৎস্য জীব জলমধ্যে একটি এলাকা নিজস্ব করিয়া রাখে। অপর কোনও ঐ জাতীয় মৎস্যকে ইহারা এই সময় উহার সীমানার মধ্যে আসিতে দেয় না। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের এই এলাকার পরিধি তাহাদের দৃষ্টি শক্তির বহির্ভূত অঞ্চল পর্যন্তও বিস্তৃত থাকে। এইরূপ অবস্থায় মনে করা যাইতে পারে যে তাহাদের এলাকা বা Zoneএর দৃষ্টিবহির্ভূত অঞ্চলে অন্য মৎস্য অনধিকার

গন্ধবেদী জীব

'রসবেদী' জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার গন্ধবেদী জীব সম্বন্ধে বলিব। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গকে আর্য মনীষিগণ 'গন্ধবেদী পর্যায়ভুক্ত করেন। কীটাদি জীব সাধারণ দৃষ্টিতে মৎস্যাদি জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব। তথাপি মানসিক পর্যায়ে ভাগবতকার তাহাদের 'রসবেদী' অর্থাৎ মৎস্যাদির উপরে স্থান দিলেন কেন সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাগবতকারের মতে কীটপতঙ্গ জীবের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মধ্যে গন্ধবোধই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ একপ্রকার গন্ধ হইতে অপর প্রকার গন্ধের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রভেদও ইহারা বহুদূর হইতে ধরিতে পারে। তাঁহাদের মতে, আহারাদি, চলাফেরা, প্রজনন প্রভৃতি কার্যে ইহারা ইহাদের ঘ্রাণশক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া, গন্ধ উহাদের বহু দূর হইতে আকৃষ্ট করিতে পারে।

প্রথমে উই, পিপীলিকার কথা বলা যাউক। এই পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণী সামাজিক জীব। ইহারা দুর্গসম বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে রাণী, কর্মী প্রভৃতি তো আছেই, ইহা ছাড়া এরা মনুষ্যের গরু পালনের ন্যায় এক প্রকার কীটকে (Ant-cow) পুষিয়া দুগ্ধাহরণের ন্যায় রস পান করে। *

* Plant-lico or Aphids and coccids হইতেছে ইহাদের গরু। উহারা বিশেষ প্রকার মুখাঙ্গ দ্বারা উদ্ভিদ হইতে রস আহরণ করিতে পারে। কিন্তু পিপীলিকারা তাহা পারে না, কারণ উহাদের মুখাঙ্গ কেবল দংশনের উপযুক্ত। এইজন্য পিপীলিকা ঐ সকল জীবকে পালন করিয়া উহাদের নিকট হইতে বিশেষ উপায়ে ঐ রস আহরণ করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া এদের কোনও কোনও শ্রেণী এক প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উদ্ভিদও (Fungus) তাদের ঐ দুর্গ প্রাকারের মধ্যে উহাদের দেহের নিষ্ক্রমণ (মল) জনিত সার বা Manureএর সাহায্যে বপন করিয়া তাহা আহার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহাদের স্বজাতিত্ব বোধও আছে; কিন্তু তাহাদের এই জটিল জীবনযাত্রার জন্যে প্রতিটি পদে তাহাদের (প্রায়শঃ ক্ষেত্রে) প্রয়োজন হয় অত্যুগ্র গন্ধবোধ। এই গন্ধবোধ দ্বারাই তারা শত্রু মিত্র ও স্ত্রীপুরুষ চিনিতে সক্ষম। অপর কোনও জাতীয় কীট কিংবা সমশ্রেণীর অন্য এক বাসার কীট তাহাদের ঐ দুর্গে ঢুকিলে তারা তাদের গন্ধ দ্বারাই চিনিয়া লইয়া তাদের সহিত যুদ্ধরত হয়। এমন কি গন্ধ দ্বারাই উহারা বাসায় ফিরিবার পথ পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করে। এইভাবে দেখা যায় যে, উহারা বহু প্রকার গন্ধের মধ্যে সামান্যতম প্রভেদও বুঝিতে সক্ষম। এই পিপীলিকা প্রভৃতির দৃষ্টি বা শব্দ জ্ঞানের প্রশ্ন সম্ভবতঃ উঠে না। ইহাদের স্পর্শ ও রসবোধ থাকিলেও ঐ দুইটি উহাদের গন্ধবোধ অপেক্ষা অতো শক্তিশালী নয়। সামান্য রূপ পরীক্ষা দ্বারাই ইহা অবগত হওয়া যাইতে পারে।

আমি পিপীলিকা সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত রূপ একটি যন্ত্র নির্মাণ করি। ইহা একটি অতি সাধারণ গোলাকার লৌহ নির্মিত যন্ত্র মাত্র। ইহার নির্মাণ প্রণালী পর পৃষ্ঠার চিত্র দুইটি হইতে বুঝা যাইবে। ইহা পিপীলিকাদের মনোবিজ্ঞান পরিলক্ষ্য করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে।

এই যন্ত্রের উপরিদেশে মিষ্টান্ন রাখিলে পিপীলিকাসমূহ ঐ যন্ত্রের পাদদেশে উভয় দেওয়ালের মধবর্তী ফাঁকের নিকট আসিয়া সামান্যক্ষণ ঊর্ধ্বমুখী হইয়া পরক্ষণেই অন্যত্র প্রস্থান করে; কিন্তু কদাপি উহার ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টামাত্রও করে না, অথচ ঐ যন্ত্রে লেশমাত্রও কোনও রসায়ন পদার্থ সংযুক্ত করা হয় নাই। যে পিপীলিকাকে মিষ্টির

সন্ধানে জলে পর্যন্ত সন্তরণ করতে দেখা যায় তাহাদের এইরূপ বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কি? আমি মনে করি, এই উভয় দেওয়ালের মধ্যবর্তী
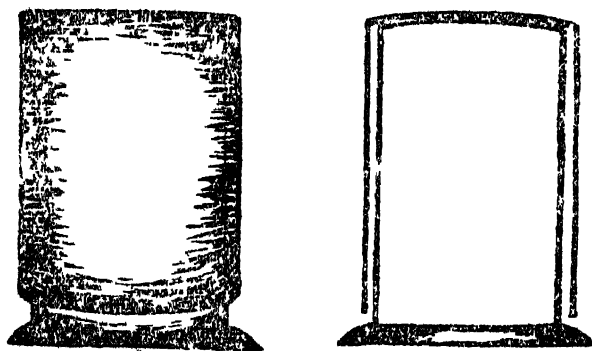
ফাঁকের নিকটে আসিয়া উহারা মনে করে উহা বুঝি বা তাহাদের গর্ত বা বাসা, কিন্তু তাহাদের গর্তের বা বাসার নিজস্ব গন্ধ উহাতে না পাইয়া উহা ভিনজাতীয় পিপীলিকার বাসা মনে করিয়া উহারা অন্যত্র প্রস্থান করে। যদি কেহ মনে করেন যে, অত ঘুরাঘুরি করিয়া উপরে উঠিবার ক্লেশ তাহারা সহ্য করিতে চায় না তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে ঐ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পিপীলিকা জীবের মন বলিয়া এক বস্তু আছে। প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম ঐ বিশেষ স্থানে আসিয়া উহারা মিষ্টির গন্ধ আর পায় না বলিয়াই আর উহার ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষার পর আমি দেখিতে পাই যে, আমার এই ধারণা সত্য নয়।

প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে, গন্ধবোধের কারণে পিপীলিকারা যে পথ দিয়া বহির্গত হয় আঁকিয়া বাঁকিয়া সেই পথ দিয়াই তাহারা বাসায় ফিরে। ইহাদের পথের সম্মুখে ধূলিকণার উপর আঁচড় কাটিয়া দিলে

তাহারা অন্ত পথ গ্রহণ করে। কারণ ধূলিকণা অপসারণের কারণে গন্ধও অপসারিত হইয়া থাকে।

মৌমাছি মক্ষিকা বোলতা প্রভৃতি জীবের মধ্যে সুস্পষ্ট চক্ষু দেখা যায়। ইহাদের দৃষ্টিজ্ঞান তো আছেই এমন কি কয়েকটি বর্ণ সম্পর্কে উহাদের বোধও আছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাদের গন্ধবেদী জীব বলিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে অনেক অপরূপ ও সুন্দর পুষ্পাদি বস্ত্রাবৃত করা সত্ত্বেও পতঙ্গগণ সেই পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, রূপ অপেক্ষা গন্ধই তাহাদের অধিকতর আকৃষ্ট করে। কয়েকটি পরীক্ষাতে অবশ্য ইহাও দেখা গিয়াছে যে গন্ধকণা অপসারণ করার পরও কয়েকটি পতঙ্গ ঐ পুষ্পের রূপ দেখিয়া উহার উপর বা উহার নিকটে নামিয়াছে ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। আমার মতে উহারা ঐ পুষ্পের নিকটে আসিয়া যাওয়ার কারণেই বোধ হয় উহাদের মধ্যে ঐ রূপ ব্যবহার দেখা গিয়াছে। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, মানুষের অবোধ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গন্ধকণার সূক্ষ্মাংশ ঐ পুষ্প হইতে দৃশ্যমান গন্ধকণার অপসারণের পরও থাকিয়া গিয়াছিল। কীটপতঙ্গের গন্ধবোধ যে মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবের গন্ধবোধ অপেক্ষা বহু গুণে তীক্ষ্ণ তাহা অনস্বীকার্য নয়। এই গন্ধবোধ দ্বারা উহারা শত্রু-মিত্রের প্রভেদ বুঝে এবং স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইতে পারে। মথ (Moth) জাতীয় পুং-পতঙ্গ তাহার স্ত্রী-পতঙ্গকে গন্ধের সাহায্যে এক মাইল দূর হইতেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। এই জাতীয় স্ত্রী-পতঙ্গের উদরের বহির্ভাগে যে গন্ধেন্দ্রিয় (Organ) আছে উহা বিনষ্ট করিয়া দিলে কিন্তু উহাদের পুং-পতঙ্গ আর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।

[পতঙ্গজীবদের দৃষ্টিবোধ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সমাধা করিয়াছেন। যে সকল পুষ্প হইতে এ সকল পতঙ্গগণ মধু আহরণ করে ঐ সকল পুষ্পের অনুরূপ বর্ণের গন্ধহীন কৃত্রিম পুষ্প এমন কি ঐরূপ রঙের বাক্সের দ্বারা তাঁহারা ঐ সকল পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; কিন্তু ঐ সকল পতঙ্গ দূর হইতে ঐ রূপ বা বর্ণ দর্শন করিয়া উহাদের নিকটে আসিলেও গন্ধ না পাওয়ায় উহার উপর তাহারা না নামিয়া উহার নিকটের একস্থানে নামিয়াছে। তবে পতঙ্গকুলের কয়েকটি যোনির বর্ণবোধ থাকিলেও উহা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ। বহুক্ষেত্রে তারা অধিক বর্ণের (বিশেষ করিয়া মিশ্রবর্ণের) প্রভেদ বুঝিতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে এদের কেহ কেহ বস্তুবিশেষের বর্ণসহ আকৃতিরও (চৌকা ত্রিকোণ, গোল) প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। অবশ্য তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, আকার হইতে ঐ বস্তু বিশেষের স্বরূপ কি ? তা তারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বুঝিতে পারে নি। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিলেও এ কথা সকলেই বলিয়াছেন যে, পক্ষী ও মানুষের তুলনায় উহাদের ঐ জ্ঞান বা বোধ নিতান্ত নগণ্য।]

আমি ভ্রমর, প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি দেশীয় পতঙ্গজীব সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্তরূপ দুইটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছি। পর পৃষ্ঠার চিত্র দুইটি হইতে ঐ যন্ত্র দুইটির স্বরূপ ও গঠন প্রণালী বুঝা যাইবে। কাঁচের বাক্স ও নল, লৌহ নির্মিত ফ্লানেল, এ্যাড্‌জাসটেবেল লৌহ নল, রবার টিউব ও রবারের ভেঁপু বা বেলো'র সাহায্যে এই যন্ত্র দুইটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাক্সের ভিতরের ফানালে গন্ধযুক্ত পুষ্প বা রঙিন তুলা রাখিয়া উহাতে সংযুক্ত রবারের নল বহুদূর পর্যন্ত লইয়া গিয়া ঐ দূরবর্তী স্থানে বসিয়া ঐ রবারের বেলোর সাহায্যে বেলো করিলে বায়ু গন্ধকণা-

সমূহকে উপরের লৌহ নলের মধ্য দিয়া সবেগে বহুদূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করিতে পারে। বিস্তীর্ণ উদ্যানের নির্জন স্থানে বসিয়া এই যন্ত্র দুইটির সাহায্যে আমি বিবিধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছি।
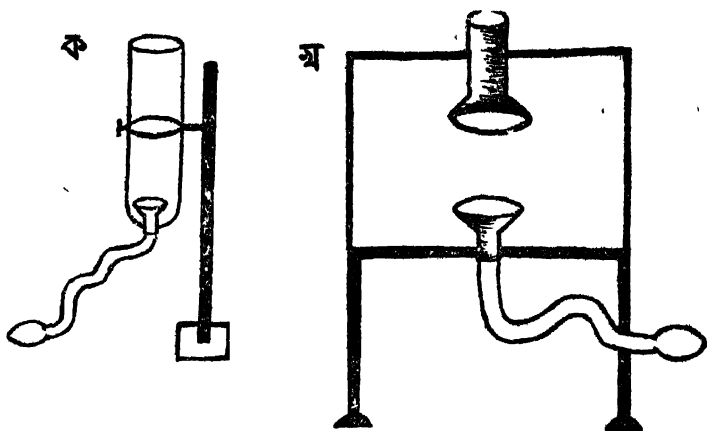
উপরের 'ক' চিহ্নিত যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু তাড়িত হইয়া গন্ধকণা সবেগে উপরে নিক্ষিপ্ত হইলে দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গ প্রথমেই সরল বা বক্র পথে পুষ্পের সন্ধানে ঐ যন্ত্রের নলের মধ্যে প্রবেশ করে নি। উহারা বারে বারে ঐ কাঁচের নলের চতুর্দিকে ঘুরিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে যন্ত্রের ফানেলে রক্ষিত পুষ্পটি দেখা যাইলেও যন্ত্রের নলের পথে তারা প্রবেশ করে নি। কিন্তু বেলো করা বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরে উহারা ঐ যন্ত্রের নলের পথে প্রবেশ করিয়া মধু আহরণার্থে ঐ পুষ্পের উপর আসিয়া বসিয়াছে। অপর দিকে 'খ' চিহ্নিত যন্ত্রের সাহায্যে ঐ একইরূপ ব্যবস্থা করিলে দেখা গিয়াছে যে, মৌমাছিগণ সরল বা বক্র পথে বায়ুবাহী গন্ধকণা অনুসরণ করিয়া ঐ বাক্সের নলের পথে প্রবেশ করিয়া ফানেলে রক্ষিত পুষ্পটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।

এই দুইটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে 'ক' চিহ্নিত অপরিসর যন্ত্রের মুখ হইতে বহু গন্ধকণা একত্রে বায়ু তাড়িত হইয়া নির্গত হইয়াছিল। ঐ গন্ধকণার আধিক্যের কারণে প্রথমে ইহারা দিশেহারা হইয়া যায় এবং কোন দিক হইতে ঐ গন্ধ আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। এত অধিক গন্ধকণা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা পুষ্পকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদের বর্ণবোধের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। কিন্তু 'খ' চিহ্নিত যন্ত্রটির ক্ষেত্রে ঐ গন্ধকণা সমভাবে বায়ু তাড়িত হইলেও উহারা প্রথমে বৃহদায়তন বাক্সটির অন্তর্দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার জন্য সামান্য সামান্য গন্ধকণা ঐ যন্ত্রের লৌহ নলের পথে বহির্গত হইতে থাকে। এইজন্য এই 'খ' চিহ্নিত যন্ত্রের সাহায্যে আমি অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, মক্ষিকাকুল ঐ যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে বারে বারে না ঘুরিয়া সরল বা বক্র পথে ঐ যন্ত্রের নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতরের ফানেলে রক্ষিত পুষ্পের উপর অবতরণ করিয়াছে।

এই সকল পরীক্ষা দ্বারা আমি বুঝিতে পারি যে, পতঙ্গ জীবদেরও মন বলিয়া এক পদার্থ আছে। ইহা ছাড়া পতঙ্গ জীব অতি ব্যবহারের কারণে গন্ধ সম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়ের অতিন্দ্রিয়তা (Hiper sensibility) লাভ করিয়াছে। এই জন্য অধিক গন্ধকণা তাহাদের দিশেহারা করিয়া দেয়, কিন্তু যৎসামান্য গন্ধকণা উহাদের কর্মতৎপর করিয়া তুলে। এইজন্য বহুদূরে উপগত সামান্য গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ফুলের নিকটে আসার পর অধিক গন্ধ উহাদের দিশেহারা করিয়া দিয়া থাকে। ইহার ফলে বাঞ্ছিত পুষ্পের নিকটে আসিয়া তাহাদের কয়েকবার উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া তবে উহার উপর নামিতে দেখা যায়।

[মানুষদের মধ্যে হিষ্টিয়া প্রভৃতি রোগীরাও সময়ে সময়ে এইরূপ

অতিন্দ্রিয়তা লাভ করিয়া থাকে। এই সময় ইহারা উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু অন্য মানুষের অগোচর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে পায়। বহুদূর হইতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদশব্দ শুনিয়া তাহারা কোনও এক ব্যক্তির আগমন বার্তা তো বলিয়া দেয়ই, এমন কি ঐ ব্যক্তি তাহার পিতা, পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাও এই সময় উহারা বলিয়া দিয়াছে।]

এই যন্ত্র দুইটির ফানেলে বিবিধ গন্ধ যুক্ত পুষ্প ও ফুল একত্রে বা একক রাখিয়া আমি এই বিবিধ পতঙ্গাদি সম্পর্কে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করিয়াছি। এই সকল পরীক্ষা হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, পতঙ্গের এক একটি যোনি বা species এক এক প্রকার গন্ধ পছন্দ বা অপছন্দ করিয়া থাকে। তাহাদের যোনিবিশেষকে একটি পছন্দকর গন্ধ দ্বারা যেমন আকৃষ্ট করা যায়, তেমনি অপছন্দকর অপর একটি গন্ধ দ্বারা ঐ বিশেষ যোনির পতঙ্গকে বিতাড়িত করাও সম্ভব। এমন কি পছন্দকর গন্ধের সহিত অপছন্দকর গন্ধ সংযুক্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার দ্বারাও পতঙ্গের যোনিবিশেষকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রধানতঃ গন্ধ দ্বারাই এক জাতীয় কীট সমজাতীয় অপর এক কীটকে চিনিয়া লইতে পারে। এমন কি গন্ধের দ্বারাই উহারা বাসায় ফিরিবার পূর্বতন পথ খুঁজিয়া বাহির করে। এই সম্পর্কে 'এ্যানিম্যাল মাইণ্ড' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া আরও দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রী-পতঙ্গ প্রায়ই রূপবান হয় না। Darwin প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্বে মনে করিতেন যে, পুং-পতঙ্গের রূপই স্ত্রী-পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই ক্ষেত্রেও রূপ অপেক্ষা গন্ধই স্ত্রীপতঙ্গগণকে পুং-পতঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পুং-পতঙ্গের রঙিন পক্ষ ছিন্ন ও দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

কেবলমাত্র গন্ধের দ্বারা তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। লাল সাহেব প্রণীত 'Organic Evolution' নামক পুস্তকটি এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ বলেন, পতঙ্গ বা কীটাদি জীবের শুঁয়া বা antennæর মধ্যে গন্ধকোষ বর্তমান আছে। কোন কোন পতঙ্গ পচা মাংসাদিতে ডিম্ব রক্ষা করে। কারণ উহা হইতে তাপ সংগ্রহের দ্বারা উহাদের ডিম্বগুলি স্ফুরিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ পতঙ্গ জীবের বোধিকা (antennæ) ছেদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সে পচা মাংসাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে তো পারেই নাই, এমন কি স্ত্রী পুরুষের সংযোগও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাকৃইনুডু সাহেবের মতে শুধু antennæতে নয়, তাহাদের দেহের সর্বত্রই এই গন্ধকোষ বর্তমান। তাঁহার মতে বিশেষ করিয়া উহাদের পক্ষমূলে ও পদ মধ্যে এই গন্ধকোষগুলি আছে। ম্যাকৃইনুডু সাহেব গুব্‌রে পোকা, পিঁপড়া, মৌমাছি ও ভীমরুল দ্বারা পরীক্ষান্তে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

আমরা জানি পিপীলিকা ও মৌমাছি আদি সামাজিক জীব। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সকল ষট্‌পদী জীবের অত্যদ্ভুত সামাজিক জীবন মূলতঃ গন্ধবোধের উপর নির্ভর করে। পিপীলিকাদি জীবগণ তাহাদের বাসভবন ও সঙ্গীগণকে গন্ধের দ্বারাই খুঁজিয়া বাহির করে। প্রায় দেখা যায়, পিপীলিকাগণ গমনাগমনের জন্য একই পথ ব্যবহার করে। গন্ধের দ্বারা তাহারা তাহাদের পথ চিনিয়া রাখে। এক মাইলের অধিক দূর হইতেও পুং-পতঙ্গ গন্ধ দ্বারা স্ত্রী-পতঙ্গকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহা ছাড়া খাদ্যাদির অবস্থানও ইহা দ্বারা তাহারা নিরূপণ করে। এই সম্পর্কে 'এ্যানিমেল মাইণ্ড' নামক প্রামাণ্য পুস্তকের ৯১-১০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই 'গন্ধবেদী' জীবদিগের গন্ধ সম্পর্কীয় কোনও উপবিভাগ আছে

কিনা সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাউক। 'গন্ধবেদী' জীবের গন্ধ সম্পর্কীয় উপবিভাগ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা যায় নাই। তবে গন্ধ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। এক এক প্রকার গন্ধের দ্বারা এক এক প্রকার গন্ধবেদী জীব যে চালিত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রেবার সাহেব এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। এক এক জাতীয় ষট্‌পদী এক এক প্রকার গন্ধ পছন্দ করে। মনে হয় যে, গন্ধের বিভিন্নতার জন্য এক জাতীয় ষট্‌পদীর সহিত আর এক জাতীয় ষট্‌পদীর যৌন মিলন ঘটে না। সম্ভবতঃ গন্ধের বিভিন্নতা রূপ প্রাচীরের জন্যই একই স্থানের মধ্যে বহু জাতীয় ষট্‌পদী স্ব স্ব জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এইজন্য নির্বিচার যৌন মিলন দ্বারা তাহারা একজাতিতে পরিণত হয় নাই। পরিমিত স্থানের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও এই গন্ধরূপ প্রাচীরের জন্যই উহাদের মধ্যে নির্বিচার যৌন মিলন সম্ভব হয় না। তাই আজ পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ ৩,৫০,০০,০০০ জাতীয় ষট্‌পদী জীব দেখিতে পাই। উত্তর আমেরিকার কথাই ধরা যাউক। সেখানে সর্বশুদ্ধ মাত্র ১,০০০ জাতীয় পক্ষী আছে। কিন্তু ঐ দেশে একমাত্র মক্ষিকার জাতিই ১০,০০০ হাজারের উপর। আমার মতে, বিভিন্ন জাতীয় ষট্‌পদীর বিভিন্ন প্রকার গন্ধ-বোধরূপ প্রাচীরই বোধ হয় ইহার কারণ। গন্ধের সূক্ষ্মতা একমাত্র গন্ধবেদীরাই ধরিতে পারে।

কীট-পতঙ্গদের গন্ধেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হইল। ইতিপূর্বে উহাদের দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উহাদের অনেকেরই সাধারণভাবে স্বাদ জ্ঞানও আছে; কিন্তু যে পরিবেশে উহারা বাস করে সেই পরিবেশে ঐ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাহাদের অধিক মাত্রায় কাজে লাগে বলিয়া মনে হয় না।

ইহারা শব্দ করে বটে, কিন্তু সেই শব্দ তাহাদের মুখবিবর হইতে

আসে না। পাখার সংঘর্ষের দ্বারা তাহারা শব্দ করে। তবে সেই শব্দ তাহাদের নিজেদের কোনও কাজে আসে না। কারণ, শব্দজ্ঞান উহাদের অধিকাংশেরই একেবারে নাই বলিয়া মনে হয়। ফোরেল সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। উহাদের কৃত এই শব্দ একশ্রেণীর শব্দবেদী সরীসৃপের শিকাররূপে তাহাদের পাইবার সুযোগ দেয় মাত্র। সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, যাহারা শব্দ করে তাহারা শুনিতেও পায়। কিন্তু সকল ষট্‌পদীদের ক্ষেত্রে ইহা আদৌ সত্য নয়। তাহা সত্ত্বেও প্রবল শব্দের ফলে কদাচ ইহাদের ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ প্রবল শব্দজনিত বায়ুর আলোড়ন ও কম্পন এবং উহাদের দেহে উহার স্পর্শন। কিন্তু অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ জীবের শব্দজ্ঞান না থাকিলেও উহাদের দুই একটি স্পিশিস্‌এর মধ্যে উহা কথঞ্চিৎ আছে। তবে এতদ্দ্বারা একটি বা দুইটি Tone বা স্বর মাত্র তাহারা ধরিতে পারে।

শব্দবেদী জীব

গন্ধবেদী জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এবার শব্দবেদী জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। সরীসৃপ জীবদিগকে হিন্দু মনীষিগণ শব্দবেদী জীব নামে অভিহিত করিয়াছেন। শব্দ সম্বন্ধে যাহাদের বোধ আছে তাহাদেরই শব্দবেদী জীব বলা হয়। অর্থাৎ ইহারা একটি শব্দ হইতে অপর একটি শব্দের প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। এমন কি, এই শব্দ কতদূর বা কোন দিক হইতে আসিতেছে শব্দবেদী জীবেরা তাহা বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয়। অথচ সর্পাদি শব্দবেদী জীবদের দেহে সুগঠিত কর্ণ ও উহার পটাহ নাই। অধিকন্তু সরীসৃপদের বহিঃকর্ণ না থাকায় বায়ুবাহী শব্দ ধরিয়া লওয়ারও ইহাদের অসুবিধা আছে। কিন্তু তাহা সত্বেও এই জীবগণের শব্দগ্রহণের ক্ষমতা অসীম। কিরূপে ইহা সম্ভব আমরা তাহা এইবার বিবৃত করিব। ভাগবতকারের মতে জীবনধারণের জন্য ইহারা এই শব্দজ্ঞানের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল। সর্পাদি সরীসৃপ গর্তাদিতে বাস করায় এবং ভূমির সহিত উহাদের সারা দেহ লেপ্টিয়া থাকায় উহাদের দৃষ্টি সর্বদাই প্রতিহত হইয়া থাকে। উহারা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় এবং চলিবার সময় চক্ষুসহ মস্তক অধিক উপরে তুলিতে সক্ষম হয় না। ইহারা মধ্যমরূপে দেখিতে পাইলেও ইহাদেরও সমধিক বর্ণবোধ নাই বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ কোন জীব না নড়িলে বা সশব্দে উহারা চলাফেরা না করিলে সর্পগণ উহাদের জীব বলিয়া বুঝিতে পারে না। ইহাদের গন্ধবোধ আছে বটে কিন্তু ঐ গন্ধ অতীব উগ্র না হইলে উহা তাহাদের বোধগম্য হয় না। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গন্ধ তাহারা স্বভাবতই ধরিয়া লইতে অক্ষম। ইহা ব্যতীত উহাদের মস্তিষ্কের গন্ধ পিণ্ডও ক্ষুদ্রতম। উহাদের

স্পর্শবোধ আছে কিন্তু গাত্রে আঁশ থাকার জন্য তাহাদের ঐ বোধ স্বভাবতই কম। একটি স্পর্শ হইতে অপর স্পর্শের স্বরূপ তাহারা বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সর্পের স্বাদ বোধ আছে কিনা জানা যায় নাই—তবে উহারা সমগ্র খাদ্য গিলিয়া আহার করে। এই জন্য স্বাদ তাহাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হইতে পারে না। সম্ভবতঃ এই সকল দিক বিচার করিয়াই প্রাচীন হিন্দুগণ সর্পাদি সরীসৃপদের শব্দবেদী জীব বলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের উপরোক্ত ধারণা কতটুকু সত্য এইবার সেই সম্পর্কে আলোচনা করিব। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, সর্পাদি জীবের বহিঃকর্ণাচ্ছাদন (tympanie membrane) নাই এবং তাহারা শুনিতে পায় না। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহা জানিতেন বলিয়াই সর্পদিগকে "চক্ষুশ্রবা" নাম দিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহাদের কাহারও কাহারও ধারণা ছিল যে, উহাদের পত্রহীন চক্ষু বায়ুর কম্পনের সহিত শব্দকণা ধরিয়া লয়। ভাগবতকার কিন্তু ইহাদের জোরের সহিতই 'শব্দবেদী' জীব রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা জানি শব্দ দুই প্রকারে জীবদিগের গোচরীভূত হয়। উহাদের যথাক্রমে বলা হয় 'বায়ুবাহী' ও 'অস্থিবাহী'। 'বায়ুবাহী' শব্দ আমরা মুক্ত কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি ; কিন্তু কান বন্ধ করিয়া যদি একটি ছোট ট্যাক ঘড়ি দন্তে সংলগ্ন করি তাহা হইলেও উহার শব্দ আমরা শুনিতে পাই। এই স্থলে, এই শব্দ দন্ত ও অস্থি বহিয়া আমাদের ভিতর কর্ণে প্রবেশ করে। এইরূপ শব্দকে বলা হয় অস্থিবাহী শব্দ। এই সম্পর্কে জনৈক ডাক্তারের নিম্নের বিবৃতি হইতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাইবে :—

"আমি স্বাভাবিকভাবে কানে দূরের শব্দ কম শুনি ; কিন্তু আমি শুইয়া থাকিলে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দ অপরে আদৌ শুনিতে পায় না— তাহা আমি শুনিতে পাই। এমন কি এই সময় ছাদে যদি কেহ

চলাফেরা করে তাহা হইলে বাড়ীর বহু লোকের মধ্যে উহা কাহার পদশব্দ তাহাও আমি বলিয়া দিতে পারি। ইহার কারণ আমার সারা দেহ ভূমিতে লেপ্টানো থাকায় শব্দজনিত প্রতিটি কম্পন ও উহার স্বরূপ আমার পৃষ্ঠের অস্থি বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইতে সক্ষম হয়।"

পল্লীগ্রামে অনেকে রাত্রে শুইয়া ঘরের ছাদের উপর ঘড়ঘড় শব্দ শুনিতে পায়। কিন্তু সে দাঁড়াইয়া উঠা মাত্রা ঐ শব্দ আর সে শুনিতে পায় না। সহসা শব্দ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের ধারণা হয় উহা বুঝি বা কোনও ভৌতিক ক্রিয়া। কিন্তু আসলে ব্যাপার হইয়া থাকে এইরূপ: ছাদে নিশীথ রাত্রে বিড়াল, কাঠবিড়াল বা ইন্দুর দৌড়াদৌড়ি করে। নীচের তলার ঘরে মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে মাত্র তাহার স্বল্পপরিসর পায়ের চেটোর হাড় ভূমিতে সংলগ্ন থাকে, এই কারণে এই স্বল্প শব্দ সকল সময় তাহাদের শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি শুইয়া থাকিলে অস্থিসহ তাহার সম্পূর্ণ দেহটি ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকায় পায়ের একপ্রস্থ হাড়ের স্থানে সারা পৃষ্ঠের হাড় দ্বারা (ভূমির কম্পন জনিত) সে ঐ শব্দ গ্রহণ করে। এইজন্য ঐ শব্দ সহজেই তাহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

সরীসৃপ জীবমাত্রেরই সারাদেহ অনুরূপভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের শব্দজ্ঞান মূলতঃ অস্থিবাহী হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু সর্পদিগের নিম্নমুখী পার্শ্ব-অস্থিসমূহের নিম্নদেশ পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নাই। উহাদের সূচ্যাগ্র মুখ পার্শ্ব-অস্থি বক্ষত্বক চাপিয়া ভূমিস্পর্শ করে। এইজন্য ঐ ভূমির উপর দূরে বা নিকটে সামান্যরূপ শব্দজনিত কম্পন তাহাদের দীর্ঘদেহের প্রতিটি অস্থি দিয়া উহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম। সকল সময় সুগঠিত কর্ণও (মানুষের ক্ষেত্রে) নির্ভরযোগ্য ইন্দ্রিয় নয়। এইজন্য মানুষও বায়ুবাহী শব্দের স্বরূপ, দূরত্ব ও দিক

সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। কিন্তু 'অস্থিবাহী' শব্দ সম্বন্ধে এইরূপ ভুল ইহাদের হয় না বলিয়াই মনে হয়। এই কারণে সরীসৃপগণ মনুষ্য-গবাদির পদশব্দ অন্তরাল হইতে শুনিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু ভেকের লম্ফনজনিত ভূমির কম্পন পিছন হইতে শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহারা তাহাকে আক্রমণ করে। আমার বিশ্বাস সর্পাদি সরীসৃপ তাহাদের অত্যুগ্র শব্দ বোধের দ্বারা শিকারের স্বরূপ ও অবস্থান নিরূপণ করে; অবশ্য শিকার ধরিবার সময় তাহারা চক্ষুর সাহায্যেই তাহা করিয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ দংশনের জন্য ইহাদের মস্তকসহ দেহ এই সময় উপরে উঠাইতে হয়। সরীসৃপগণ তাহাদের চক্ষু-পিণ্ড মানুষের ন্যায় চতুর্দিকে ঘূর্ণন করিতে পারে না। অতি নিকটের দ্রব্য সম্মুখে পড়িলে তবে উহারা তাহা দেখিতে পায়, কিন্তু সমগ্র মস্তক বা দেহ না ঘুরাইলে উহাদের ডাইনে বা বামে কি আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। এইজন্য অস্থিবাহী শব্দের প্রয়োজন ইহাদের সর্বাধিক। এইজন্য প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে, টিকটিকি জীবগণ কীটাদি জীবের লম্ফনজনিত সামান্য শব্দ পিছন হইতে শুনিবামাত্র পিছন ফিরিয়া তাহাদের ধরিতে পারে। এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হইল:

"মহিলাটি ঐদিন ঘরের নর্দমার নিকট বসিয়া চুল বাঁধিতে-ছিলেন। ইতিপূর্বেই যে ঐ নর্দমায় একটি বিষধর সর্প আশ্রয় লইয়াছে তাহা তাঁহার জানা ছিল না। কিছুক্ষণ চুল বাঁধিবার পর মাথায় সিঁদুর পরিয়া সিঁদূরের কৌটা সশব্দে মেঝের উপর রাখামাত্র ঐ সর্প সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দংশন করে। বেশ বুঝা যায় সর্পটি ঐ শব্দজনিত ভয় পাইয়াই বাহির হইয়া আসে এবং আত্মরক্ষার্থেই সেই মহিলাটিকে দংশন করে। কারণ, উহার মনে

হইয়াছিল যে কেহ বুঝি বা তাহাকে মারিতে আসিতেছে। অন্যথায়, এইরূপ অতর্কিত দংশনের কোন হেতু ছিল না।"

সরীসৃপদের চর্ম হর্নি স্কেল (আঁশ) দ্বারা আবৃত থাকায় ইহাদের স্পর্শজ্ঞান যৎসামান্য হওয়াই স্বাভাবিক। উহাদের বহিস্ত্বক (epidermis) আংশিক বা পুরাপুরি রূপে ইহারা প্রায়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সর্প জীবদের এই বহিস্ত্বক খোলসাকারে বৎসরে বহুবার পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ সরীসৃপদের গন্ধেন্দ্রিয় বিশেষ উন্নত না হইলেও সর্পজীবের গন্ধজ্ঞান আছে। তবে এই গন্ধ অত্যন্ত তীব্র না হইলে উহা তাহাদের বোধগম্য হয় বলিয়া মনে হয় না। আমি পল্লী-অঞ্চলে ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি যে, ইহাদের গন্ধবোধ মাত্র প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর রূপে তাহাদের বোধগম্য হয়; হাসনাহানা ফুলের উগ্র গন্ধ তাহাদের আকৃষ্ট করে, কিন্তু অপর কয়েকটি ফুল ও পাতার এবং ধূপধূনার উগ্র গন্ধ উহাদের অপসারিত করে বলিয়া মনে হয়। যৎসামান্য স্বাদজ্ঞান হয়তো ইহাদের আছে। কিন্তু শিকার পুরাপুরি ইহারা গিলিয়া খায়। এইজন্য উহা তাহাদের বেশী কাজে আসে বলিয়া আমি মনে করি না। বহুরূপী বা chamalion জীব তাহাদের জিহ্বা অন্য কাজেও ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহারা কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদের জিহ্বা নিক্ষিপ্ত করিয়া উহার সাহায্যে কীটাদিকে ধরিয়া লয়। এই উভয়বিধ কার্য করার জন্য উহাদের জিহ্বাকে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় specialized organ বলা যায় না। এইজন্য উহাদের স্বাদ বোধ শক্তিশালী না হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু সর্প ও টিকটিকি জীবের জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত। সর্পজীবও যে উহাদের জিহ্বা অন্য কার্যেও ব্যবহার করে তাহার প্রমাণ স্বরূপ উহাদের কয়েকটিকে আমি জিহ্বা দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি, এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে সরীসৃপদের জিহ্বা আমরা শুষ্ক (dry)

দেখিয়া থাকি। সরীসৃপ জীবগণ দেখিতে পাইলেও অধিক দূরের দ্রব্য তাহারা দেখিতে পায় না এবং কোনও জীব না নড়িলে তাহারা উহাকে জীব বলিয়া বুঝিতে পারে না।]

এই দেশে পল্লীঅঞ্চলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে জলে স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে এবং শব্দ না করিলে কুমীর দূর হইতে আসিয়া কোন মানুষকে ধরে না। ইহা সত্য হইলে উহা উপরোক্ত মতবাদেরই সমর্থক। পুরীর জগন্নাথধামে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে বহু বৃহদাকার মৎস্য ও কূর্ম আছে; কিন্তু 'আয়' 'আয়' করিয়া শব্দ করিলে খাদ্য লোভে কেবলমাত্র কূর্মগণই তীরে আসে। খুব সম্ভবতঃ শব্দজনিত জলের কম্পনের কারণে 'অস্থিবাহী' শব্দ মৎস্য অপেক্ষা কূর্মগণ বহুগুণ বেশী শুনিতে পায়। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে, অস্থিবাহী শব্দ মৎস্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না, হইলেও উহা তাহাদের দূরে বিতাড়িত করে; কিংবা মৎস্যের বুদ্ধি কূর্ম অপেক্ষা বহু গুণে কম বলিয়া ঐরূপ শব্দ তাহাদের প্রলুব্ধ করে নি।

কোনও কোনও প্রাচীন হিন্দুমনীষী ভেকাদি জীবকেও সরীসৃপ জীবের মধ্যে ধরিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহাদের সরীসৃপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 'মণ্ডুক' জীবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই ভেকাদি জীবগণকেও শব্দবেদী জীব বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে ভেকাদি জীবদেরই সর্বপ্রথম প্রকৃত রূপ (বায়ুবাহী?) শব্দবোধ জন্মে। ইহাদের কর্ণযন্ত্র বিশেষ সুগঠিত। ইহাদের শব্দ করিবার ক্ষমতাও আছে। ইয়ার্কি সাহেবের মতে ভেক বহুবিধ শব্দই শুনিতে পায় ও সেই অনুপাতে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। তাঁহার মতে অপর জীবের অবোধ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ ভেকাদি জীবগণ ধরিয়া লইতে পারে। ভেকাদি জীব দেখিতে পাইলেও ইহারা দৃষ্টির দ্বারা দ্রব্যবিশেষের স্বরূপ

ও দূরত্বাদি নিরূপণ করিতে অক্ষম। দ্রব্যাদি স্থির থাকিলে উহার স্বরূপ তাহাদের বোধগম্য হয় না।

[সম্ভবতঃ হিন্দু-মনীষিগণ স্যালেমাণ্ডার প্রভৃতি নিম্নোভচরদের রসবেদী জীবের এবং ভেকাদি উচ্চ উভচর জীবদের শব্দবেদী জীবদের মধ্যে ধরিতেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে আমরা বর্তমান প্রবন্ধের পরিশেষে আলোচনা করিব।]

শব্দবেদী জীবগণের মধ্যে কোনও উপবিভাগ ছিল কিনা, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাউক। শব্দসম্পর্কীয় উপবিভাগ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে টীকাকারগণ শব্দগ্রহণের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে জীবদের প্রধানতঃ দুইটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা, "হ্রস্ববেদী' এবং 'দীর্ঘবেদী'।

অস্থিবাহী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দ যে সকল জীব শুনিতে পায়, তাহাদের হ্রস্ববেদী এবং বায়ুবাহী উচ্চ শব্দ যাহারা শুনে, তাহাদের দীর্ঘবেদী বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, কোনও কোনও প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিত ভেকাদি উভচর জীবদেরও শব্দবেদী জীব বলিতেন। সম্ভবতঃ হ্রস্ববেদী বলিতে সরীসৃপদের এবং দীর্ঘবেদী বলিতে উভচর ভেককে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সরীসৃপদের শব্দজ্ঞান মূলতঃ অস্থিবাহী এবং ভেক জীবের শব্দজ্ঞান বায়ুবাহী। এইজন্য মনে করা যাইতে পারে যে, কোনও 'নীরব' ভিন্নাকার (লম্বা) নিম্ন উভচর জীব হইতে দুইটি পৃথক ধারায় এই উচ্চ উভচর ভেকজীব এবং সরীসৃপের উদ্ভব হইয়াছিল। অধিকন্তু ইহাও মনে করা যাইতে

পারে যে, নিম্ন উভচর জীব হইতে সরীসৃপের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই নিম্ন উভচর জীবের অপর ধারাটি হইতে দীর্ঘবেদী ভেকজীবের সৃষ্টি হইয়াছে।

বস্তুতঃ পক্ষে প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী শব্দ-গ্রহণের উপযুক্ত হইলে নীরব জীব হইতে বিভিন্ন ধারায় অগ্রপশ্চাৎ সরব জীবগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদ যে অতীব সত্য তাহা প্রশীল (Fossil) বিজ্ঞান হইতে প্রমাণিত হয়। প্রশীল বিজ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে মৎস্য, তাহার পর নিম্নোভচর, তাহার পর সরীসৃপ ও তাহার পর ভেকাদি উচ্চ উভচর জীবের সৃষ্টি হয়। এইজন্য পৃথিবীর পারমিয়ান স্তরে আমরা যথাক্রমে (পর পর) সরীসৃপ ও ভেকজীবের চিহ্ন পাই। পূর্ববর্তী ভূস্তর সম্পর্কীয় তালিকাটি এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। এইভাবে প্রমাণিত হইবে যে, জল হইতে জীবগণ স্থলে উঠিয়া প্রথমে অস্থি সহযোগে শব্দ গ্রহণ করিত এবং পরে উহারা বিভিন্ন ধারায় আরও উন্নত হইলে বায়ুবাহী শব্দ গ্রহণে সক্ষম হয়। ইহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে জীবদিগের যৌনজ বিভাগ ও সৃষ্টিক্রম শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিব।

রূপবেদী জীব

'শব্দবেদী' জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার 'রূপবেদী' জীব সম্বন্ধে বলিব। ভাগবতকার পক্ষীকুলকে 'রূপবেদী' জীব বলিয়া অভিহিত করেন। ভাগবতকার সুস্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন যে, পক্ষীকুল 'রূপভেদবিদ্'। অর্থাৎ, উহারা একটি বর্ণ হইতে অপর বর্ণ এবং একই বর্ণের তারতম্য সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। ইহা ছাড়া, ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও অতীব তীক্ষ্ণ। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বিভিন্ন পরীক্ষার পর এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মস্তিষ্কে 'অক্ষিপিণ্ড' (Optical lobes) এই কারণে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, পক্ষী বহু উচ্চ হইতে নিম্নের দ্রব্যাদির স্বরূপ বুঝিতে পারে। অতি ব্যবহারের কারণে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অতীব প্রখর ও শক্তিশালী। কোন্‌টি খাদ্য এবং কোন্‌টি খাদ্য নয় তাহা উহারা দৃষ্টি সহযোগে অনায়াসেই বুঝিতে পারে। এই বিষয়ে তাহারা কদাচ জিহ্বার সাহায্য লইয়াছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা উহার আকার ও রূপ দেখিয়া নিরূপিত করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে একটি দূষিত জলপূর্ণ পাত্র ও একটি মিষ্ট জলপূর্ণপাত্র রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়সগণ নিম্নে কয়েকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিষ্ট জলই পান করিয়াছে। কোনও অবস্থাতেই তাহারা দূষিত জল পান করে নাই। অরণ্যের মধ্যে বর্ণ ও আকার দেখিয়া ইহারা বিষাক্ত ও সুমিষ্ট ফল চিনিয়া লয়। অনেক মিষ্ট ফলও বিষাক্ত ফলের অনুরূপ দেখিতে হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তির দ্বারা উহারা ঐ ফলের স্বরূপ বুঝিতে পারে। যে ভুল মানুষ

করিয়া থাকে তীব্র বর্ণবোধ হেতু ইহারা সেই ভুল করে না। চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ অর্ধ মাইল উর্ধ্ব হইতেও নিম্নের বস্তু চিনিয়া লয়। এই পক্ষী জীবগণের চক্ষুমণিতে Pecten নামক একটি অপাঙ্গ আছে, ইহা পক্ষী ব্যতীত অন্যান্য কোনও জীবের চক্ষু মণিতে নাই। এই অপাঙ্গটি ইহাদের দৃষ্টিশক্তি বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহারও কাহারও মতে বহু উপরের দ্রব্যও ছায়াকারে ইহার উপর পতিত হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে, একটি মোরগ মুখ নিচু করিয়া খাদ্যাহরণ করিতেছে, কিন্তু উপর হইতে একটি চিল নিম্নে নামিবার উপক্রম করা মাত্র ঐ মোরগ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতেছে।

পক্ষীদিগের চক্ষু সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার উহাদের গন্ধবোধ ও স্পর্শবোধ সম্বন্ধে বলা যাউক। পক্ষীকুলের সুদৃঢ় (horny) ও দীর্ঘ চঞ্চুর স্পর্শ দ্বারা আহারাদি সম্বন্ধীয় বোধ হয় না—উপরন্তু চঞ্চুর অনুপাতে উহাদের জিহ্বা ক্ষুদ্র হওয়ায়, উহার দ্বারা তাহারা খাদ্যাদি স্পর্শ করিতে অপারগ হয়। ইহার জন্য উহারা দৃষ্টিশক্তির উপরই অধিকতর নির্ভরশীল। উহাদের জিহ্বাও (horny) এবং উহাতে nervous papillae নাই। ইহা ছাড়া উহাদের জিহ্বার তলদেশের রসকোষও বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য ইহাদের স্বাদবোধ থাকিলেও উহা বিশেষ শক্তিশালী নয়। অধিকন্তু ইহারাও সর্পের ন্যায় গিলিয়া আহার করে। এইজন্য স্বাদ ইহাদের খুব বেশী কাজে লাগে না। তবে দুই একটি স্বাদ সম্বন্ধে ইহারা সচেতন। কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি পক্ষী সম্পর্কে ইহা আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। সারাদেহ ইহাদের পালকে ঢাকা এবং ইহারা খেচর জীব—এই জন্য স্পর্শবোধ থাকিলেও উহা তাহাদের খুব বেশী কাজে আসে না। পক্ষীদের গন্ধবোধ অন্য জীবের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। ইহাদের মস্তিষ্কের গন্ধ সম্পর্কীয় অংশও সুগঠিত নয়। পক্ষীকুল শব্দ

করিতে ও শুনিতে পারে বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কেও কিছু বলিবার আছে। ইহাদের স্বরবোধ থাকিলেও উহাদের সুরবোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বরবোধ ও সুরবোধ এক জিনিষ নয়। সুরের তারতম্যের জ্ঞান ইহাদের মধ্যে নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে পক্ষীকুলের রূপ বোধ সহ দৃষ্টিশক্তির তুলনায় উহাদের এই শ্রবণ শক্তি যে, বহুগুণে কম তাহাতে সন্দেহ নাই। সরীসৃপের ন্যায় ইহাদের বহিঃকর্ণ না থাকায় শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহা বুঝা ইহাদের সাধ্যাতীত। এতদ্ব্যতীত দূরের শব্দ ইহারা শুনিতে পায় না বলিয়াই মনে হয়, যতদূর বুঝা যায় ইহারা কেবলমাত্র উচ্চ শব্দ সম্বন্ধেই সচেতন।

[ডারোইন সাহেব তাঁহার বিবর্তন মতবাদটির সমর্থনে বলিয়াছিলেন যে, পুং কোকিলের সুমিষ্ট গলার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রী-কোকিল উহার সহিত যৌন মিলনের কারণে আকৃষ্ট হয়। এই ভাবে বংশপরম্পরায় উত্তরোত্তর উহাদের গলার স্বর অতীব সুমিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ডারোইন বিরোধী পণ্ডিতেরা এই একই কারণে এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদেরও মতে মনুষ্যের ন্যায় পক্ষী জীবদের মধ্যে সুরবোধ সম্ভব হইতে পারে না।]

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দু মনীষিগণ প্রাচীনকালে বিবিধ পক্ষীর বিভিন্ন স্বর সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। শুধু পক্ষী নয় অন্যান্য [ময়ূর, ঋষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, মেষ, কোকিল, হস্তী, বৃষ, সিংহ, কাক প্রভৃতি।] পশু জীবের স্বর সম্বন্ধেও তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পন্থায় আলোচনা করিতেন। কোন্ কোন্ জীবের গলার স্বরে কোন্ কোন্ সুরের সৃষ্টি হয়, ইহা অবগত হওয়াই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। নিম্নের পাদটিকায় সঙ্গীত ও তাহার সুর সম্পর্কীয় প্রাচীন শ্লোকটি হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা

যাইবে। * কিন্তু ভাগবতকার পক্ষীর স্বরবোধ আছে তাহা স্বীকার করিলেও উহাদের সুরবোধ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া, পক্ষীদের স্বরবোধ তাহাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়, দৃষ্টিবোধের ন্যায় অত প্রয়োজনীয় হইতে পারে না।

এইবার এই রূপবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রধানতঃ দুইটি উপবিভাগে রূপবেদী জীবকে মানসিক পর্যায় ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিভাগের সূচনা নিম্নের শ্লোকটিতে পাওয়া যায়ঃ—

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাঽপরে।
কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥
—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, সপ্তশতী চণ্ডী

উপরের শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি পাখীর দিবালোক বা সাদা আলো ভিন্ন উপায় নাই। অন্ধকারে বা কৃষ্ণালোকে তাহাদের চক্ষু নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার পেচকাদি কতকগুলি পাখীর

ময়ূরঃ ষড়্‌জমাখ্যাতি ঋষভঃ বক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমং॥
কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে মেষো বদতি ধৈবতম্।
নিসদং ভাষতে হস্তী ত্বেতদ্ ব্রহ্মাদি সম্মতম্॥
ময়ুর-বৃষভো-মেষ-কাক-কোকিল বাজিনঃ।
মাতঙ্গাশ্চ ক্রমোণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥
আরোহি বৃষভো বক্তি চাবরোহী চ কেশরী।
ব্যাহারস্ত্রিষু লোকেষু স্বারোহী ভগবান্ শুকম্॥
—নারদসংহিতা।

পক্ষে অন্ধকার বা কৃষ্ণালোকই প্রয়োজনীয়। দিবালোকে তাহাদের চক্ষু সক্রিয় হয় না। একদল আলো চায় না, অপর দল আলো চায়। এই জন্য প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ পক্ষিগণকে মানসিক পর্যায়ে দিবান্ধ ও রাত্রান্ধ (এবং দৈহিক পর্যায়ে খেচর ও ভূচর) এই বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

ভাগবতকার পক্ষীদিগকে 'রূপবেদী' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ভাগবতকারের মতে পক্ষিগণ একটি বর্ণ হইতে অপর একটি বর্ণের প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও বিভিন্ন পরীক্ষার পর এই একই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত হেস্ ও ব্রীজ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পক্ষীজীব একটি বর্ণ অপেক্ষা অপর একটি বর্ণ বেশী পছন্দ করে।

[আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবদিগের যে ইন্দ্রিয়টি অধিক শক্তিশালী সেই ইন্দ্রিয়টির সাহায্যেই তাহারা পূর্বরাগ বা Court-ship-এর কার্য সমাধা করে। ডারোইনের মতে ময়ূরীর মনোরঞ্জনের জন্যই ময়ূরের রঙিন পেখমের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব অমীমাংসিত তথ্যের বিষয় বাদ দিলেও আমরা সাধারণভাবে দেখিতে পাই যে এই সকল পূর্বরাগ সম্পর্কীয় কার্য পক্ষিগণ তাহাদের দৃষ্টি বা রূপবোধের দ্বারাই সমাধা করে। এইজন্য আমরা পূর্বরাগের জন্য পারাবতদের স্ত্রী-পুরুষকে মুখোমুখি হইয়া দৃষ্টি সঞ্চার দ্বারা বারে বারে ঘাড় নাড়িতে দেখি।

এতদ্ব্যতীত জননকালে কোনও পক্ষী নিজ দম্পতির জন্য নির্দিষ্ট একটি এলাকা আপনাদের দখলে রাখে, এই এলাকার সীমানার মধ্যে ঐ জাতীয় অন্য কোনও পক্ষী প্রবেশ করিলে তাহারা নবাগতদের সহিত যুদ্ধরত হয়। কারণ ঐ নির্দিষ্ট এলাকার ফলমূল ও কীটাদি এই সময় উহাদের এবং উহাদের শাবকের আহারের জন্য প্রয়োজন হয়। বলাবাহুল্য সদা সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই তাদের এই নির্দিষ্ট এলাকা তাহারা রক্ষা করিয়া থাকে।]

সাধারণভাবে আমরা অবগত আছি যে, ঋতুর পরিবর্তনের সহিত অনুকূল আবহাওয়া এবং খাদ্য অন্বেষণের জন্য পক্ষিগণ দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। কিন্তু এই সম্পর্কে অপর আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করা যাইতে পারে। দেশ-বিদেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রকৃতিরাণী এক এক প্রকার বর্ণবিন্যাস ধারণ করেন। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণবিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। এমনও হইতে পারে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্বতন বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী পক্ষিগণ প্রকৃতিরাণীর এই পরিবর্তিত বর্ণবিন্যাস পছন্দ করে নাই। এইজন্য অভীষ্ট বর্ণবিন্যাসের লোভে তাহারা অপর আর এক দেশে প্রস্থান করে। বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতিরাণী যে বর্ণবিন্যাস ধারণ করেন, শীতের আগমনে তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন। এইজন্য কোনও কোনও রূপলোভী পক্ষীদল ঋতুর পরিবর্তনের সহিত এক দেশ হইতে অপর এক দেশের উদ্দেশে যাত্রা করে। পালক আবৃত ও উষ্ণ শোণিত হওয়ায় পক্ষিগণ যে শীতের সহিত যুঝিতে অক্ষম তাহা নাও হইতে পারে। এই মতবাদ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে এক এক জাতীয় পক্ষী এক এক প্রকার বর্ণ বা বর্ণবিন্যাস পছন্দ করে।

রাত্রি ও দিবাচর পক্ষী সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। রাত্রে বর্ণসমুদয় বিকৃতরূপে প্রতীত হয় বটে, কিন্তু রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষে উহার স্বরূপ বাছিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। রাত্রিচর পক্ষী অন্ধকারের তারতম্য এবং দিবাচর পক্ষী আলোকের তারতম্য বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া রাত্রিচর ও দিবাচর পক্ষীর মধ্যে স্বভাবের বিভিন্নতার সহিত আকৃতিগত পার্থক্যও দৃষ্ট হয়।

কর্মবেদী জীব

স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী এবং রূপবেদী জীবদের সম্বন্ধে বলার পর ভাগবতকার কর্মবেদী জীবদিগকে ষষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচটি বোধ শক্তি যে-সকল জীবগণের মধ্যে বিচার বুদ্ধি সহযোগে একত্রে ও প্রায় সমমাত্রায় সন্নিবেশিত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পথে সহায়ক হয় তাহারাই ভাগবতকারের মতে কর্মবেদী জীব। কর্মবেদী জীবগণ তাহাদের বিচার-বুদ্ধি সহযোগে সমভাবেই এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রয়োজন বোধে তাহাদের দৈনন্দিন কাজে লাগাইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, বুদ্ধির প্রথম অনুশীলন হয় এই কর্মবেদী জীবগণের মধ্যে এবং এই বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে নানারূপ কর্মের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া যেরূপ পরিবেশে চতুষ্পদ কর্মবেদী জীবগণ বাস করে তাহা উহাদের সব কয়টি ইন্দ্রিয়ের সমভাবে পরিচালনার পক্ষে অনুকূল।

[এই জন্য মৎস্য, সরীসৃপ ও উভচরদের ন্যায় বর্তমানকালীন কর্মবেদী জীবদের কোনও একটি ইন্দ্রিয়ের একত্রে দুইটি কায সমাধা করার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের চক্ষু, দন্ত, জিহ্বা, চর্ম ও অঙ্গাদি অধিক মাত্রায় স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্যই সমাধা করে, কারণ উহাদের প্রতিটিই specialized organ.]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শ্লোকসমূহ হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ কয়েকটি চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জীবকে 'ঘ্রাণসর্বস্ব' জীবরূপেও অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারাই একমাত্র তাহারা দ্রব্যাদির স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম। কারণ তাঁহারা অবগত ছিলেন মনুষ্যাদি দ্বিপদ জীব অপেক্ষা ইহাদের দৃষ্টিশক্তি নিকৃষ্ট হইলেও ইহাদের ঘ্রাণশক্তি মনুষ্য

বানরাদি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী। কিন্তু ইহা অবগত থাকা সত্বেও তাঁহারা চতুষ্পদ ও দ্বিপদ সহ সমুদয় উভতোদতঃ (উচ্চ স্তন্যপায়ী) জীবদের কর্মবেদী জীব বলিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, এই সকল জীব তাহাদের বুদ্ধির উৎকর্ষতার কারণে, উহাদের ইন্দ্রিয়াদির একটি নিকৃষ্ট ও অপরটি উৎকৃষ্ট হইলেও বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইয়া উহাদের সমভাবে বিচার করিয়া বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া বিবিধ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে। [এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোকসমূহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।] এই সকল বিষয় বিচার করিয়াই সম্ভবতঃ ভাগবতকার সমুদয় উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবকেই 'কর্মবেদী' জীবরূপে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যতদূর বুঝা যায়, ভাগবতকার কর্মেন্দ্রিয়কে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে এই কর্মেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি। নিম্নে উদ্ধৃত ভাগবতোক্ত শ্লোকটি এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য :—

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈরসং।
রূপঞ্চ দৃষ্টা স্বশনং চ ত্বচৈব॥
শ্রোত্রেন চোপেত্য নভোগুণত্বং।
প্রাণেন চাকুতিমুপৈতি যোগী॥

তাৎপর্য : ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রস, দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ, ত্বকেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশের গুণ, শব্দ ও কর্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্তৎ ক্রিয়াসমূহকে প্রাণ বা বুদ্ধি দ্বারা যোগী (কর্মিগণ) অতিক্রম করিয়া থাকেন।

এই ব্যাখ্যাটি একটি প্রাচীন টীকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই 'কর্মেন্দ্রিয়' শব্দটি টীকাকারই ব্যাখ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, এই 'কর্মবেদী' জীবগণের উপবিভাগ সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাউক। জীবগণের কর্মশক্তির আধার হস্ত বা পদের সংখ্যানুযায়ী এই উপবিভাগগুলি সৃষ্ট হইয়াছিল। নিম্নের ভাগবতোক্ত শ্লোকটি হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

রূপভেদবিদস্তত্র ততঃশ্চোভয়োতোদতঃ।
তেষাং বহুপাদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাদ॥

ভাগবতম্
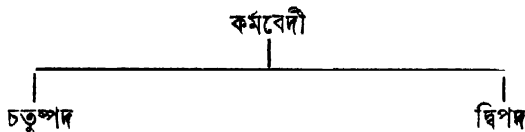
উপরের শ্লোকে উল্লিখিত চতুষ্পদ জীব বলিতে স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জীবদের এবং দ্বিপদ বলিতে স্তন্যপায়ী বানর ও নরজীবদের বুঝানো হইয়াছে। 'উভয়োতোদতঃ' অর্থে যে জীবের দুইবার দাঁত উঠে তাহাদের বুঝায়। এই বাক্যটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্মবেদী বলিতে ভাগবতকার কেবলমাত্র উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদেরই বুঝিয়াছেন।

[কিন্তু এই কয়টি শব্দ ব্যতীত বহুপদরূপ অপর একটি শব্দ এই শ্লোকে পাওয়া যায়। 'বহুপাদাঃ' প্রভৃতি অর্থে যদি বহু অংশে শ্রেষ্ঠ এরূপ বুঝায় তাহা হইলে বক্তব্য বিষয়টির সহজ অর্থ বোধগম্য হইবে। হস্ত-লিখিত পুঁথির যুগে নকল করিবার সময় শব্দ বিশেষের বৈয়াকরণিক বা শব্দগত ভুল থাকা অসম্ভব নয়। 'উভয়োতোদতঃ' জীবদেরই যে

কর্মবেদী জীবরূপে ধরা হইয়াছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পায় যে, এই 'কর্মবেদী' সম্পর্কীয় শ্লোকে 'একতোদতঃ' জীবের উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ এদেশের 'বনরুই' এবং বিদেশের 'হাঁসঠুঁটো' কীটভুক্ প্রভৃতি 'নিম্ন স্তন্যপায়ী' জীবদের 'রূপবেদী' জীবের মধ্যে ধরা হইত। তবে এমনও হইতে পারে যে এই 'বহুপদ' শব্দ দ্বারা তাঁহারা কোন এক কল্পিত জরায়ুজমস্য জীবকে বুঝিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে 'শরভঃ' রূপে বর্ণিত একপ্রকার জীবের উল্লেখ আছে। ইহারা নাকি সিংহ হনন করিত। অমরকোষ ও হেমচন্দ্রাদি গ্রন্থে এই 'শরভঃ' জীব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"শরভঃ কুঞ্জরাবাতিরুৎ পাদকোঽষ্টপাদাদি।" অর্থাৎ ইহাদের নাকি সর্বসমেত আটটি পা ছিল। সম্ভবতঃ এরূপ এক কল্পিত বা অধুনালুপ্ত (?) জীবকেই তাঁহারা 'বহুপদ' জীব নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।]

আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদের কাহারও কাহারও মধ্যে ঘ্রাণ ও শ্রবণ শক্তি প্রবল এবং উহাদের কাহারও মধ্যে দৃষ্টিশক্তি প্রবল, কিন্তু তাহা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহারা বুদ্ধি দ্বারা সমভাবে উহাদের কাজে লাগাইতে সক্ষম। তাহাদের এই বিশেষ মতবাদের কারণ সম্বন্ধে উপরে আমি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এক্ষণে প্রাচীন হিন্দুদের এই মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করিব।

প্রথমে স্বাদ ও গন্ধ সম্বন্ধে বলা যাউক। ইহাদের একত্রে রাসায়নিক জ্ঞান বা কেমিক্যাল সেন্স বলা হয়। আলোক, উত্তাপ, চাপ বা স্পর্শ প্রভৃতি ফিসিক্যাল বা বস্তুগত পদার্থের সংযোগের জন্য আমরা স্পর্শন, শ্রবণ বা দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু কেমিক্যাল বোধ আমরা

প্রাপ্ত হই আমাদের রসকোষ ও গন্ধকোষ সকল ঐ সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ কণাসমূহ (MOLECULAR) দ্বারা উদ্বেলিত হয় বলিয়া। মানুষের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির অতি প্রাচুর্যের কারণে উহাদের মধ্যে এই কেমিক্যাল সেন্স্ (বিশেষ করিয়া গন্ধবোধ) অন্য জীবের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। কুকুর জীবের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, শ্রবণ ও দৃষ্টিজ্ঞান অপেক্ষা তাহাদের গন্ধজ্ঞান অধিক শক্তিশালী। [অবশ্য মনুষ্যের তুলনায় উহাদের শ্রবণশক্তিও অধিকতর প্রখর।] মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রধানতঃ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কুকুরদের স্মৃতিশক্তি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল গন্ধজ্ঞানের উপর। কুকুরেরা তাহাদের মনিবদিগকে এবং দ্রব্যাদিকে গন্ধ দ্বারাই চিনিতে পারে। ইহা ছাড়া গন্ধ ইহারা বহুদূর হইতে গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি পথ পর্যন্ত ইহারা গন্ধের সাহায্যে চিনিয়া লয়। চতুষ্পদ জীবদিগের বহির্কর্ণসমূহ কোণাকার (conical) ও লম্বা এবং উহা তাহারা ইচ্ছামত চতুর্দিকে ঘুরাইয়া শব্দের দিক নির্ণয় করিয়া মনুষ্যের অগোচর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শব্দও ধরিয়া লইতে সক্ষম। কিন্তু মনুষ্যের বহির্কর্ণের গঠন থ্যাবড়া হওয়ায় কদাপি ঐরূপ বোধ তাহাদের হয় না, এবং সকল মানুষ ইচ্ছামত কান নাড়িতে পারে না। এই মানুষের সুরবোধ (tune) অতি উত্তম হইলেও উহারা কুকুর, ঘোড়া, গরু প্রভৃতির ন্যায় শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহা সব সময় বুঝিতে পারে না। কিন্তু মানুষ ও বানরগণ পক্ষীর ন্যায় চক্ষুর অতি উৎকর্ষতার দ্বারা তাগাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা পোষাইয়া লইয়াছে। অপর দিকে কুকুর প্রভৃতি চতুষ্পদ জীবগণ দ্রব্যাদি না নড়িলে দূর হইতে উহাদের দ্রব্য বা জীব বলিয়া সব সময় বুঝিতে পারে না।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, কর্মবেদী বা স্তন্যপায়ী জীবগণের

অন্তর্গত বিভিন্ন জীবদের একটি ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয় যে শক্তিশালী তাহা অস্বীকার্য নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের কোনটিকে গন্ধবেদী, কোনটিকে শব্দবেদী ও কোনটিকে রূপবেদী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত না করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উহাদের একত্রে কর্মবেদী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিষয়ে তাঁহারা একটু মাত্রও ভুল করেন নি। নিম্নতম অস্থিক জীবদিগের একটি ইন্দ্রিয় উহাদের অপর ইন্দ্রিয়ের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম, তাহা অতীব সত্য। কিন্তু এক্ষণে আমি দেখাইব যে, উচ্চ অস্থিক জীব সম্বন্ধে ইহা আদপেই সম্ভব হইতে পারে না।

[মৎস্যদিগের মধ্যে ট্রাউট মৎস্যগণের দৃষ্টিশক্তি অতীব প্রখর। কারণ ইহাদের মস্তিষ্কের অক্ষিপিণ্ড বা OPTIC LOBE অতি বৃহদাকার। উহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতেও স্নায়ুসকল এইখানেই আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান অপেক্ষা দৃষ্টি-জ্ঞানই ইহাদের অধিক কার্যকরী। অনুরূপভাবে ডগ্‌ফিস্ মাছের ক্ষেত্রে উহাদের মস্তিষ্কের সম্মুখাংশের ঘ্রাণকেন্দ্র অতীব বৃহদাকার এবং এই স্থানটি মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ হইতেও সংবাদ গ্রহণ করে। এইজন্য ডগ্‌ফিস্ মৎস্যগণ তাহাদের ঘ্রাণ শক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে রসবেদী মৎস্যদের (HIND BRAIN) অধোমস্তিকস্থ স্বাদকেন্দ্র অত্যধিক শক্তিশালী এবং উহাদের মুখবিবরের টেষ্ট বাড্‌ও বিশেষ সুগঠিত। এইজন্য কার্প প্রভৃতি রসবেদী মৎস্যগণ স্বাদ জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভরশীল। অবশ্য বাসস্থানসম্ভূত পরিবেশের কারণে অধিকাংশ মৎস্যকে বাধ্য হইয়া উহাদের স্বাদ-বোধের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। তদুপরি স্পর্শকোষের ন্যায় রসকোষসমূহ

উহাদের সারা দেহে ছড়াইয়া থাকায় অপর ইন্দ্রিয় বোধ অপেক্ষা উহাদের স্বাদ-বোধের আধিক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক।]

এই মৎস্য প্রভৃতি জীবের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা উচ্চ অস্থিক জীবসমূহ সম্পর্কে সম্ভব নয়। কারণ কোনও অবস্থাতেই উহাদের একটি ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের উপর বিশেষরূপ আধিপত্য বিস্তারে অপারগ। কারণ ইহারা প্রতিটি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করিয়া তবে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের মস্তিষ্কের বিবিধ ইন্দ্রিয় স্থান-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট একটি নিরপেক্ষ স্থান বা AREA আছে। মস্তিষ্কের সম্মুখাংশের (FORE BRAIN) এই নূতন স্থানে এই সকল উন্নত জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানসমূহ প্রেরিত হইয়া উহাদের প্রকৃত স্বরূপের বিচার হইয়া থাকে। এইজন্য উহাদের মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় কোনও স্থান একাকী কোনও কিছু বিচার করিতে পারে না। মৎস্য জীবের মস্তিষ্কে এই নিরপেক্ষ স্থানের সামান্য মাত্র চিহ্ন দেখা যায়। জীব যতই উন্নত হয় উহাদের মস্তিষ্কের ওই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশের ততই বর্ধন ঘটে। এতদ্ব্যতীত মস্তিষ্কের CEREBRAL CORTEX আমরা মৎস্য ও ভেকের মস্তিষ্কে দেখিতে পায় না। ইহার প্রথম আবির্ভাব আমরা দেখি সরীসৃপ জীবের মস্তিষ্কে। স্তন্যপায়ী বা কর্মবেদী জীবের মস্তিষ্কে ইহা সুগঠিত রূপে দেখা যায়।

এইভাবে আমরা দেখিতে পায় যে, প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ যাবতীয় উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদের নির্ভুলরূপেই কর্মবেদী শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালীন হিন্দুমনীষিগণ যাহা কেবলমাত্র অবলোকন ও অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

[উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে যে, ভাগবতোক্ত হিন্দুমত এবং উমাস্মতি রচিত জৈন মত—এই উভয় মতের মধ্যেই যথেষ্ট সারবত্তা আছে।]

কর্মবেদী জীবদের কর্মের উপর প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। এই বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রকৃত মৃত্যু হয় তখনই যখনই কিনা তাঁহারা তাঁহাদের করণীয় কর্ম পরিত্যাগ করে। এই সম্পর্কে কয়েকজন হিন্দুমনীষী উপদেশ দিয়াছেন যে, বৃদ্ধবয়সে (বিদ্যানুশীলনের জন্য শক্তি সংগ্রহার্থে) জীবনের যা কিছু ঘটনা তাহাদের মনে পড়ে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, লিখন, ভাষণ ও প্রদান (বিদ্যাদান) দ্বারা তাহাদের ধীশক্তি পুনরর্জিত হইতে পারে।

হিন্দুমনীষিগণের উপরোক্ত মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা চলে। আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-সমূহে মাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ বা cell আছে। এইজন্য বৃদ্ধবয়সে মানুষের কোনও নূতন চিন্তাধারা উহাতে সন্নিবেশিত হইতে পারে না। এই সকল কারণে দিবসের পরিশেষে অতি প্রয়োজনীয় নিদ্রার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় মহাস্থবিরগণ অন্তরের সহিত মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এজন্য প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে, অশতিবয়স্ক বৃদ্ধগণ পঞ্চাশ বা ষাট বৎসরের পুরানো ঘটনা মনে করিয়া বলিতে পারিলেও দুই ঘণ্টার পূর্বের ঘটনাও ভুলিয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুগণ মনে করিতেন যে, কৃত্রিম উপায়ে মস্তিষ্কের স্মৃতিযুক্ত কোষসমূহ হইতে ঐ সকল ঘটনার স্মৃতি অপসারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব। জীবনের পূর্বতন ঘটনা ও চিন্তাধারাসমূহ লিপিবদ্ধ হইলে উহাদের ধরিয়া রাখিবার

জন্য স্বাভাবিক প্রচেষ্টা মানুষের মন হইতে বিদূরিত হইয়া মস্তিষ্কের কোষসমূহকে নূতন চিন্তাধারা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলে। এইজন্যই হয়তো বার্ণাড’শ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষী এবং কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে অশীতিবর্ষ বয়সেও বুদ্ধিদীপ্ত মন আমরা ধরিয়া রাখিতে দেখিয়াছি।

উপবিভাগ—সৃষ্টিক্রম

প্রাচীন হিন্দুগণ জীবদিগের তিনপ্রকার বিভাগের কল্পনা করিয়াছিলেন, যথা—মানসিক বিভাগ, দৈহিক বিভাগ এবং জননবিভাগ। কিন্তু উহাদের কোনওটির জন্য তাহারা সুদূরপ্রসারী উপবিভাগসমূহের সৃষ্টি করিয়া যাননি। উমাস্বতি প্রবর্তিত মানসিক বিভাগে আমরা জীবদিগের উপবিভাগের সূচনা মাত্র দেখি। কিন্তু উহারা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিবে তাহা বলা বড় শক্ত।

[জৈন পণ্ডিত উমাস্বতির মতে জীবদিগের মানসিক বিভাগগুলির বহু উপবিভাগও আছে। সম্ভবতঃ তিনি মনে করিতেন যে, কঠিন, লঘু, উষ্ণ, শীত প্রভৃতি এক এক প্রকার স্পর্শবোধ এক একটি যোনির নিরস্থিক জীবগণ অধিক পছন্দ করে। এজন্য উহাদের এক একটি জীবকে শীত গ্রীষ্ম ঋতু ভেদে এবং নরম বা লঘু কিংবা কঠিন প্রভৃতি স্থানে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি বিভিন্ন জীবগণের খর, তিক্ত, অম্ল, মিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদ এবং নীল, লাল, সবুজ, পীত প্রভৃতি বর্ণবোধ সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে উহাদের ততো, বিততো, খনো প্রভৃতি শব্দ ও বিভিন্ন প্রকার গন্ধের পছন্দাপছন্দের বিষয়েও তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে এই সম্বন্ধে যেহেতু আমি নিজে সমধিকরূপ পরীক্ষা করিতে পারিনি সেই হেতু এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিব না।]

উমাস্বতির ন্যায় ভাগবতকারও তাঁহার সৃষ্ট মানসিক বিভাগের কয়েকটি উপবিভাগের পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু উহাদেরও সুদূর-

প্রসারী উপবিভাগ বলা যায় না। একমাত্র বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত উপবিভাগসমূহকেই সুদূরপ্রসারী উপবিভাগ বলা যাইতে পারে। এক্ষণে এই উপবিভাগসমূহ হিন্দুগণ প্রবর্তিত বিভিন্ন জীব-বিভাগের কোনটির উপবিভাগ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। সকল দিক বিবেচনা করিলে উহাদের মানসিক বিভাগের অন্তর্গত কর্মবেদী, দৈহিক বিভাগের অন্তর্গত স্তনপা, কিংবা জনন বিভাগের অন্তর্গত জরায়ুজ বিভাগ-রূপ যে কোনও একটি জীব-বিভাগের উপবিভাগ রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, উহারা সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় একটি পৃথক জীব-বিভাগের অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। প্রকৃতপক্ষে এই সকল উপবিভাগ সৃষ্টিক্রমের ধারা (Evolution) লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের মধ্যে কয়েকটি হাইপথিটিক্যাল ক্রমলুপ্ত (কাললুপ্ত) জীবও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্বাক, তীর্যক, শফ, নখ প্রভৃতি জীব সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। এই শফ জীব হইতেছে একশফ, দ্বিশফ, ত্রিশফ, চতুর্শফ, পঞ্চশফ জীবের পূর্বপুরুষ এবং এই নখ জীব হইতেছে পঞ্চনখ (শৃগাল কুকুর ব্যাঘ্র প্রভৃতি) এবং চতুর্নখ (শশকাদি) জীবের পূর্বপুরুষ ; এবং তীর্যক জীব (চতুষ্পদ) হইতেছে এই শফ ও নখ, এই উভয় শ্রেণীর জীবেরই 'কমন এ্যানসেসটার' বা গোত্রগত পূর্বপুরুষ। য়ুরোপে সর্বপ্রথম Ernsf Hackel সাহেব (১৮২৫- ১৮৯৫ সময়) আর্যঋষিগণের ন্যায় 'ইভোলিউসন' থিওরীর উপর নির্ভর করিয়া জীবদিগের শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করেন। এক জীবগোষ্ঠীর সহিত অপর এক জীবগোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিরূপণার্থে তিনিও কয়েকটি হাইপথিটিক্যাল এনসেসট্রাল (ancestral) জীবের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি এই সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় উপবিভাগ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

প্রাচীন ঋষিগণের মতে বিবিধরূপ কর্মে (ভাগবতম্) অভিলাষী

হওয়ার কারণেই বিবিধরূপ অধুনাদৃষ্ট জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইসকল কর্ম করিবার জন্য প্রথমে তাহাদের দন্ত এবং পরে নখ ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে উহাদের একদলের নখসমূহ ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় খুরে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণে প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ যাবতীয় স্তনপা জীবগণকে তাহাদের দন্তের, নখের ও খুরের গঠন অনুযায়ী নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।
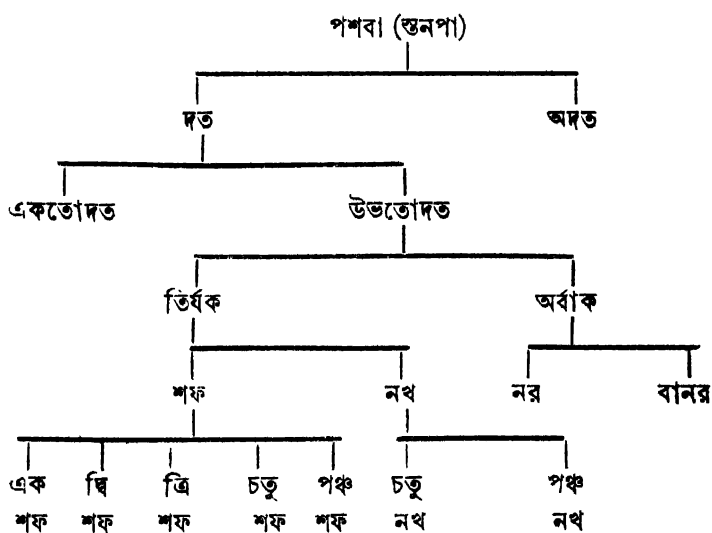
বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে "একতোদতঃ (এক+উতঃ+দতঃ) এবং উভতোদত (উভ+উতঃ+দতঃ) এই প্রতিশব্দ দুইটি আমরা পুনঃপুনঃ পাইয়াছি। একতোদত অর্থে যাহাদের দাঁত মাত্র একবার উঠে অর্থাৎ দুধে দাঁত আর না পড়িয়া গিয়া থাকিয়াই যায় তাহাদেরই বুঝায়; এবং

উভতোদতঃ অর্থে যাহাদের দাঁত দুইবার উঠে অর্থাৎ যাহাদের দুধে দাঁত পড়িয়া গিয়া পরে তেলা দাঁত উঠে তাহাদেরই বুঝায়। এই একতোদত এবং উভতোদত শব্দ দুইটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কোথাও দেওয়া হয় নাই। এই জন্য আধুনিক পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উহাদের ভুল ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন। কোনও কোনও নবীন টুলো পণ্ডিত গরুকে একতোদত জীব এবং ঘোড়াকে উভতোদত জীব বলিয়াছেন। গরুর চোয়ালের নীচের পাটির সম্মুখের দিকে দাঁত নাই, কিন্তু উহাদের উপরের পাটিতে (সম্মুখে এবং পিছনে) অনেকগুলি দাঁত আছে। এইজন্যই হয়তো তাঁহারা গরুকে একতোদত জীব বলিতে চান। কিন্তু নীচের পাটির সম্মুখের দিকে কোনও দাঁত না থাকিলেও উহার পিছনের দিকে অনেকগুলি দাঁত আছে। এই কারণে এই গরুকে কোনক্রমেই একতোদত জীব বলা যায় না। অপরদিকে ঘোড়ার উভয় পাটিতে পিছনের এবং সম্মুখের বহু দাঁত পরিলক্ষ্য করিয়া ঘোড়াকে তাঁহারা বলিয়া থাকেন উভতোদত জীব। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আধুনিক সংস্কৃত পণ্ডিতগণের গরু ও ঘোড়া ব্যতীত অন্য কোনও জীব সম্বন্ধে কোনও রূপই অভিজ্ঞতা নেই। কয়েকটি গৃহপালিত পশু ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীদিগের জীবনধারা পর্যালোচনা করার কোনও সুযোগ না থাকায় তাঁহারা এইরূপ ভুল করেন। অপরদিকে এই শব্দ দুইটির রচয়িতাগণ তপোবনে বাস করিতেন এবং নানা কার্যব্যপদেশে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। খুব সম্ভবতঃ এই সকল ঋষিগণ একোদত অর্থে কাঙ্গারু প্রভৃতির ন্যায় নিম্ন স্তন্যপায়ী জীবদের এবং উভতোদত অর্থে বিবিধ উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদের বুঝিতেন। এই কাঙ্গারুর ন্যায় জীবদের দাঁত একবারই উঠিয়া থাকে এবং মানুষ প্রভৃতি জীবদের দাঁত উঠিয়া থাকে দুইবার করিয়া। এই কাঙ্গারু প্রভৃতির ন্যায় জীব এক্ষণে এই দেশে পাওয়া

যায় না, কিন্তু কে বলিতে পারে যে ঐরূপ দুই একটি জীব-বংশ পুরাকালে এই দেশে দৃষ্ট হইত না। আর্য মনীষিগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্র যাত্রাতেও অভ্যস্ত ছিলেন এবং হয়ত কোনও দ্বীপপুঞ্জে এই সকল জীবের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই একোদত এবং উভতোদত ব্যতীত দত এবং অদত প্রতিশব্দ দুইটিও সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, কর্মবেদী জীবের প্রথম উপবিভাগগুলি কল্পনা করা হইয়াছে, উহাদের দাঁতের ব্যবস্থা অনুযায়ী। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে জীবদিগের এই দন্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর পরিবর্তনের সহিত পৃথিবীর গাছ-গাছড়ারও পরিবর্তন হয়। যে-সকল জীবকে এই গাছ-গাছড়া ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, এই গাছ-গাছড়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দন্তেরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও তাহাদের বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। তৃণভোজী জীবদের দন্ত এবং মাংসভোজী জীবদের দন্ত কখনও একপ্রকারের হয় না। জীবদিগের এই দন্তের তথা স্বভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের পদের এবং পদাগ্রেরও (খুর বা নখ) পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কারণ বিভিন্নরূপ জীবনযাপন ও আহার গ্রহণের সহিত জীবদিগের এই খুর, নখ প্রভৃতিরও একটা প্রগাঢ় সম্বন্ধ আছে। দন্ত এবং পদের এবংবিধ পরিবর্তনের সহিত তাহাদের দেহাকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। জীবের দেহের ও তৎসহ অঙ্গাদির পরিবর্তনের জন্য আবহাওয়া ও খাদ্যাদির পরিবর্তনই যে বিশেষরূপে দায়ী তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে।

[সরীসৃপ জীবাদিরও দন্ত আছে বটে, কিন্তু উহা মাত্র শিকার

নিষেকিত হইয়া ডিম্বাকারে বহির্গত হয়। ইহারা স্তন্যপায়ী জীব বটে কিন্তু জরায়ুজ জীব নহে।* হিন্দু পণ্ডিতগণ খুব সম্ভবতঃ ইহাদের অণ্ডজ জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। কোনও কোনও কীটভুক জীবের বয়ঃপ্রাপ্তির পরে আর দন্তের সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আর্য ঋষিগণ এই সকল কীটভুক জীবদেরই অদত জীব মনে করিতেন।

দত জীবদিগকে দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—একতোদত এবং উভতোদত। সাধারণতঃ নিম্ন স্তন্যপায়ীদের দাঁত মাত্র একবার উঠে, এইজন্য উহাদের লক্ষ্য করিয়াই এই একতোদত শব্দটি সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। বহু উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবগণের দুইবার করিয়া দাঁত উঠে, এজন্য উহাদের উভতোদত জীব বলা যাইতে পারে।

একতোদত জীবদিগের জন্য আর কোনও উপশ্রেণীবাচক শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই উভতোদত জীব পূর্বে

---

* পুরাকালে নিম্ন স্তন্যপায়ী কয়েকটি জীব যে ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল তাহা সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াই আমি উক্তরূপ আলোচনা করিতেছি। বনরুই প্রভৃতি অনুরূপ কয়েকটি জীব এখনও এদেশে দেখা যায়। এই বনরুই জীব উহাদের দেহের আঁশ বা শল্কা সকল ইচ্ছামত ঊর্ধ্বমুখী করিতে পারে। ইহারা পিপীলিকা ভুক Ant Eater জীব। ইহারা পিপীলিকা উই প্রভৃতি ভক্ষণার্থে ঐ সকল ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীবের গাদায় শুইয়া পড়ে। ইহাতে ঐ সকল পিপীলিকা প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদের গাত্রচর্ম কামড়াইয়া ধরিলে উহারা তাহাদের ঊর্ধ্বমুখী শল্কা সকল নিম্নমুখী করিয়া গাত্রের সহিত উহাদের চাপিয়া ধরিয়া জলে নামে। পুষ্করিণীর জলে ডুব দিয়া তাহারা শল্কা উন্মুক্ত করিলে পিপীলিকাসমূহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে উহারা তাহাদের ভক্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গে বহু জেলায় ঐরূপ নিম্ন স্তন্যপায়ী কীটভুক জীব এখনও স্বল্প সংখ্যায় বর্তমান আছে। হয়তো পুরাকালে আরও অধিক সংখ্যায় ইহাদের এই দেশে পাওয়া যাইত।

ভারতবর্ষে বহু সংখ্যায় জীবিত ছিল এবং আজও আছে। এইজন্য এই উদ্ভতোদত জীবের জন্য বহু শ্রেণী এবং উপশ্রেণীবাচক শব্দ আমরা পাইয়া থাকি। এই উভতোদত জীবদিগকে আর্য ঋষিগণ দুইটি প্রধান উপবিভাগে ভাগ করিয়া গিয়াছেন; যথা—(১) তীর্যক এবং (২) অর্বাক।

উভতোদত জীবগণের মধ্যে যে-সকল জীব সরলভাবে চলিতে বা বসিতে পারে এবং তৎজনিত অর্বাক গতিতে অর্থাৎ উপর হইতে নিচের দিকে আহারাদি গ্রহণ করে তাহাদেরই বলা হইয়া থাকে অর্বাক জীব। এই অর্বাক জীবগণ আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা—(১) নর এবং (২) বানর। এই বানর বলিতে ওরাঙউটাং, গিবন, হনুমান প্রভৃতি জীবও বুঝায়। কারণ বানরের প্রকৃত অর্থ নর সদৃশ্য জীব। বা+নর= নর সদৃশ্য। যে সকল জীবগণ চারিটি পদের উপর ভর দিয়া চলে এবং তৎজনিত তির্যক গতিতে আহারাদি গ্রহণ করে আর্য ঋষিগণ তাহাদের তির্যক জীব বলিতেন।

এই তির্যক ও অর্বাক শব্দ দুইটির সহিত সৃষ্টিক্রম বা ইভোলিউসন, থিওরীর ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবী এক সময় অতীব শীতল হইয়া যায়। ইহার ফলে ঠাণ্ডা রক্তসম্ভূত সরীসৃপগণকে ছুটাছুটি করিয়া উষ্ণ রক্তসম্ভূত স্তন্যপায়ী অর্বাক জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইতে হয়। ছুটাছুটির সুবিধার জন্যই তাহাদের দেহটি চারিপদের উপর ভর দিয়া উপরে উঠাইতে হইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর উত্তরাংশ ঐ সময় অতবেশী শীতল না থাকায় ঐখানে শীতল রক্তসম্ভূত সরীসৃপদের কোনও অসুবিধা ঘটেনি। এইজন্য ঐস্থানে তারা পূর্বেকার ন্যায় বিবিধ প্রকার সরীসৃপরূপেই বর্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু পরে জুরাসিক ও ক্রীটেসাস্ যুগে পৃথিবীর শীতলতা (Cold period)

কাটিয়া যাইলে দলে দলে বিরাট লিজার্ড জাতীয় সরীসৃপগণ দক্ষিণ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ঐ সময়কার আদিম স্তন্যপায়ী তির্যক জীবগণের ইহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এইজন্য ঐ যুগদ্বয়ের ভূস্তরে আমার স্তনপা জীবের মাত্র অল্প সংখ্যক প্রসিল কঙ্কাল পাইয়া থাকি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ঐ সময় যাহারা বৃক্ষারোহী হইতে পারিয়াছিল তাহারা এই নূতন বিপদ হইতে নিরাপদ হয়। এই বৃক্ষারোহী স্তন্যপায়ী জীবগণ হইতেই পরে দ্বিপাদ অর্বাক জীবের সৃষ্টি হয়। ইহার পর সম্ভবতঃ অপর আর একটি বরফ যুগের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে বৃহদাকার সরীসৃপগণ সবংশে নির্মূল হইয়া যায়। ইহার ফলে যে সকল চতুষ্পদ তির্যক জীব তখনও পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল তাহারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া প্রথমে প্রাচীন নখজীবের সৃষ্টি করে এবং তাহার পর ঐ প্রাচীন নখজীব হইতে সৃষ্টি হয় শফ জীবের; পরে ঐ প্রাচীন নখজীব হইতে অধুনাদৃষ্ট চতুর্নখ ও পঞ্চনখ জীবের সৃষ্টি হয় এবং ঐ প্রাচীন শফ জীব হইতে এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ ও পঞ্চ শফ জীবের সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে, আর্যগণ উভতোদত জীবকে সর্বপ্রথমে তির্যক ও অর্বাক রূপ দুইটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কোনও অন্যায় তো করেন নি, বরং জীবদিগের উপরোক্তরূপে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিশেষ বিবেচনা শক্তিরই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর এই তীর্যক এবং অর্বাক জীবদিগকে উপরোক্ত কারণে আর্যঋষিগণ কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। অর্বাক জীব সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, এইবার তির্যক জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। এই তির্যক জীবগণকে আর্যঋষিগণ দুইটি মূল উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা—(১) শফ এবং (২) নখ।

বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে এই নখ জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রাচীন 'রেড্ স্যাণ্ড স্টোন স্তরে আমরা যে মৎস্যের কঙ্কাল পাইয়াছি উহাদের ডানা সকল লম্বা ও অঙ্গুলির ন্যায় দেখা গিয়াছে। এইরূপ মৎস্যের ডানা হইতে যে পরবর্তীকালে উন্নত জীবের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সকল মৎস্যের (fins) ডানার মূল রেখা হইতে চতুর্থ অঙ্গুলি (Toe) এবং ঐ ডানার পার্শ্ব রেখা (Rays) হইতে যে উন্নত জীবদের অন্যান্য অঙ্গুলি সৃষ্ট হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ঐ সময় মধ্যে মধ্যে জল শুকাইয়া যাইত বলিয়া পূর্বকালীন মৎস্যগণ জলসিক্ত কর্দমের উপর দিয়া প্রথমে লাফাইয়া চলিতে শিক্ষা করে। ইহার ফলে ধীরে ধীরে ইহাদের ডানার Rays বা রেথার চর্ম-সংযোগ (Web) নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহাদের ডানার ঐ পাঁচটি রেখা চর্মবিযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে নখযুক্ত অঙ্গুলির সৃষ্টি করিয়াছিল।

[প্রথমে সম্ভবতঃ উহারা তাহাদের কানকোর পাতলা চামড়া দ্বারা বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এদেশে এখনও এইরূপ একপ্রকার মৎস্য দেখা যায়, যাহারা খাদ্যান্বেষণের জন্য জল হইতে মধ্যে মধ্যে স্থলে উঠে। আমার মতে কানকোর মধ্যবর্তী থলি কালক্রমে ফুস্ফুসে পরিণত হয়। কেহ বলেন, তাহাদের পটকাটি ধীরে ধীরে ফুস্ফুসে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া আমি মনে করি না।]

এই ভাবে মৎস্য হইতে উভচর, উভচর জীব হইতে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতি প্রকৃত নখ-জীবদের ন্যায় উভচর জীব ও সরীসৃপ জীবদেরও পঞ্চনখ দেখিয়া

থাকি। এইজন্য কোনও কোনও টীকাকার এই সকল জীবদেরও নখ-জীব বলিয়াছেন। কিন্তু বহু মূল গ্রন্থে ও উহাদের টীকায় ইহাদের নখ-জীব বলা হয়নি। ইহার কারণ এই সকল জীবগণ কখনও নখের উপর ভর দিয়া চলেনি। উহারা তাহাদের বক্ষের উপরই ভর দিয়া চলাফেরা করে। এইজন্য এই সকল গ্রন্থকার মাত্র নখযুক্ত উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদেরই নখ-জীব বলিয়া অভিহত করিয়াছেন। এই উচ্চ স্তন্যপায়ী নখ-জীবের একদল নখের উপর ভর দিয়া চলার ফলেই পূর্বোক্ত নখ-জীব হইতে শফজীবের সৃষ্টি হয়, ইহা হইতে বুঝা যায় যে। এই নখ ও শফ শব্দটি জীবের সৃষ্টি ক্রম বা ইভোলিউশন সম্পর্কেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। এইজন্য সুস্পষ্টরূপেই প্রাচীন ভারতীয়েরা বলিয়া গিয়াছেন যে, নখ-জীব হইতেই শফ-জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এইবার কিরূপে পূর্বোক্ত নখ-জীবসমূহ হইতে বিবিধ শফ-জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা বিশদরূপে আলোচনা করিব।

ক্রমবিকাশের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে, পৃথিবীর এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন একদল সবল জীব অপর একদল দুর্বল জীবকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই দুর্বল জীবগণকে ছুটিয়া পলাইয়া তাহাদের খাদকগণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইত। উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্রমাগত নখের উপর ভর দিয়া ছুটাছুটি করার কারণে তাহাদের পাঁচটি পায়ের নখই ক্রমশঃ শক্ত হইয়া খুরে পরিণত হইয়া যায়। পরে কয়েক শত পুরুষ বাদে আরও দ্রুত ছুটাছুটি করার জন্য এই শ্রেণীর কোনও কোনও জীব মাত্র চারটি খুরের উপর ভর করিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। ফলে অপব্যবহার বা অপরাপর কোনও কারণে ইহাদের পঞ্চম খুরটি কয়েক পুরুষ বাদে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এইখানেই খুরের এই বিকাশধারা শেষ হয় নাই। কোনও কোনও জীব এইখানেই ক্ষান্ত
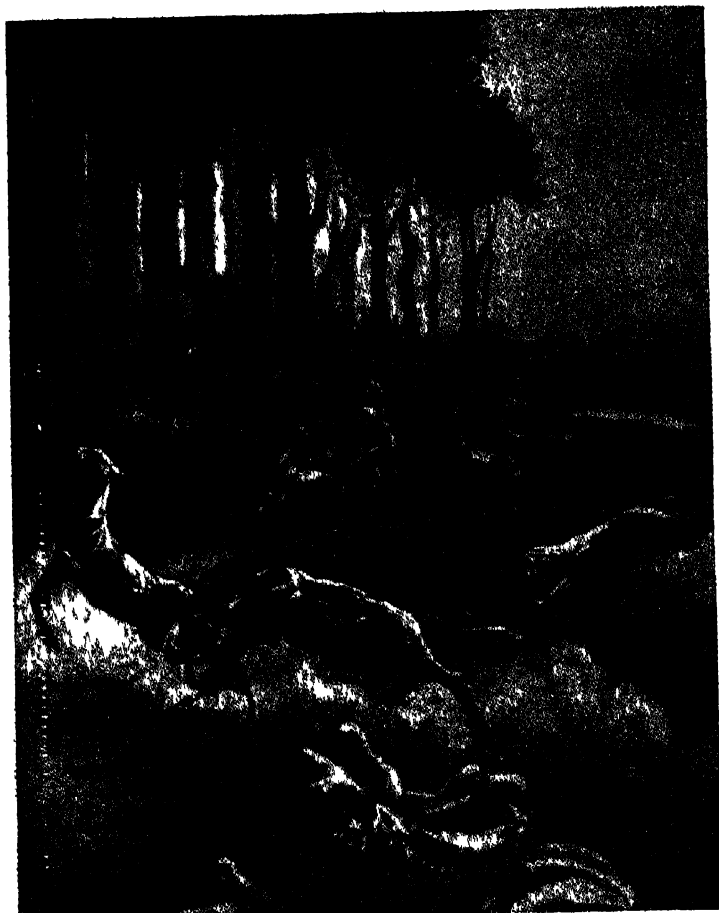
হিংস্র পশু তাড়িত প্রাচীন অশ্বকুল হইতে আধুনিক অশ্বের জন্ম

না দিয়া অধিকতর ছুটাছুটি সুরু করিতে থাকে, ফলে এই একই কারণে অনেক পুরুষ বাদে তাহাদের চতুর্থ এবং তৃতীয় খুরটিও বিনষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ গরুর চেরা খুরের পিছনে উপরের দিকে দুইটি ছোট ছোট লুপ্তপ্রায় খুর আজও অকারণে যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের একটি জীববংশ ছুটার মাত্রা আরও বাড়াইয়া ক্রমাগত দ্রুত ছুটাছুটি করার ফলে উহাদের ঐ দুইটি খুরের একটি বিলুপ্ত হওয়ায় উহারা এক খুব বিশিষ্ট ঘোড়াতে পরিণত হয়। বিভিন্ন যুগের মাটি খুঁড়িয়া বিভিন্ন প্রকার অশ্বের কঙ্কাল বাহির করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই বিশেষ সত্যটি প্রমাণিত করিয়াছেন।

আমেরিকার একটি নদীর খাদ খুঁড়িয়া ঐরূপ জন্তু, বিশেষ করিয়া ঐরূপ সেকেলে ঘোড়ার বহু কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে সেই নদীর ধারে, ঐরূপ অনেক ঘোড়া সবুজ ঘাস খাইতে আসিত, আর ঐ নদীটি দুই চারি বৎসর অন্তর অন্তর দুই কূল ছাপাইয়া বন্যা আনিয়া তাহাদের ডুবাইয়া দিত। জল সরিয়া যাইলে বন্যার বালিতে চাপা পড়িয়া তাহাদের জীবন্ত সমাধি ঘটিত। এই সমাধির উপর আবার ঘাস জন্মাইত, আবার ঘোড়া সেইখানে আসিত এবং কয়েক বৎসর পর আবার একদল ঘোড়ার এইভাবে সলিল সমাধি ঘটিত। সেইখানকার প্রত্যেক বালির স্তরে আমরা এক এক প্রকারের ঘোড়ার চিহ্ন পাইয়া থাকি। সর্ব নিম্নস্তরে আমরা পাই নখসহ পাঁচ অঙ্গুলিযুক্ত থাবা-ওয়ালা ঘোড়া। তাহার উপরিস্তরে আমরা চারি অঙ্গুলিযুক্ত, তাহার উপরে দুই অঙ্গুলিযুক্ত এবং তাহার উপরে আমরা এক খুরবিশিষ্ট ঘোড়া পাইয়া থাকি। খুরগুলি আর কিছুই নহে, উহারা আসলে পায়ের নখ মাত্র। কাটিলে লাগে না। নখের উপর ভর দিয়া ছুটা-ছুটি করার জন্যে এই খুরের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ এই নখগুলিই

শক্ত হইয়া খুরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উহারা সেইখানে জমা থাকিয়া উহাদের পূর্ব ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। বালির এই বিভিন্ন স্তরগুলি যেন অশ্ব-জীবের জন্ম ইতিহাসের এক একখানি পাতা। এই পাতার উপর রক্ষিত খুর এবং দন্তাদি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গরু বা ঘোড়ার প্রথমে খুর ছিল না। পাঁচ অঙ্গুলি বিশিষ্ট চারিটি থাবা ছিল। উহারা নাতি উচ্চ বৃক্ষ হইতে পাতা সংগ্রহ করিয়া আহার করিত। কিন্তু এই সময় পৃথিবীতে একটি নৈসর্গিক বিপ্লব দেখা যায়। তাহাতে বহু বৃক্ষ মরিয়া যায় এবং তাহার ফলে পৃথিবীর কোনও অংশ উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়। গাছের পাতার বদলে তখন তাহাদের ঘাস খাইযা জীবন ধারণ করিতে হইত। ইহাব ফলে উহাদের পদাগ্রের ন্যায় দাঁতের গঠনও ধীবে ধীরে বদলাইয়া গিয়াছে।

অশ্ব প্রভৃতি জীবের জন্ম হইয়াছিল তৃণাচ্ছাদিত উন্মুক্ত প্রান্তরে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটাছুটির সুবিধাও আছে। এইজন্য এই সকল জীবের প্রথমে দাঁত ও পদ কিংবা একত্রেই পদ ও দন্তের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। ইহার পর ইহাদের উপর হিংস্রজন্তুদের আক্রমণ সুরু হইলে ইহারা যে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া এক শফ-জীবে পরিণত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে!

ইহার পর পৃথিবীর স্থান বিশেষের নৈসর্গিক প্রভৃতি কারণে আরও অদল বদল হইতে থাকে। এদিকে খাদ্যের অভাবে জীবন সংগ্রামও সুরু হইয়া যায়। খাদ্যের অভাবে সম্ভবতঃ পশুরা পশুদেরই খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ফলে এই সকল পশুদের দাঁত ও মুখের অবস্থা আরও বহুল পরিমাণে বদলাইয়া যায়, নখেরও। যাহারা আত্ম-রক্ষার্থে ঘুরিয়া দাঁড়াইল তাহারা মাংসাশী বা নখ জীবে কিংবা গণ্ডার প্রভৃতির ন্যায় ভয়ঙ্কর জীবজন্তুতে পরিণত হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে

যাহারা দুর্বল ছিল তাহারা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে সুরু করিয়াছিল। ইহারা সকলেই নিরামিষাশী রহিল বটে, কিন্তু ইহাদের কেহ পলাইবার জন্য পায়ের জোর বাড়াইল, কাহারও বা ধারালো দাঁত বা শিং-এর উদ্ভব হইল। ফলে বাঘ, সিংহ, হরিণ, মহিষ, গণ্ডার, খরগোস প্রভৃতি বিবিধরূপ জীবজন্তু আজ আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই। আসলে কিন্তু এই সকল জীববংশেরই উদ্ভব হইয়াছে একই রূপ এক জীবের বংশ হইতে; অর্থাৎ একই জীব ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে নানারূপে বদলাইয়া অধুনাদৃষ্ট এতগুলি জীবে পরিণত হইয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নখ-জীব হইতেই অশ্ব (খুর) প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। শিকার ধরিবার সুবিধার জন্য নখ হইতে খুরধার প্রকৃত নখের এবং পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ঐরূপ নখ হইতে খুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগণ এই শফ ও নখ-জীবদের বিবিধ উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে শফ জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। যত দূর বুঝা যায় এই শফ জীবগণকে হিন্দু ঋষিগণ পাঁচটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে আমরা এই একশফ এবং দ্বিশফ জীবের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাই। গজায়ুর্বেদে আমরা হস্তী রূপ পঞ্চশফ জীবেরও উল্লেখ দেখি। কিন্তু কোনও সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ত্রিশফ ও

চতুর্শফের কোনও উল্লেখ এখনও আমরা পাই নি। গণ্ডার বহুল দেশে গণ্ডার রূপ ত্রিশফ জীবের সন্ধান যে তাঁহারা রাখিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সম্যকরূপে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে কোনও না কোনও শ্লোকে নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে।

হিন্দুদের মতে এক শফ জীব পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, গর্দ্দভ, অশ্বতর ও অশ্বাদি এক শফ ; উষ্ট্র, জিরাফ ও গবয়াদি দ্বিশফ ; গণ্ডার রূপ জীব ত্রিশফ ; সুকর, টাপির, জলহস্তী (হিপ্পোপটেমাস্) প্রভৃতি চতুর্শফ এবং হস্তীরূপ জীব পঞ্চশফ। একই কোনও পঞ্চনথ (পরে পঞ্চশফ) জীব হইতে এক একটি করিয়া অঙ্গুলি হারাইয়া উপরোক্ত রূপ পাঁচ প্রকার শফ (এক, দ্বি, ত্রি, চতু ও পঞ্চশফ) জীবের সৃষ্টি হয়।

এই শফ জীবগণের মধ্যে যাহারা কোনও অঙ্গুলি বিনষ্ট না করিয়াই জঙ্গলাদিতে আশ্রয় লইয়াছিল এবং নিজেদের সবল জীবে পরিণত করিতে পারিয়াছিল তাহারা পঞ্চশফ হস্তী জীবে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা একটি শফ হারাইবার পর অগাধ জলে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা জলহস্তী রূপ চতুর্শফ জীবে এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা দুইটি শফ হারাইবার পর জলাভূমিতে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার্থে শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়াছিল তাহারা ত্রিশফ গণ্ডার জীবে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা তিনটি অঙ্গুলি বিনষ্ট হইবার পর জলাভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের আর ছুটিয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজন না থাকায় তাহারা গবাদি দ্বিখুর জীবে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে অশ্বজীবের পূর্বপুরুষগণ উন্মুক্ত প্রান্তরেই বাস করিতে থাকে এবং ক্রমাগত ছুটিয়া ছুটিয়া এক খুর বিশিষ্ট অশ্বজীবে পরিণত হয়।

[এই হস্তিজীব জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করায় বৃক্ষের উচ্চশাখা হইতে খাদ্যের জন্য উহাদের পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। পণ্ডিতদের মতে উপরের

ঠোট সহ (?) তাহাদের নাসিকা এই কারণে বংশপরম্পরায় ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া শুঁড়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে জিরাফ জীবের গলদেশও অনুরূপ কারণে বর্ধিত হইয়া বর্তমানাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষাদি নৈসর্গিক কারণে যতই উচ্চ হইতে থাকে উহাদের গলদেশ বর্ধন করিবার ততই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে বায়ুতাড়িত বালুকণা হইতে চক্ষু কর্ণ মুখ ও মাথা রক্ষার্থে মরুবাসী উষ্ট্রজীবদেরও গলদেশ বংশপরম্পরায় ভূমি হইতে বহু উর্ধ্বে উঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।]

হিন্দু ঋষিগণ নখ-জীবগণকে দুইটি (মতান্তরে তিনটি) উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।

এই নখজীবের মধ্যে যাহাদের খাবার পাঁচটি অঙ্গুলির সাহায্যে শিকার ধরিয়া খাইতে হইত, তাহাদের নখযুক্ত পাঁচটি অঙ্গুলি থাকিয়া যায়ই, পরন্তু তাহাদের নখগুলিও ধারাল হইয়া উঠে। অপর দিকে এই নখজীবদের মধ্যে যাহারা নখের সাহায্যে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত করিয়া ঐ গর্তের মধ্যে বাস করিত, গর্ত করিবার সুবিধার জন্য বোধ হয় তাহারা তাহাদের একটি অঙ্গুলি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই চতুর্নখ জীবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ খরগোস আদি জীবের কথা বলা চলে।

[কীটভুক একতোদত প্রাচীন নখজীবগণ তাহাদের বাসস্থান ও স্বভাবের বিভিন্নতা হেতু সর্বশুদ্ধ তিনটি নখজীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা : (১) যে সকল কীটভুক জীব স্বজাতীয় দুর্বল জীব

সহ বৃহদাকার জীব শিকার করিতে থাকে তাহারা ধীরে ধীরে ব্যাঘ্র কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে প্রভৃতি (মাংসাশী) ক্রব্যাদ বা হিংস্র জীবের সৃষ্টি করে। (২) কয়েকটি কীটভুক নখ-জীব আবার গর্ত তৈয়ারী করিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে অভ্যস্ত হয়। এই সকল গর্তের মধ্যে ঢুকিয়াই তাহারা শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিত। ইহারাই ধীরে ধীরে খরগোস, ইন্দুর প্রভৃতি জীবের জন্ম দেয়। গর্ত করার সুবিধার জন্য ইহাদের দাঁতের রূপ বদলাইয়াছে এবং এই একই কারণে শশকাদির নখ সহ একটি অঙ্গুলিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। (৩) এই কীটভুক নখ-জীবের একটি গোষ্ঠী আকাশে উড্ডয়নে অভ্যস্ত হইয়া তাহাদের সম্মুখাঙ্গ দুইটি চর্মপক্ষে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়া বাদুড় প্রভৃতি চর্মপক্ষ জীবের জন্ম দিয়াছে।

যে সকল প্রামাণ্য শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া এই একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনখ প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল শ্লোকের কতকগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে অনুরূপ আরও কয়েকটি শ্লোক এই সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

(১) ক্রব্যদানঃ শকুনিনঃ সর্ব্বাংস্তথা গ্রামবাসিনঃ
অনির্দ্দিষ্টাং শৈচকশফং টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

মনুসংহিতা

(২) নভক্ষ যেদেকাচবাণ জ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান।
ভক্ষ্যেত্বপি সমুর্দ্দিষ্টান্ সর্ব্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা ॥

মনুসংহিতা

(৩) শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গা কুর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষণ পঞ্চনখেষ্বহুবপুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ ॥

মনুসংহিতা

(৪) কথয়াম্যেষ তে ব্রাহ্মন্ সসর্জ্জ ভগবান্ যথা।
লোক কৃচ্ছাশ্বতঃ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্ ॥
তস্যাভিধ্যায়তঃ স্বর্গং তির্য্যক্ স্রোতো হ্যবর্ত্ততে।
যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তিঃ সা তির্য্যক স্রোতস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
প্রতুর্ব্বভৌ তদাব্যক্তাদর্ব্বাক স্রোতস্তু সাধকঃ।
যস্মাদর্ব্বাগবর্ত্তন্ত ততোঽর্ব্বাক স্রোতস্ততে ॥
তির্য্যক্স্রোতস্তয়ঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্ যোন্য স পঞ্চমঃ।
ততোঽর্ব্বাক্ স্রোতসাং সর্গ সপ্তমঃ স তু-মানুষা ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

শেষ শ্লোকটি হইতে ইহাও জানা যায় যে, তির্যক জীবের পর অর্বাক জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ তির্যক জীব হইতেই অর্বাক জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে একশফ এবং পঞ্চনখ শব্দের আমরা উল্লেখ দেখিতে পাই। এই একশফ এবং দ্বিশফ জীবকে সকল গ্রন্থেই যথাক্রমে অশ্ব এবং গবয় জীবরূপে বলা হইয়াছে এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি ব্যতীত প্রায় সকল শ্লোকেই পঞ্চনখ জীব বলিতে কেবলমাত্র ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি জীবগণকে বুঝান হইয়াছে।

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তুষড়্ বিধস্তস্পৃষাঞ্চয়ঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্সারা বীরুধোক্রমাঃ।
উৎস্রোত সপ্তমঃ প্রায়াঃ অন্তস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥
তির্য্যশ্চামষ্টমং সর্গ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিণঃ ॥
গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম।

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা।
এতে চৈকশফা যত্তু শৃনু পঞ্চনখান্ পশূন ॥
শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রামার্জ্জারঃ শশল্লকৌ।
সিংহো কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥
কঙ্ক গৃধ্র বক শ্যেণ ভাস ভল্লক বর্হিনঃ।
হংস সারস চক্রাহ্বকোলুবকাদয়ঃ খগাঃ ॥
অর্ব্বাক্ স্রোতস্ত নবমঃ ক্ষতবেক বিধো নৃনাং।
রজোঽধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখ মানিনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তাৎপর্য্যঃ—অপর যে সকল স্থাবরের সৃষ্টি হয় তাহা সপ্তম সৃষ্টি, তাহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ প্রথমে হইযাছিল। এই নিমিত্ত তাহাকে মুখ্য বলে। এই স্থাবর ষড়বিধ হয় তন্মধ্যে প্রথম, বনস্পতি অর্থাৎ পুষ্প ব্যতিরেকে ফলশালী বৃক্ষ; দ্বিতীয়, ঔষধি অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষ ফল পক্ক হইলে বিনষ্ট হয়; তৃতীয়, লতা অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের অবলম্বনার্থে আরোহণাপেক্ষা আছে; চতুর্থ, ত্বকসার অর্থাৎ বেনু প্রভৃতি; পঞ্চম, বিরুধ অর্থাৎ লতা বিশেষ, কাঠিন্য হেতু তাহাদের আরোহণাপেক্ষা নাই; ষষ্ঠ, বৃক্ষ পুষ্পান্তর ফলশালী তরু।

এই সকল স্থাবরই উৎস্রোত অর্থাৎ আহারান্তে উর্ধ্বে সঞ্চরণশীল এবং উহারা সকলেই তমঃপ্রায় অর্থাৎ অব্যক্তচৈতন্য, তাহাদের কেবল অন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে এবং তাহারা অব্যবস্থিত পরিমাণাদি ভেদে বিবিধ ভেদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আর তির্যগযোনিদিগের সৃষ্টি অষ্টম, তাহা অষ্টবিংশতি প্রকার। তাহারা ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য বহুল তমোগুণবিশিষ্ট, একারণ আহারাদি মাত্রেই

তৎপর। তাহারা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে। [গবয় বা গরু প্রভৃতি জীব কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবার পূর্বে উহার আঘ্রাণ গ্রহণ করে, সম্ভবতঃ এই কারণে তাহাদের ঘ্রাণ সম্বন্ধীয় এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে]। তাহাদের হৃদয়ে কোনও জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ দীর্ঘানুসন্ধান শূন্য।

এই অষ্টবিংশতি তির্যগ যোনির নাম—গো, মহিষ, ছাগ, কৃষ্ণ (মৃগবিশেষ) শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ, উষ্ট্র। এই নয় প্রকার পশু দ্বিশফ অর্থাৎ ইহাদের পায়ে দুইটি করিয়া খুর আছে। আর গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌর (মৃগ বিশেষ), শরভ ও চামরী, এই সকল পশু একশফ অর্থাৎ ইহাদের পদে একটি খুর আছে।

কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক (সাজারু), সিংহ, কপির্গজ, কচ্ছপ, এবং গোধা (গোসাপ) এই বিবিধ প্রকারের জন্তু পঞ্চনখ। অর্থাৎ ইহাদের পাঁচটি করিয়া নখ আছে। এই কারণেই ইহাদের পঞ্চনখ বলে। আর মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, পেচক—এই সকল জন্তু খেচর অর্থাৎ ইহারা আকাশে বিচরণ করে।

অনন্তর মনুষ্য প্রভৃতি অর্বাক জীবের যে সৃষ্টি তাহা নবম। এই প্রাণীর আহার সঞ্চার অধোভাগে হয়। এই জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্যে রজোগুণই বেশী। এই নিমিত্ত ইহারা কর্মে তৎপর এবং দুঃখতেও সুখ অনুভব করে।

এইখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পঞ্চনখ জীবের মধ্যে এই শ্লোকটির রচয়িতা বানর, কচ্ছপ এবং গোধা জীবকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে উল্লেখিত কপির্গজ শব্দটির দ্বারা তাঁহারা কোন জীবকে বুঝিয়াছেন তাহা বলা বড় শক্ত। কারণ

উহা দ্বারা তাঁহারা যে বানর বা হস্তী বুঝেন নি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রাচীন শ্লোকগুলিতে হস্তী, কচ্ছপ এবং গোধাকে পঞ্চনখ জীবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আসলে এই শ্লোকটির রচয়িতা—এই পঞ্চনখ প্রভৃতি পরিভাষাগুলির সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আপন অভিমত অনুযায়ী ঐগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার মধ্যে যে ভুল থাকিয়া গিয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কিংবা এমনও হইতে পারে ঐ অতিরিক্ত জীব কয়টির নাম অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক পরে নকল করার সময় এই মূল শ্লোকটির সহিত প্রক্ষিপ্তভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি যে, কপির্গজ শব্দ দ্বারা অপর কোনও এক জীবেব কথা বলা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ আয়ুর্বেদোক্ত হস্তীমশক শব্দটির কথা বলা যাইতে পারে। এই শব্দ দ্বারা একপ্রকার মশক বুঝানো হইয়াছে, হস্তী ও মশক বুঝানো হয় নি। গজায়ুর্বেদ পাঠে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে, হস্তীমাত্রেই পঞ্চশফ জীব এবং উহাদের পদে নখের স্থানে পাঁচটি খুর আছে। এতদ্ব্যতীত বানর ও নরজীবকে সকল শ্লোকেই দ্বিপদ বা অর্বাক জীবরূপে অবিহিত করা হইয়া থাকে। নিম্নে এই সম্বন্ধে অপর আর একটি শ্লোক পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এই শ্লোকটিতে কেবল মাত্র পাশব জন্তুদিগকেই তির্যক জীব বলা হইয়াছে। গোধা, কচ্ছপ প্রভৃতি জীবকে কোথাও পশু বা পাশব জীব বলা হয় নি। তবে এমনও হইতে পারে যে, কোনও কোনও হিন্দুপণ্ডিত গোধা, কচ্ছপ, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতিকে একাধারে পঞ্চনখ বলিয়াছেন এবং কোনও কোনও পণ্ডিত এই ভুল শুধরাইয়া কেবলমাত্র ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি চতুষ্পদ হিংস্র জীবকে পঞ্চনখ জীব বলিয়াছেন। বলাবাহুল্য পুরাণ মাত্রই খ্রীষ্ট পরকালে

রচিত সঙ্কলিত গ্রন্থ। উহাতে খ্রীষ্ট পূর্বকালে প্রচলিত মতগুলি বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। এইজন্য ইহাতে কয়েকস্থানে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয়ে সামান্য সামান্য ভুল উক্তি করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের সহিত উহাদের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়।

অর্বাক্ স্রোতস্ত কথিতে ভবতা যস্ত মানুষা।
ব্রহ্মন বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা সমসৃজদ্‌যথা ॥
কস্মাৎ তির্যক্ প্রবৃত্তিঃ সা তির্যক্ স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ।
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃ প্রায়া হ্যবেদিনঃ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

[কোনও কোনও প্রাচীন টীকাকারের মতে শফ, নখ, শৃঙ্গ প্রভৃতির মূলদেশে বর্ধন কেন্দ্র থাকে (devoloping centre) এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবদেহের বর্ধন ঘটা সম্ভব। কোনও কোনও হরিণের বৃহৎ শৃঙ্গের ভারবহনার্থে তাহাদের দেহাবয়বেরও অনুক্রামিক বর্ধন ঘটে কি? এইরূপ মতবাদ সত্য হইলে এবংবিধ শ্রেণীবিভাগের মূল্য নিশ্চয়ই অসীম হইবে]।

দৈহিক শ্রেণী বিভাগ

আধুনিক দৈহিক শ্রেণী বিভাগের অনুযায়ী প্রাণীদিগের দৈহিক শ্রেণী বিভাগ পুরাকালে হিন্দুঋষিগণ কর্তৃকও পরিকল্পিত হইয়াছিল। এককোষ জীবকে ব্যষ্টি জীব বা ব্যষ্টি প্রাণ এবং বহুকোষ পৌষ্টিক জীবকে মুখ্য জীব বা মুখ্য প্রাণ বলা হইত। ব্যষ্টি জীবগণের সমষ্টি লইয়াই মুখ্য জীবগণের সৃষ্টি হইয়াছে। এইখানে ব্যষ্টি জীব বলিতে আমিবা আদি এককোষ জীবকেই বুঝাইত বলিয়া মনে হয় এবং মুখ্য জীব বলিতে বহুকোষ জীবগণকে বুঝাইত। নিম্নের শ্লোকটি (৫০০-৬০০ খ্রীঃ) হইতে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

অনুপ্রাণব্যস্তি যং প্রাণাঃ প্রাণান্তং সর্ব্বজন্তু।
অপনগুমপনাস্তি নর দেবামিবানগা॥ ভাগবতঃ

তাৎপর্য্যঃ—অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ জীবদেহবর্ত্তী ব্যষ্টি প্রাণসমূহ মুখ্যপ্রাণের শক্তিদ্বারা চালিত হয়। মুখ্যপ্রাণ নিশ্চেষ্ট হইলে উহারাও চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

উপরের শ্লোকটিকে একটি রূপক শ্লোক বলা যাইতে পারে। এই রূপক শ্লোকটির যথার্থ অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিব। জীবদেহ মাত্রই লক্ষ লক্ষ এককোষ জীবের সমষ্টি মাত্র। এই কারণে মূল দেহগত প্রাণটি বিমুচ্যত হওয়া মাত্র ব্যষ্টিগত প্রাণসকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। কনাদ ঋষির মতে 'ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব দেহ (সোন্দ্রিয়ামিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদনুভ্য' ইত্যাদি) বহু অনুজীব দ্বারা সৃষ্ট। বেদান্ত দর্শনে এই সকল অণুকে

দেহাণু বা cell বলা হইয়াছে। এই সকল মনীষীদের মতে বহু দেহাণু একত্রে যুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহ সৃষ্ট করিয়াছে। এই সম্বন্ধে বীজ বিজ্ঞান শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা বিশদরূপে আলোচনা করিব।

এইভাবে আমরা দেখিতেছি যে, জীবগণকে আর্যগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা ব্যষ্টি জীব এবং মুখ্য জীব। 'ব্যষ্টি জীব' বলিতে আমরা 'এককোষ' জীব এবং 'মুখ্যজীব' বলিতে 'বহুকোষ' জীব বুঝিয়া থাকি। [এককোষ (one cell) জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে আর্যঋষিগণ জ্ঞাত ছিলেন তাহা আমি ব্যষ্টিবিদ্যা (জীবাণু) পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিব।] এই মুখ্য জীবকে আর্যগণ আবার প্রধান দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন যথা—অস্থিকা এবং অনস্থিকা। নিম্নের শ্লোকটি হইতে বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে।

ক্ষুদ্রজন্তুরনাস্থি স্যাৎ অথবা ক্ষুদ্র এব চ।
শতং বা প্রসৃতৌ যেষাং কোটিবা নকুলাদপি॥
পাণিনিঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ ২+৪৫ কাশীকা।

পাণিনির এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা আমরা পাতঞ্জল মহাভাষ্য গ্রন্থে পাই। পাণিনির এই ক্ষুদ্রজন্তবঃ শব্দের ব্যাখ্যা স্বরূপ পতঞ্জলি বলিয়াছেন: "কো ক্ষুদ্রজন্তবঃ, অনস্থিকা ক্ষুদ্রজন্তবঃ। অথবা যেষাং স্বং শোণিতং নাস্তি তে ক্ষুদ্রজন্তবঃ। অথবা যেষাং আসহস্রাৎ অঞ্জুলি ন পুর্য্যতে তে ক্ষুদ্র জন্তবঃ। ক্ষোত্তবা জন্তবঃ ক্ষুদ্র জন্তবঃ। অথবা নকুল পর্য্যন্তাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।" ইতি পাতঞ্জল।

এই শ্লোকটি হইতে প্রধানতঃ আমরা দেখিতে পাই যে অনাস্থিকা (নিরস্থিক) শব্দরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বহু পূর্বেও বর্তমান ছিল। আধুনিক বাংলা পরিভাষার স্রষ্টাগণ উহাকেই নিরস্থিক বলিয়া

থাকেন। এই অনস্থিকা শব্দ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, অস্থিকা বলিয়াও একটি শব্দ ছিল। শ্লোকটির মধ্যে উল্লিখিত "স্বং শোণিতং" অর্থে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলা বড় শক্ত। কেহ কেহ মনে করেন যে, যাহার নিজস্ব কোন শোণিত নাই সেই জীবের কথাই ইহাতে বলা হইয়াছে। কৃমি আদি জীবগণ পরগাছারূপে পরের দেহভ্যান্তরে বাস করিয়া পরের শোণিত বা রক্ত হইতে নিজেদের দেহের জন্য খাদ্য তথা শোণিত আহরণ করে, এই কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে আর্যঋষিগণ এই কৃমিজীবের উদ্দেশ্যেই এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই কৃমিজীবগণ পরের ভুক্তদ্রব্য হইতে শোষণ দ্বারা খাদ্য আহরণ করে। সেই জন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে সকল জীবদেহে রক্ত নাই বা রক্তের প্রয়োজন হয় না, সেই সকল জীবকেই ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন উহা ঠিক কথা নয়, ইহার দ্বারা যে সকল জীবের রক্ত শ্বেত, লোহিত নয়, তাহাদিগকেই বুঝান হইয়াছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করিতে পারেন যে, আমিবা আদি এককোষ জীব যাহাদের দেহে রক্ত বলিয়া কোনও রূপ পদার্থই নাই ইহা দ্বারা তাহাদেরই বুঝানো হইয়াছে। "আসহস্রাৎ অঙ্গুলি ন পূর্য্যতে" এই বাক্যটি দ্বারাও এই এককোষ জীবদিগকেই বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার পুষ্করিণীর জলে আমিবা আদি এককোষ জীব চর্মচক্ষেও দেখা গিয়া থাকে। আর্যঋষিগণ এই বাক্যটি দ্বারা ইহা-দিগকেই বুঝাইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্যামা পোকার ন্যায় ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পোকাদের বুঝাইবার জন্যই এই উক্তিটি করা হইয়াছে। "ক্ষোত্তব্য" শব্দটির অর্থে এইখানে ইংরাজী Elastic জীবদিগকেই বুঝাইতেছে; অর্থাৎ যাহাদের পিষিয়াও মারা যায় না। এই শব্দটি দ্বারা জলৌকা বা জোঁকাদি জীবকেই বুঝানো হইয়াছে।

উপরের তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, এই অস্থিকা ও অনস্থিকা পরিভাষাটি পাণিনির (৭০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং পাতঞ্জলের (১৫০ খ্রীঃ পূঃ) সময় হিন্দুগণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ Vertebrata ও Invertebrata পরিভাষা য়ুরোপে J. B. P. A. de Lamarck সাহেব মাত্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রচলন করেন।

এই অস্থিকা জীবকে আর্যঋষিগণ যে কয়েকটি উপবিভাগেও বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই পাঁচটি উপবিভাগের তাঁরা নাম দিয়াছিলেন, যথাক্রমে মৎস্য বা মীন, মণ্ডোদক (ভেকাদি), সরীসৃপ, পক্ষী বা খগা এবং স্তনপা।
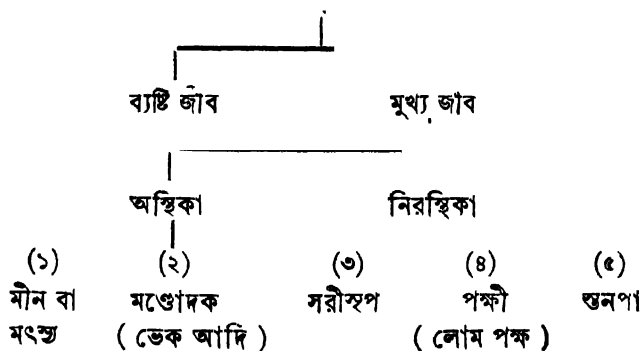
অমরকোষ (৬০০ খ্রীঃ পূঃ) প্রভৃতি বহু পুরাতন অভিধানে এই পাঁচটি শব্দেরই সন্ধান পাওয়া যায়। মৎস্য, মণ্ডোদক (ভেকাদি), সরীসৃপ এবং পক্ষী সংস্কৃত সাহিত্যের সুপরিচিত শব্দ, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু স্তনপা শব্দটি সুপরিচিত নয়, কিন্তু সংস্কৃত অভিধানসমূহে উহার উল্লেখ আছে। স্তনপা অর্থে যাহারা স্তন পান করে তাহাদের বুঝায়। আধুনিক টীকাকারগণ সাধারণ ভাবে স্তনপা অর্থে শিশুদেরই

বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু নিম্নোক্ত শ্লোক অনুযায়ী স্তনপা শব্দটির অর্থ করিলে উহা ইংরাজী Mammalia বা স্তন্যপায়ী জীবদিগকেই বুঝাইবে। স্যাদুত্তানশয়া ডিম্বা স্তনপা চ স্তন—ন্ধয়ী, ইতি অমরকোষ।

ব্যষ্টি জীব বলিতে প্রোটোজোয়া বা এককোষ জীব বুঝায় এবং মুখ্য জীব বলিতে বহুকোষ বা পৌষ্টিক জীব বুঝায়। হিন্দুগণ এই ব্যষ্টি জীবদিগকে (unicellular), জন্তুমাতা বা আমিবা, কেশদা বা ফ্ল্যাজিলেটা, লোমদা বা সিলিয়েটা, সৌরসা—(Sun animacule), উড়ুম্বরা প্রভৃতি বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যষ্টি জীবের উপশ্রেণী সমূহ 'ব্যষ্টি জীব' শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও পরবর্তীকালে প্রাণিদিগের 'আধুনিক শ্রেণী বিভাগ' উপরিউক্তরূপেই করিয়া গিয়াছেন। নিম্নের তালিকাটি এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।
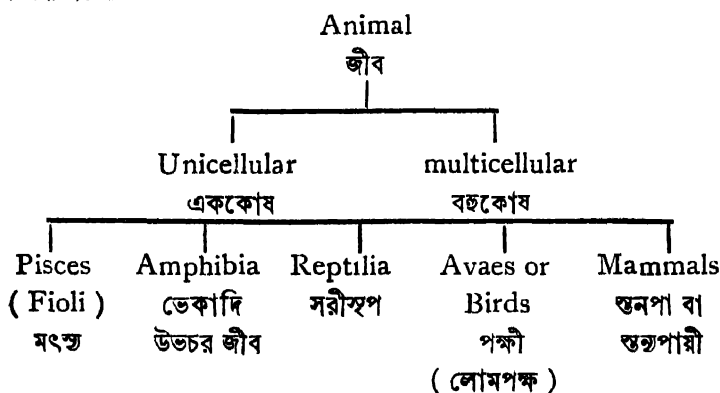
ভেকাদি জীবকে হিন্দুমনীষিগণ মণ্ডোদকরূপে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। [প্রাবৃটকালে ততঃ (মহেশ্চরশ্রক্রাৎ) মণ্ডোদক জাতাঃ ইতি দালভ্যং কল্পস্থান অষ্টম অধ্যায়] উদক শব্দটি অর্থে জল বুঝাইয়া থাকে।

আধুনিক শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী ভেকাদি জীবকে উভচর জীব বা "এ্যমফেবিয়া" জীব বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই জীব জল এবং স্থল—এই উভয় মণ্ডলেই অবস্থান করিতে পারে। মন্দোদক পরিভাষাটি বহুল পরিমাণে এই উভচর শব্দটির অনুরূপ। মণ্ডউদকে যাহারা জাত হয় তাহাদের আমরা মণ্ডোদক জীব বলিতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে "অনূপ" রূপ একটি শব্দও প্রচলিত আছে। এই "অনূপ" শব্দটির অর্থ উভচর জীব। যে সকল জীব জলে এবং স্থলে সমভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হয় তাহারা অনূপ জীব। তবে এই সম্পর্কে বহু পরস্পরবিরোধী মতামতও আছে। যেমন, কোনও কোনও হিন্দু পণ্ডিত এই ভেকাদির সহিত হংস বক প্রভৃতি পক্ষী জীবকেও এই অনূপ জীবের অন্তর্গত এক একটি জীবরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

স্তনপা, পক্ষী, সরীসৃপ, ভেক এবং মৎস্য জীবদিগকে হিন্দু ঋষিগণ বহুবিধ উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে স্তনপা জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। নিম্নের তালিকাটি ভালরূপে অনুধাবন করিলে বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে।
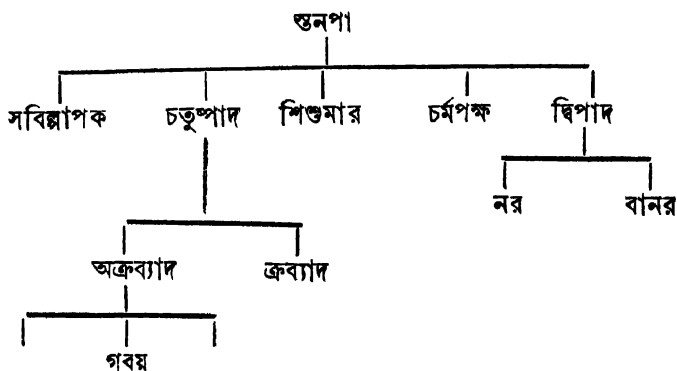
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৈহিক শ্রেণীবাচক শব্দগুলি একত্রিত করিলে উপরিউক্তরূপ একটি বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী দৈহিক শ্রেণী বিভাগের একটি সম্পূর্ণ তালিকা আমরা সহজেই প্রণয়ন করিতে পারি। উপরিউক্ত তালিকাতে প্রদর্শিত শল্লক অর্থে ইংরাজী Rodentia, শিশুমার অর্থে Cetaceaর অন্তর্গত জীব, চর্মপক্ষ অর্থে ইংরাজী Chiroptera, গবয় অর্থে ইংরাজী Ungulata, ক্রব্যাদ অর্থে Carnivora এবং অক্রব্যাদ অর্থে Non-Carnivora. এতদ্ব্যতীত তিমিঙ্গল, তিমি জীব (whales), প্রতিশব্দও আমরা চরক প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। শুণ্ডিন বা হস্তীন (Proboscodia) শব্দও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সুপরিচিত শব্দ। চর্মপক্ষ জীব বলিতে আমরা স্তন্যপায়ী চামচিকা জীব বুঝিয়া থাকি।

স্তনপা (স্তন্যপায়ী) জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার সরীসৃপ জীব সম্বন্ধে বলিব। সরীসৃপ জীব নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী, জৈন মনীষী উমাস্বতি কর্তৃক বিবিধভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।
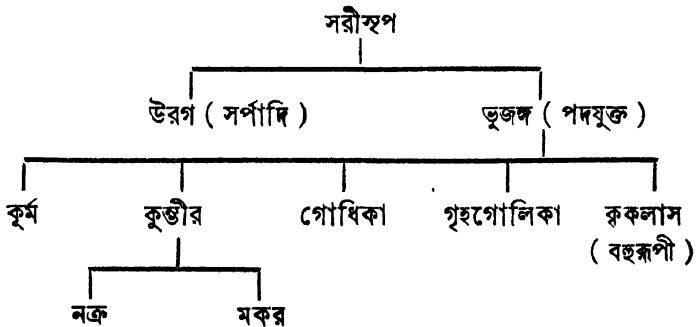
নক্র অর্থে কুম্ভীর জীব। অমরকোষে ইহাকে কুম্ভীর বলা হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তরীয় সংহিতায় (৫।৫।১৩) টীকাকার কুম্ভীরের দুইটি শ্রেণী

করিয়াছেন—যথা ; নক্র এবং মকর। তাঁহার মতে দীর্ঘনাসা (মেছো-কুমীর) কুম্ভীরকে নক্র এবং প্রশস্তনাসা (Man-eater) কুম্ভীরকে মকর বলা হইত। কুম্ভীর সম্বন্ধে বলা হইল,—এইবার কূর্ম সম্বন্ধে বলিব। শতপদী ব্রাহ্মণে বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। উহার শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, 'কশ্যপ' বলিতে তাঁহারা 'স্থলের কচ্ছপ' এবং কূর্ম বলিতে তাঁহারা 'জলের কচ্ছপ' বুঝিতেন (শঃ ব্রাঃ ৬।৫।১।৬, ৭।৫।১।৬, ৭।৫।১।৭, ৭।৫।১।১০, ৭।৫।১।৫)। প্রাচীন হিন্দুদের মতে কতকগুলি কূর্ম বর্তুল oval এবং উহাদের কতকগুলি লম্বা ('বর্তুল দীর্ঘাদিভেদায়—ইতি সুশ্রুত)।

গোধিকা শব্দের দ্বারা আমরা গেহোড়গিল (গো-সাপ) এবং গৃহ-গোলিকা শব্দে আমরা বাড়ীর টিকটিকি বুঝি। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও এই জীবটিকে অনুরূপভাবে House Glaco নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃকলাস শব্দ দ্বারা হিন্দুগণ বহুরূপী জীবকে বুঝিতেন। গোহাড়গিল প্রভৃতি পদযুক্ত সরীসৃপকে ভুজঙ্গ বলা হইত। (চতুষ্পদাঃ কীটাঃ—দলভ্য) ; সুশ্রুত চারিপ্রকার (Cf. দলভ্য উক্ত লাদায়ন, কল্পস্থান—অষ্ট অঃ) কনভ যথা, ত্রিকণ্ঠক, কুনী, হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত ; চারিপ্রকার গলগোলিকা (টিকটিকির একটি যোনি বা species), যথা, গলগোলি, শ্বেতকৃষ্ণা, রক্তরাজীর, রক্তমণ্ডলা, সর্বশ্বেতা এবং সর্ষপিকা ; পঞ্চপ্রকার গাধেরিকা (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার varanusএর ন্যায় টিকটিকি), যথা, প্রতিসূর্য পিঙ্গভাস, বহুবর্ণ, মহাশিরা ও নিরুপম জীবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। পদহীন সর্প আদি সরীসৃপদিগকে বলা হইত উরগ। এই উরগ বা সর্প জীবেরও বহুশ্রেণী ও উপশ্রেণী আছে। মহাবৈদ্য চরক ও সুশ্রুত এবং পুরাণকারগণ এই সর্প সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সর্প-বিদ্যা সম্বন্ধে অলোচনা করিবার সময় আমরা উহার উল্লেখ করিব।

কাঁকড়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—শুক্ল কর্কট ও কৃষ্ণ কর্কট। কোষস্থা জীবের উপবিভাগসমূহ সুশ্রুত এবং চরক উল্লিখিত "শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি—শম্বুক ভল্লুক প্রভৃতয়া কোষস্থা" শ্লোকে আমরা পাইয়া থাকি ইহাদের যথাক্রমে পাঁচটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা,—শঙ্খ বা 'Conchifera' (Lamellirbranchiata) (২) শুক্তিকা বা Pearl mussel (Lamellibranchiata) শম্বুকা (Helix), (৩) ভল্লুক বা কড়ী এবং (৪) শঙ্খনখ। অনুরূপভাবে কৃমিজীবদিগেরও বহুবিধ উপশ্রেণী আছে। আমরা কৃমিজীব শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে উহাদের বিবিধ শ্রেণী এবং উপশ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই কৃমি জীবগণ অন্ত্রদা, উদরবেষ্টা প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত।

[বিছা জীবকে প্রাচীন হিন্দুগণ শতপদী বলিতেন। ঐ একই অর্থে য়ুরোপীয়রা centiped শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই জীবের দেহে বহু পদানুরূপ অঙ্গ থাকায় উহাদের ঐরূপ নাম দেওয়া হইয়াছিল।]

সুশ্রুত নাগার্জুনের বিবরণে (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) আমরা ছয় প্রকার পিপীলিকা,—যথা স্থূলশীর্ষা, সংবাহিকা, ব্রহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা; ছয়প্রকার মক্ষিকা বা মাছি—যথা, কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা মধুলিকা, কষাটি ও স্থলিকা; পাঁচ প্রকার মশক—একপ্রকার জলজ বা Marine ও একপ্রকার পার্বত্য—যথা, সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণ ও পার্ত্তীয়; আট প্রকার শতপদী বিছা—যথা, পরুষা কৃষ্ণা, চিত্রা, কপিলিকা, পীতিকা, রক্তা, শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভা; ত্রিশ প্রকার কাঁকড়া বিছা, ষোল প্রকার মাকড়সা বা লুতার উল্লেখ দেখিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত এক প্রকার তৈলকীট (খদ্যোত তৈলকীট cf. রজনীঘণ্ট) জীবেরও উল্লেখ দেখা যায়। অধিকন্তু, তাঁহারা লুতা বা মাকড়সা

এবং কাঁকড়া বিছা বা বৃশ্চিক সম্বন্ধে * বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। যথা—

(১) লূতা ষোল প্রকার—তন্মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধ্য আটপ্রকার যথা, ত্রিমণ্ডলা শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কর্ষণা। অসাধ্য আট প্রকার যথা, সৌবনিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এনপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালগুণা।

(২) বৃশ্চিক জীবের মধ্যে মন্দবিষ বৃশ্চিক বারোটি, মধ্যবিষ তিনটি এবং তীক্ষ্ণবিষ পনেরোটি। সর্বসমেত বৃশ্চিক সংখ্যা ত্রিশটি। গয়দাসাচার্য নামক বৃশ্চিকবিষবেত্তা বলেন যে, প্রাণহর বৃশ্চিক তের প্রকার, মধ্যবীর্য তিন প্রকার এবং মন্দবীর্য এগারো প্রকার। তাঁহার মতে বৃশ্চিকের সংখ্যা সর্বসমেত সাতাশ প্রকার। মন্দবিষ বৃশ্চিকের মধ্যে কোনটি কৃষ্ণ, কোনটি শ্যামবর্ণ, কেহ বিচিত্রবর্ণ, কেহ পাণ্ডুবর্ণ, কেহ গোমূত্রতুল্য বর্ণ, কেহ কর্কশ, কেহ ময়ূরপুচ্ছাভ, কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ রোমশ, কেহ হরিদ্বর্ণ—কিন্তু সকলেরই উদর শ্বেতবর্ণ। তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিকের সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহারা কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কাহারও উদর নীল এবং কাহারও উদর রক্তবর্ণ। এই সকল প্রাণচৌর বৃশ্চিকের মধ্যে কাহারও দেহ একপর্ব (পাব বা গাঁইট) কাহার শরীর পর্বহীন, কাহারও বা দুইটি পর্ব, কাহারও বা বহুপর্ব। অথর্ববেদেও এই বৃশ্চিক সম্বন্ধে একটি নাতিবৃহৎ বিখ্যাত শ্লোক আছে। বৈদিক যুগেও এই বৃশ্চিক সম্বন্ধে ঋষিগণ বিবিধ আলোচনা করিতেন।

* বৃশ্চিকা এবং নন্দবর্ত্য বাক্য দুইটি যথাক্রমে কাঁক্ড়া বিছা ও মাকড়সার পরিভাষা রূপে হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন।—ইতি দলভ্য

কাঁকড়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—শুক্ল কর্কট ও কৃষ্ণ কর্কট। কোষস্থা জীবের উপবিভাগসমূহ সুশ্রুত এবং চরক উল্লিখিত "শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি—শম্বুক ভল্লুক প্রভৃতয়া কোষস্থা" শ্লোকে আমরা পাইয়া থাকি ইহাদের যথাক্রমে পাঁচটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা,—শঙ্খ বা 'Conchifera' (Lamellirbranchiata) (২) শুক্তিকা বা Pearl mussel (Lamellibranchiata) শম্বুকা (Helix), (৩) ভল্লুক বা কড়ী এবং (৪) শঙ্খনখ। অনুরূপভাবে কৃমিজীবদিগেরও বহুবিধ উপশ্রেণী আছে। আমরা কৃমিজীব শীর্ষক পৃথক প্রবন্ধে উহাদের বিবিধ শ্রেণী এবং উপশ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই কৃমি জীবগণ অন্ত্রদা, উদরবেষ্টা প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত।

[বিছা জীবকে প্রাচীন হিন্দুগণ শতপদী বলিতেন। ঐ একই অর্থে য়ুরোপীয়রা centiped শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই জীবের দেহে বহু পদানুরূপ অঙ্গ থাকায় উহাদের ঐরূপ নাম দেওয়া হইয়াছিল।]

সুশ্রুত নাগার্জুনের বিবরণে (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) আমরা ছয় প্রকার পিপীলিকা,—যথা স্থূলশীর্ষা, সংবাহিকা, ব্রহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা; ছয়প্রকার মক্ষিকা বা মাছি—যথা, কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা মধুলিকা, কষাটি ও স্থলিকা; পাঁচ প্রকার মশক—একপ্রকার জলজ বা Marine ও একপ্রকার পার্বত্য—যথা, সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণ ও পার্ততীয়; আট প্রকার শতপদী বিছা—যথা, পরুষা কৃষ্ণা, চিত্রা, কপিলিকা, পীতিকা, রক্তা, শ্বেতা ও অগ্নিপ্রভা; ত্রিশ প্রকার কাঁকড়া বিছা, ষোল প্রকার মাকড়সা বা লূতার উল্লেখ দেখিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত এক প্রকার তৈলকীট (খদ্যোত তৈলকীট cf. রাজনীঘণ্ট) জীবেরও উল্লেখ দেখা যায়। অধিকন্তু, তাঁহারা লূতা বা মাকড়সা

এবং কাঁকড়া বিছা বা বৃশ্চিক সম্বন্ধে * বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। যথা—

(১) লুতা ষোল প্রকার—তন্মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধ্য আটপ্রকার যথা, ত্রিমণ্ডলা শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কর্ষণা। অসাধ্য আট প্রকার যথা, সৌবনিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এনপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালগুণা।

(২) বৃশ্চিক জীবের মধ্যে মন্দবিষ বৃশ্চিক বারোটি, মধ্যবিষ তিনটি এবং তীক্ষ্ণবিষ পনেরোটি। সর্বসমেত বৃশ্চিক সংখ্যা ত্রিশটি। গয়দাসাচার্য নামক বৃশ্চিকবিষবেত্তা বলেন যে, প্রাণহর বৃশ্চিক তের প্রকার, মধ্যবীর্য তিন প্রকার এবং মন্দবীর্য এগারো প্রকার। তাঁহার মতে বৃশ্চিকের সংখ্যা সর্বসমেত সাতাশ প্রকার। মন্দবিষ বৃশ্চিকের মধ্যে কোনটি কৃষ্ণ, কোনটি শ্যামবর্ণ, কেহ বিচিত্রবর্ণ, কেহ পাণ্ডুবর্ণ, কেহ গোমূত্রতুল্য বর্ণ, কেহ কর্কশ, কেহ ময়ূরপুচ্ছাভ, কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ রোমশ, কেহ হরিদ্‌বর্ণ—কিন্তু সকলেরই উদর শ্বেতবর্ণ। তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিকের সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহারা কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কাহারও উদর নীল এবং কাহারও উদর রক্তবর্ণ। এই সকল প্রাণচৌর বৃশ্চিকের মধ্যে কাহারও দেহ একপর্ব (পাব বা গাঁইট) কাহার শরীর পর্বহীন, কাহারও বা দুইটি পর্ব, কাহারও বা বহুপর্ব। অথর্ববেদেও এই বৃশ্চিক সম্বন্ধে একটি নাতিবৃহৎ বিখ্যাত শ্লোক আছে। বৈদিক যুগেও এই বৃশ্চিক সম্বন্ধে ঋষিগণ বিবিধ আলোচনা করিতেন।

---

* বৃশ্চিকা এবং নন্দবর্ত্য বাক্য দুইটি যথাক্রমে কাঁক্‌ড়া বিছা ও মাকড়সার পরিভাষা রূপে হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন।—ইতি দলভ্য

স্বভাবাদি বহু আয়াসে ধারাবাহিকরূপে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য চিকিৎসকগণ দ্বারাই এই সকল জ্ঞান তৎকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উপরোক্তরূপ বিবিধ পর্যালোচনার উপর নির্ভর করিয়া জীবদিগের এক প্রকার শ্রেণী বিভাগও হিন্দুগণ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। স্তন্যপায়ী পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যাদিব বাসভূমি ও স্বভাব পরিলক্ষ্য করিয়া ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল। বৈদ্যপ্রধান চরক ও সুশ্রুত ইহার স্রষ্টা। প্রধানতঃ জীব-মাংসের খাদ্যগুণ ইহাতে প্রচারিত হইয়াছে। মহর্ষি চরক এই উদ্দেশ্যে জীবদিগকে আটটা প্রধান বিভাগে (অষ্টবিধা যোনিস্তেষাম) বিভক্ত করেন। যথা :—

(১) প্রসহ : ক্রব্যাদ বা হিংস্র এবং অক্রব্যাদ (চক্রপাণি) চতুষ্পদ ও পক্ষীজীব, যাহারা বেগে শিকারের উপরে পতিত হয়, তাহাদের বলা হয় প্রসহজীব।

(২) অনূপ : জলাভূমি ও বিল প্রভৃতিতে এবং নদী-সৈকতে যে-সকল জীব বিচরণ করে তাহাদের বলা হয় অনূপ জীব।

(৩) ভূশয় বা বিলেশয় : যে সকল জীব ভূমির তলে ও গর্তে বসবাস কবে তাহাদের বলা হয় ভূশয় বা বিলেশয় জীব।

(৪) বারিশয় : যে সকল জীব নদী, হ্রদ প্রভৃতি মিষ্টিজলে ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বসবাস করে—তাহাদের বলা হয় বারিশয় জীব।

(৫) জলচব : জলচর জীব বলিতে উভচর জীবদিগকে বুঝানো হইত।

(৬) জাঙ্গল : যে সকল জীব (হরিণ প্রভৃতি) উচ্চজঙ্গল পূর্ণ জমিতে বাস করিত,—তাহাদের বলা হইত জাঙ্গল-জীব।

(৭) বিশিকর : যে-সকল পক্ষী-জীব খাদ্য আহরণের সময় তাহা ছড়াইতে থাকে, তাহাদের বলা হইত বিশিকর পক্ষী।

(৮) প্রতুদ: যে সকল পক্ষী-জীব খাদ্য ঠুক্‌রাইয়া ঠুক্‌রাইয়া আহরণ করে, তাহাদের বলা হইত প্রতুদ জীব।

মহাবৈদ্য সুশ্রুতও অনুরূপভাবে খাদ্যগুণ সম্পর্কে অস্থিক জীবদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে জীবদিগকে প্রথমে দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন, যথা: (১) অনুপ অর্থাৎ যাহারা জলে ও স্থলে বিচরণ-শীল। (২) জাঙ্গল, অর্থাৎ যাহারা শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে বসবাস করে। ইহার পর তিনি অনুপ জীবকে আটটি এবং জঙ্গল জীবকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন; যথা—

(ক) জাঙ্গল: (১) জঙ্ঘাল (২) বিশিকির (৩) প্রতুদ (৪) গুহাশয় (৫) প্রসহ (৬) প্রাণমৃগ (৭) বিলেশয় (৮) গ্রাম্য।

(খ) অনুপ: (১) কূলচর (২) প্লব (৩) কোশস্থ (৪) পাদিনা (৫) মৎস্য।

মহর্ষি সুশ্রুত মৎস্যকে তাহাদের বাসস্থান অনুযায়ী নদীর (মিষ্টি জলের) এবং সমুদ্রের (লবণাক্ত জলের) এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সমুদ্রের মৎস্যের মধ্যে তিনি ভুল করিয়া তিমি ও তিমিঙ্গল (Whale) জীবকেও ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মকর বা shark জীবকেও তিনি সমুদ্রের মৎস্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অবশ্য কোশস্থ জীবকে মৎস্য হইতে ভিন্ন জীবরূপে ধরা হইয়াছে এবং ইহাকে শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শমুক, ভল্লুক প্রভৃতি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দলভ্য ইহার সহিত আরও দুইটি উপবিভাগ যুক্ত করিয়াছেন, যথা ভাদিকা ও জলশুক্তি। পাদিনা বলিতে সুশ্রুত জল-কূর্ম, কুম্ভীর, কর্কট, শিশুমার জীবকেই বুঝিয়াছেন। জলে সঞ্চরণশীল হংস, বক প্রভৃতি 'প্লব' জীবকেও সুশ্রুত অনুপজীবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। হস্তি, গণ্ডার, গবয় (Bos gavœus), মহিষ, হরিণ

স্বভাবাদি বহু আয়াসে ধারাবাহিকরূপে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য চিকিৎসকগণ দ্বারাই এই সকল জ্ঞান তৎকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উপরোক্তরূপ বিবিধ পর্যালোচনার উপর নির্ভর করিয়া জীবদিগের এক প্রকার শ্রেণী বিভাগও হিন্দুগণ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। স্তন্যপায়ী পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যাদির বাসভূমি ও স্বভাব পরিলক্ষ্য করিয়া ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল। বৈদ্যপ্রধান চরক ও সুশ্রুত ইহার স্রষ্টা। প্রধানতঃ জীব-মাংসের খাদ্যগুণ ইহাতে প্রচারিত হইয়াছে। মহর্ষি চরক এই উদ্দেশ্যে জীবদিগকে আটটা প্রধান বিভাগে (অষ্টবিধা যোনিস্তেষাম) বিভক্ত করেন। যথা :—

(১) প্রসহ : ক্রব্যাদ বা হিংস্র এবং অক্রব্যাদ (চক্রপাণি) চতুষ্পদ ও পক্ষীজীব, যাহারা বেগে শিকারের উপরে পতিত হয়, তাহাদের বলা হয় প্রসহজীব।

(২) অনুপ : জলাভূমি ও বিল প্রভৃতিতে এবং নদী-সৈকতে যে-সকল জীব বিচরণ করে তাহাদের বলা হয় অনুপ জীব।

(৩) ভূশয় বা বিলেশয় : যে সকল জীব ভূমির তলে ও গর্তে বসবাস করে তাহাদের বলা হয় ভূশয় বা বিলেশয় জীব।

(৪) বারিশয় : যে সকল জীব নদী, হ্রদ প্রভৃতি মিষ্টিজলে ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বসবাস করে—তাহাদের বলা হয় বারিশয় জীব।

(৫) জলচর : জলচর জীব বলিতে উভচর জীবদিগকে বুঝানো হইত।

(৬) জাঙ্গল : যে সকল জীব (হরিণ প্রভৃতি) উচ্চজঙ্গল পূর্ণ জমিতে বাস করিত,—তাহাদের বলা হইত জাঙ্গল-জীব।

(৭) বিশিকর : যে-সকল পক্ষী-জীব খাদ্য আহরণের সময় তাহা ছড়াইতে থাকে, তাহাদের বলা হইত বিশিকর পক্ষী।

(৮) প্রতুদ: যে সকল পক্ষী-জীব খাদ্য ঠুক্‌রাইয়া ঠুক্‌রাইয়া আহরণ করে, তাহাদের বলা হইত প্রতুদ জীব।

মহাবৈদ্য সুশ্রুতও অনুরূপভাবে খাদ্যগুণ সম্পর্কে অস্থিক জীবদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে জীবদিগকে প্রথমে দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন, যথা: (১) অনুপ অর্থাৎ যাহারা জলে ও স্থলে বিচরণ-শীল। (২) জাঙ্গল, অর্থাৎ যাহারা শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে বসবাস করে। ইহার পর তিনি অনুপ জীবকে আটটি এবং জঙ্গল জীবকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন; যথা—

(ক) জাঙ্গল: (১) জঙ্ঘাল (২) বিশিকির (৩) প্রতুদ (৪) গুহাশয় (৫) প্রসহ (৬) প্রাণমৃগ (৭) বিলেশয় (৮) গ্রাম্য।

(খ) অনুপ: (১) কূলচর (২) প্লব (৩) কোশস্থ (৪) পাদিনা (৫) মৎস্য।

মহর্ষি সুশ্রুত মৎস্যকে তাহাদের বাসস্থান অনুযায়ী নদীর (মিষ্টি জলের) এবং সমুদ্রের (লবণাক্ত জলের) এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সমুদ্রের মৎস্যের মধ্যে তিনি ভুল করিয়া তিমি ও তিমিঙ্গল (Whale) জীবকেও ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মকর বা shark জীবকেও তিনি সমুদ্রের মৎস্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে অবশ্য কোশস্থ জীবকে মৎস্য হইতে ভিন্ন জীবরূপে ধরা হইয়াছে এবং ইহাকে শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শমুক, ভল্লুক প্রভৃতি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দলভ্য ইহার সহিত আরও দুইটি উপবিভাগ যুক্ত করিয়াছেন, যথা ভাদিকা ও জলশুক্তি। পাদিনা বলিতে সুশ্রুত জল-কূর্ম, কুম্ভীর, কর্কট, শিশুমার জীবকেই বুঝিয়াছেন। জলে সঞ্চরণশীল হংস, বক প্রভৃতি 'প্লব' জীবকেও সুশ্রুত অনুপজীবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। হস্তি, গণ্ডার, গবয় (Bos gavœus), মহিষ, হরিণ

প্রভৃতি জীব যাহারা নদী ও তড়াগ সৈকতেও বিচরণ করে তাহাদের বলা হইত কূলচর। সুশ্রুতের মতে ইহারাও একপ্রকার অনূপ জীব।

অনূপ জীব ও উহার উপবিভাগ সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার জাঙ্গল-জীব ও উহার উপবিভাগ সম্বন্ধে বলিব।

জাঙ্গলজীবদিগের উপ-বিভাগ চরক কর্তৃক তিন প্রকার পক্ষী এবং পাঁচ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব লইয়া কল্পিত হইয়াছে। চিল, বাজ, শকুনী প্রভৃতি শিকারী পক্ষীদের বলা হইয়াছে প্রসহ এবং যে সকল পক্ষী ঠুকরাইয়া ছড়াইয়া আহার সংগ্রহ করে তাহাদের বলা হইয়াছে বিশিকির এবং যে সকল পক্ষী আহার সংগ্রহার্থে চঞ্চু দ্বারা ফল পোকা প্রভৃতি বিদীর্ণ করে তাহাদের প্রতুদ বলা হইয়াছে।

জঙ্গল বিভাগের অপরাপর উপবিভাগ স্তন্যপায়ী এবং কতিপয় সরীসৃপ জীব লইয়া কল্পিত হইয়াছে। যথা, বিলেশয়, প্রাণমৃগ (বানরাদি বৃক্ষারোহী), জঙ্ঘাল (হরিণাদি দীর্ঘপদী), গ্রাম্য (গৃহপালিত অক্রব্যাদ জীব), গুহাশায় (গুহাবাসী ক্রব্যাদ জীব), বিলেশয় (শশকাদি গর্তবাসী)।

সুশ্রুত এবং চরক বিশ্বাস করিতেন যে, জীবদিগের মাংসের খাদ্যগুণ উহাদের বাসস্থান, খাদ্যাদি এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহারা উপরোক্তরূপ নূতন উপায়ে জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুশ্রুত (২০০ খ্রীঃ) এন বা কৃষ্ণবর্ণের হরিণ, গৌরবর্ণের হরিণ, নীলাণ্ডু রুরু প্রভৃতি খাদ্য জীব, চতুর্গতি চতুরঙ্গ প্রভৃতি কুরঙ্গ জীব, অধোনিষ্ক্রান্ত দন্ত কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি করাল জীব, দলবদ্ধভাবে বিচরণশীল কৃতমান নামক মৃগ, শরভ, চতুর্দন্ত শ্বদংষ্ট্র, বিন্দু চিত্রিত চিতল প্রভৃতি পৃষত জীব, চারুষ্ক নামক চারুদেহ স্বল্পাকৃতি মৃগ, মৃগ-মাতৃকা নামক স্বল্পকার স্থূলোদর মৃগাদি

জীবকে জঙ্ঘাল জীব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল হরিণ বংশের সকলে দীর্ঘ জঙ্ঘাবিশিষ্ট। সুশ্রুতের মতে লাব, তিত্তিরি (কৃষ্ণ তিত্তির), কপিঞ্জল (গৌর তিত্তির), বর্তির (কপিঞ্জল সদৃশ, ইহা কপিঞ্জল হইতে ছোট, বর্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ বড় বর্ঘরা নামে খ্যাত), বর্তিকা ও বর্তক (ইহারা বর্তির ভেদ), নপ্তৃকা (ঘুত্তুরুক পক্ষী, পাণ্ডুরোদর ঘুঘু), বাত্তিক (বাবুই), চকোর (রক্তাক্ষ, বিষমূচক), কলবিঙ্ক (কালচটক, ভৃঙ্গরাজ), ময়ূর, ক্রকর (কয়রা), উপচক্র (ক্রকর ভেদ), কুক্কুট (বন্য ও গ্রাম্য), সারঙ্গ (চাতক), শতপত্র (কাঠঠোকরা), কুতিত্তিরি (তিত্তিরিভেদে), কুরুবাহুক (কুরুস্থরক) ও যবলক (যবগুড্ডুক) প্রভৃতি পক্ষিগণ চঞ্চু ও চরণদ্বয় দ্বারা বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ব্যাহলা বিষ্কির নামে অভিহিত। সুশ্রুতের মতে কপোত (পায়রা বিশেষ, বনবাসী কানকপোত), পারাবত (পায়রা), ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ), পরভৃত (কোকিল), কোষাষ্টিক (কোপঙ্গ), কুলিঙ্গ (বনচটক, ফিঙ্গা), গৃহকুলিঙ্গ (চটকপক্ষী), গোক্ষড় (সারসপক্ষী), ডিণ্ডিমানক (ডিম-ডিমবৎ উৎকট ধ্বনিকারক পক্ষীবিশেষ), শতপত (রাজশুক), মাতৃনিন্দক (পুত্ররঞ্জক), ভেদাশী (পক্ষীবিশেষ), শুক (টিয়াপাখী), সারিকা (সালিক বা ময়না), বল্গুলি (গহ্বিলা, বুলবুল), গিরিশাল (পার্বত্য বর্তিকা), হ্বাল দূষক (রক্তাপুচ্ছাধোভাগ পক্ষীবিশেষ), সুগৃহী (পীতমস্তক পক্ষী বিশেষ), খঞ্জরীটক (খঞ্জন পক্ষী), হারিত (হারিয়াল পক্ষী) ও দাত্যূহ (ভোকপাখী) সকল ঠোকরাইয়া ভক্ষণ করে বলিয়া তাহাদের প্রতুদ বলা হয়। সুশ্রুতের মতে কাক, কঙ্ক (দীর্ঘচঞ্চু বৃহদাকার পক্ষীবিশেষ, হাড়গিলে), কুবর (মৎস্যধারী পক্ষী), চাষ (ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ পক্ষী), ভাষ (গাকুলচারী শ্বেতশিখাবান পক্ষী), শশঘাতী (শিকারী পক্ষী) উলূক বা পেচক, চিল্লী বা চিল, শ্যেন (শিকারী বাজপাক্ষী) ও গৃধ্র বা শকুনি

প্রভৃতি জীব যাহারা নদী ও তড়াগ সৈকতেও বিচরণ করে তাহাদের বলা হইত কূলচর। সুশ্রুতের মতে ইহারাও একপ্রকার অনুপ জীব।

অনুপ জীব ও উহার উপবিভাগ সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার জাঙ্গল-জীব ও উহার উপবিভাগ সম্বন্ধে বলিব।

জাঙ্গলজীবদিগের উপ-বিভাগ চরক কর্তৃক তিন প্রকার পক্ষী এবং পাঁচ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব লইয়া কল্পিত হইয়াছে। চিল, বাজ, শকুনী প্রভৃতি শিকারী পক্ষীদের বলা হইয়াছে প্রসহ এবং যে সকল পক্ষী ঠুকরাইয়া ছড়াইয়া আহার সংগ্রহ করে তাহাদের বলা হইয়াছে বিশিকির এবং যে সকল পক্ষী আহার সংগ্রহার্থে চঞ্চু দ্বারা ফল পোকা প্রভৃতি বিদীর্ণ করে তাহাদের প্রতুদ বলা হইয়াছে।

জঙ্গল বিভাগের অপরাপর উপবিভাগ স্তন্যপায়ী এবং কতিপয় সরীসৃপ জীব লইয়া কল্পিত হইয়াছে। যথা, বিলেশয়, প্রাণমৃগ (বানরাদি বৃক্ষারোহী), জঙ্ঘাল (হরিণাদি দীর্ঘপদী), গ্রাম্য (গৃহপালিত অক্রব্যাদ জীব) গুহাশায় (গুহাবাসী ক্রব্যাদ জীব), বিলেশয় (শশকাদি গর্তবাসী)।

সুশ্রুত এবং চরক বিশ্বাস করিতেন যে, জীবদিগের মাংসের খাদ্যগুণ উহাদের বাসস্থান, খাদ্যাদি এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহারা উপরোক্তরূপ নূতন উপায়ে জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুশ্রুত (২০০ খ্রীঃ) এন বা কৃষ্ণবর্ণের হরিণ, গৌরবর্ণের হরিণ, নীলাণ্ডু রুরু প্রভৃতি খাদ্য জীব, চতুর্গতি চতুরঙ্গ প্রভৃতি কুরঙ্গ জীব, অধোনিক্রান্ত দন্ত কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি করাল জীব, দলবদ্ধভাবে বিচরণশীল কৃতমান নামক মৃগ, শরভ, চতুর্দন্ত স্বদৃষ্ট, বিন্দু চিত্রিত চিতল প্রভৃতি পৃষত জীব, চারুষ্ক নামক চারুদেহ স্বল্পাকৃতি মৃগ, মৃগ-মাতৃকা নামক স্বল্পকার স্থূলোদর মৃগাদি

জীবকে জঙ্ঘাল জীব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল হরিণ বংশের সকলে দীর্ঘ জঙ্ঘাবিশিষ্ট। সুশ্রুতের মতে লাব, তিত্তিরি (কৃষ্ণ তিত্তির), কপিঞ্জল (গৌর তিত্তির), বর্তির (কপিঞ্জল সদৃশ, ইহা কপিঞ্জল হইতে ছোট, বর্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ বড় ঘর্ঘরা নামে খ্যাত), বর্তিকা ও বর্তক (ইহারা বর্তির ভেদ), নপ্তকা (ঘুড়ুরুক পক্ষী, পাণ্ডুরোদর ঘুঘু), বাত্তিক (বাবুই), চকোর (রক্তাক্ষ, বিষমূচক), কলবিঙ (কালচটক, ভৃঙ্গরাজ), ময়ূর, ক্রকচর (কয়রা), উপচক্র (ক্রকচর ভেদ), কুক্কুট (বন্য ও গ্রাম্য), সারঙ্গ (চাতক), শতপত্র (কাঠঠোকরা), কুতিত্তিরি (তিত্তিরিভেদে), কুরুবাহুক (কুরুস্থরক) ও যবলক (যবগুড়ুক) প্রভৃতি পক্ষিগণ চঞ্চু ও চরণদ্বয় দ্বারা বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ত্র্যাহলা বিষ্কির নামে অভিহিত। সুশ্রুতের মতে কপোত (পায়রা বিশেষ, বনবাসী কানকপোত), পারাবত (পায়রা), ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ), পরভৃত (কোকিল), কোষাষ্টিক (কোপঙ্গ), কুলিঙ্গ (বনচটক, ফিঙ্গা), গৃহকুলিঙ্গ (চটকপক্ষী), গোক্ষড় (সারসপক্ষী), ডিণ্ডিমানক (ডিম-ডিমবৎ উৎকট ধ্বনিকারক পক্ষীবিশেষ), শতপত (রাজশুক), মাতৃনিন্দক (পুত্ররঞ্জক), ভেদাশী (পক্ষীবিশেষ), শুক (টিয়াপাখী), সারিকা (সালিক বা ময়না), বলগুলি (গন্থবিলা, বুলবুল), গিরিশাল (পার্বত্য বর্তিকা), হবাল দূষক (রক্তাপুচ্ছাধোভাগ পক্ষীবিশেষ), সুগৃহী (পীতমস্তক পক্ষী বিশেষ), খঞ্জরীটক (খঞ্জন পক্ষী), হারিত (হারিয়াল পক্ষী) ও দাত্যূহ (ভোকপাখী) সকল ঠোকরাইয়া ভক্ষণ করে বলিয়া তাহাদের প্রতুদ বলা হয়। সুশ্রুতের মতে কাক, কঙ্ক (দীর্ঘচঞ্চু বৃহদাকার পক্ষীবিশেষ, হাড়গিলে), কুবর (মৎস্যধারী পক্ষী), চাষ (ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ পক্ষী), ভাষ (গাকুলচারী শ্বেতশিখাবান পক্ষী), শশঘাতী (শিকারী পক্ষী) উলুক বা পেচক, চিল্লী বা চিল, শ্যেন (শিকারী বাজপাক্ষী) ও গৃধ্র বা শকুনি

প্রভৃতি পক্ষী সহসা আগ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাদের বলা হয় প্রসহজীব। সুশ্রুতের মতে সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (কুকুরাকৃতি ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, নেকড়েবাঘ), তরক্ষু (জরসনামা ব্যাঘ্র), ঋক্ষ বা ভল্লুক, দ্বীপী বা চিতাবাঘ, মার্জার বা বনবিড়াল, শৃগাল (শৃগালাকৃতি মৃগভক্ষ্য ব্যাঘ্র বিশেষ) প্রভৃতি গুহাশয় অর্থাৎ ইহারা গুহায় বাস করে।

সুশ্রুতের মতে মদগু (কেহ বলেন মদগুমূষিক, কেহ বলেন মলয়সাঁপ), মূষিক (বৃক্ষমূষিক), বৃক্ষসায়িকা (বৃক্ষমর্কটিকা, গিলি) অবকুশ (গোলাঙ্গুল বানর বিশেষ) পুতিবাস (বৃক্ষবিড়াল, সুগন্ধিবৃষণ খটাশী বা গন্ধগোকুলা) ও বানর প্রভৃতি জন্তুগণ বৃক্ষারোহী বলিয়া উহাদের পর্ণমৃগ বলা হয়। সুশ্রুতের মতে শ্বাবিৎ বা শজারু শল্যক (বৃক্ষনকুল, বৃহদ্ বৃহৎ গোধালুকর জন্তুবিশেষ), গোধালু বা গোসাপ, শশ বা খরগোস, বৃষদংশ (এক জাতীয় বিড়াল), লোপাক বা খেঁকশিয়াল, লোমশকর্ণ (মহাবিড়ালসম ব্যাঘ্রাকার জন্তু), কদলী (ইহা পৌণ্ড দেশে -কদলীহস্ত নামে প্রসিদ্ধ), মৃগপ্রিয়ক বা বোড়াসাপ, অজগর বা মহাসর্প, মূষিক, নকুল ও মহাবভ্রু (নকুল ভেদে) প্রভৃতি জন্তুগণ বিলে অর্থাৎ গর্তে বাস করে বলিয়া ইহাদের বিলেশয় বলা হয়। সুশ্রুতের মতে গজ, গবয় (গোসদৃশ জীব), মহিষ, রুরু (বিকট-বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগ, ইহারা শরৎকালে শৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া রোদন করে বলিয়া প্রাচীন ভারতীয়গণ ইহাদের রুরু বলিতেন), চমর (গোসদৃশ মৃগ), সৃমর (মহাশূকর, কেহ বলেন— বৃহদশ্বাকৃতি চমরাত্মক হরিত ও লোহিত বর্ণ মৃগ বিশেষ), রোহিত (লালবর্ণের মৃগ বিশেষ), বরাহ বা শূকর, খড়্গা বা গণ্ডার, গোকর্ণ (গোসদৃশ কর্ণ, গোবর্ণ), কালপুচ্ছক (চলাই কৃষ্ণপুচ্ছক জন্তুবিশেষ), ঔদ্র (জল-বিড়াল, ভোঁদড়, উদবিড়াল), ন্যঙ্কু (বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগ) বরাহশৃঙ্গা ও অরণ্যগবয় বা বনগরু জলাশয়ের কূলে বিচরণ করে বলিয়া

ইহাদের কূলচর বলা হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে হংস সারস, ক্রৌঞ্চ বা কোঁকবক, চক্রবাক (দণ্ডচর-নিশাবিয়োগী, অর্থাৎ চকাচকি), কাদম্ব (কলহংস, অতি ধূসর পক্ষ), কারণ্ডব বা শুক্লবর্ণের হংস জীবঞ্জীবক (পাণ্ডুর পক্ষ বকবিশেষ), বক, বলাকা (বিবিধ বক), পুণ্ডরীক (নলিন নয়ন), প্লব (সগর নামা অতিবৃহৎ পক্ষী), শবরীমুখ (থাদিবর্ণ পক্ষীবিশেষ) নন্দী মুখ, মদগু (জলকাক), উৎক্রোশ (মৎস্যাশী পক্ষীবিশেষ), কাচাক্ষ (বহুড়ী পক্ষী), মল্লীকাক্ষ শুক্লাক্ষ (শুক্লনয়ন পক্ষীবিশেষ), পুষ্কর শায়িকা (পদ্মপত্র শায়িকা), কোণালক (শ্যামপৃষ্ঠ শ্বেতোদর, পানীয় বর্তিকা নামা পক্ষী), অম্বুকুক্কুটিকা বা জলকুক্কুটি, মেঘরাব বা কাতর্ক ও শ্বেতচরণ (জ্যেষ্ঠ বলাকা নামা শুক্লপক্ষ পক্ষীবিশেষ) প্রভৃতি পক্ষী দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। এইজন্য ইহাদের প্লব বলা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত জীবজন্তুর স্বভাবাদি ব্যতীত সুশ্রুত মৎস্যাদির আহার, বিহার ও আকৃতি সম্বন্ধেও বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (শ্লোঃ ১১৪-১২৭)। তাঁহার মতে রোহিত (রুই), পাঠিন (বোয়াল), পাটলা ও রাজীব, বর্মি বাইন, গোমৎস্য বা গুঞ্জার বা বাহাংশ, মুরল, সহস্রদংষ্ট্র বা মহাপাঠিন প্রভৃতি মৎস্য নদীতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে রোহিত মৎস্য শষ্প-শৈবাল ভোজী এবং পাঠিন মৎস্য নিদ্রালু ও মাংসভোজী। সুশ্রুতের মতে মহাহ্রদে জাত মৎস্যসকল বলবান্ ও অল্পজলে জাত মৎস্যগণ দুর্বল হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলিয়া গিয়াছেন যে, কুলীশ পাক মৎস্য, নিরালক, নন্দিবারলক, গর্গর-চন্দক বা চাঁদা, মমামীন প্রভৃতি মৎস্য সকল সমুদ্রে বাস করে। ইহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, সামুদ্র মৎস্যগণ সকলেই প্রায় আমিষ বা মাংস-আহারী হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সুশ্রুত আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, নাদেয় বা নদীর মৎস্যসকল পুচ্ছ ও

মুখ চালনা দ্বারা সঞ্চরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেহ গুরু ; এই সম্পর্কে তাঁহার মতে সরোবর ও তড়াগ জাত মৎস্যগণের মস্তকবিশেষ লঘু হইলেও উহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ গুরু হয়। বক্ষভরে সঞ্চরণ হেতু উহাদের পূর্ব অঙ্গ লঘু হইয়া থাকে। কিন্তু গিরিপ্রস্রবণ জাত মৎস্যসকল অল্প স্থানে বাস করে বলিয়া ব্যায়ামের অভাবে উহাদের শিরদেশের কিয়দংশ বাদে অবশিষ্টাংশ গুরু।

এই মৎস্য ব্যতীত পক্ষীকুলের দেহাবয়ব সম্পর্কেও সুশ্রুত বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পক্ষিগণের বক্ষস্থল ও গ্রীবাবিশেষ গুরু। পক্ষদ্বয়ের উৎক্ষেপ হেতু পক্ষিগণের মধ্যভাগ সম, অর্থাৎ নাতিগুরু ও নাতিলঘু। এই পক্ষিগণের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন প্রকার আহারে অভ্যস্ত। ইহাদের কেহ কেহ মাংসাশী, কেহ মৎস্যভোজী, কেহ বা ফলমূল আহারী হইয়া থাকে।

সুশ্রুতপাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, জীবদিগের মাংস রোগীর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার পূর্বে ঐ সকল পশুপক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতির বয়স, স্বভাব, গঠন, বাসস্থান, লিঙ্গ, আহার, বিচরণ এবং দেহের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বর্ধন ও উহাদের মধ্যে নূতন কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যাইলে তাহাও নির্ধারিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইত। ইহা ছাড়া জীবমাত্রেরই উরু, স্কন্ধ, ক্রোড়, শির, সক্‌থি, পাদ, কর, কটি, পৃষ্ঠ, চর্ম, বৃক্ক, যকৃৎ ও অন্ত্র এবং তৎসহ উহাদের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতিও এইজন্য পরীক্ষা করার রীতি ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে এই দেশে যে Ecology বিজ্ঞান আপনা হইতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই গড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে।

জনন-বিভাগ

মানসিক, দৈহিক ও স্বভাব বিভাগ সম্বন্ধে সবিশেষরূপে আলোচনা করা হইল। এইবার প্রাণিদিগের জনন-বিভাগ (genetics) সম্বন্ধে বলিব। আর্য ঋষিগণ প্রাণিদিগের বিভিন্নরূপ জনন প্রথা অনুযায়ী এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। মহামুনি প্রশস্তপাদ (৫।৬০০ খ্রীঃ পূঃ) সমুদয় জঙ্গম জীবকে দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন :—

(১) অযোনিজ অর্থাৎ যে-সকল জীব যৌনসঙ্গম ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করে। 'আমিবা' আদি জীব এই বিভাগের অন্তর্গত একটি জীব।

(২) যোনিজ অর্থাৎ যে সকল জীব পুং ও স্ত্রী-বীজের সংমিশ্রণে জন্ম গ্রহণ করে। সমুদয় অস্থিক জীব এবং কোনও কোনও নিরস্থিক জীবের এইভাবে জন্ম হয়।

পৃথিবীর আদিতম জীব মাত্রই অযোনিজ জীব ছিল। পরে অযোনিজ জীব হইতেই যোনিজ জীবের জন্ম হয়। অর্থাৎ এই অযোনিজ জীবদের কোন একটি বংশ রূপান্তরিত হইয়া যোনিজ জীবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে অযোনিজ জীব হইতে এই যোনিজ জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকের 'সৃষ্টিক্রম' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে।

এই যোনিজ জীবগণকে হিন্দু মনীষিগণ উহাদের জনন-প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল উপবিভাগের সংখ্যা তাঁহারা স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী কখনও কখনও বাড়াইতেন, আবার কখনও কখনও উহাদের কমাইয়াও দিতেন। এই সকল উপ-

বিভাগের সংখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে বাদানুবাদেরও অন্ত ছিল না। এই সম্পর্কীয় যুক্তিতর্কের আরম্ভ হয় ২০০০ খ্রীঃ পূঃ কালে ঋক্ বেদের সময়ে, ১৫০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ কালে উপনিষদের যুগে উহা দানা বাধিয়া উঠে এবং খ্রীঃ জন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুশ্রুত ও চরকের কালেও উহার সমাপ্তি ঘটে না। জনন-প্রথা অনুযায়ী জীবগণকে হিন্দু-মনীষিগণ কালক্রমে স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ—এই চারিটি বিভাগে বিভক্ত করেন। বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ জীবদিগকে স্ব স্ব ধারণানুযায়ী কখনও তিনটি কখনও বা চারিটি ভাগে যে বিভক্ত করিতেন, নিম্নের প্রামাণ্য শ্লোক কয়টি হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

(১) "বীজানীতরানি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ
জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ ॥"

ঐতৈরয় উপনিষদ ৫।৩

(২) "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানী,
ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥"

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।৩।১, ৪১৬।১

(৩) "ভূতনাং চতুর্ব্বিধা যোনির্ভবতি
জরায়ুণ্ডস্বেদোদ্ভিজ," —চরক সংহিতা ৩য় অধ্যায়।

(৪) "জঙ্গমাঃ খল্বাপি চতুর্ব্বিধা জরায়ুজা-
ণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জঃ। তত্র পশুমনুষ্য-
ব্যালাদয়ো জরায়ুজা। খগসর্পঃ
সরীসৃপ প্রভৃতয়োঽণ্ডজাঃ।" সুশ্রুত-

সূত্রস্থানং—১ম অধ্যায় ২৪, পৃঃ ১৫।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক যথাক্রমে ঐতেরেয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে লওয়া হইয়াছে। উহাদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১২০০ বৎসরকাল বরাবর ধরা যাইতে পারে। এই উভয় শ্লোকেই স্বীকার করা হইয়াছে যে এই স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ (উদ্ভিদ?) ও জরায়ুজ—এই চতুর্বিধ জীবের উৎপত্তির মূল কারণ বীজ। অর্থাৎ বীজ হইতে এই চারিটি জীবের উৎপত্তি; কিন্তু উহাদের স্ফুরণের স্থান ও কারণ বিভিন্ন হওয়ায় উহারা বিভিন্ন উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। উপরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকটি যথাক্রমে চরক (৭৫ খ্রীঃ) ও সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ পূঃ) হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐতেরেয় উপনিষদের শ্লোকে জনন-প্রথা অনুযায়ী জীবদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ (উদ্ভিদ?) এবং স্বেদজ। ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোকে জনন-প্রথা অনুযায়ী বীজজাত জীবদিগকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—জীবজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ। এই শ্লোকটিতে আমরা একটি নূতন শব্দও পাই, যথা—জীবজ। কিন্তু এই জরায়ুজ, জীবজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ শব্দ ব্যতীত, সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা আরও তিনটি শব্দের সন্ধান পাই—যথা, সমূর্চ্ছজ, রসজ ও পোতজ। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"অণ্ডজাঃ পক্ষীসর্পাদ্যাঃ পোতজাঃ কুঞ্জরাদয়ঃ।
রসজা মত্তকীটাদ্যা মৃগবাদ্যা জরায়ুজাঃ ॥
যূকাদ্যা স্বেদজা মৎস্যোদয় সর্ম্মূচ্ছজোদ্ভবাঃ।
খঞ্জনাস্তদ্ভিদোথ পাদুকা দেব নারকাঃ ॥"
এস যোনয়া ইত্যষ্টা বুদ্ভিদ্দুদ্ভিজ্জমুদ্ভিদম ॥

তাৎপর্য: পক্ষী সর্পাদি (প্রকৃত মৎস্যসহ) জীব অণ্ডজ; হস্তী

প্রভৃতি পোতজ ; মত্তকীটাদি রসজ ; মনুষ্যগবাদি জরায়ুজ, যুক জীবাদি (যুক অর্থে কীট নহে) স্বেদজ, মৎস্যাদি সমূর্চ্ছজ, উদ্ভিজ্জ (উদ্ভিদ ?) ইত্যাদি।

উপরিউল্লিখিত শ্লোকটি আমি 'হেমচন্দ্র' নামক সংস্কৃত অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই হেমচন্দ্র নামক গ্রন্থের প্রণেতাও ছিলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র মহারাজ কুমারপালের গুরু ছিলেন। সেইকালে তাঁহার মত সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। সেইজন্য তৎকালীন জনসমাজ তাঁহাকে 'কলিকাল সর্বজ্ঞ' আখ্যায় ভূষিত করিয়া ছিলেন। মহারাজ কুমারপাল দশম খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। হেমচন্দ্র সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া তৎকালীন সমুদয় সংস্কৃত শব্দ-সাগর মথিত করিয়া এই অভিনব অভিধানটি প্রণয়ন করেন। এই অভিধানে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা অমরকোষ আদি অভিধানেও পাওয়া যায় না। স্যার রাধাকৃষ্ণ দেব, মহারাজ বাহাদুর KT. C. I. E. তাঁহার 'শব্দ কল্পদ্রুম' গ্রন্থে প্রামাণ্য পুস্তকরূপে এই হেমচন্দ্রের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউল্লিখিত সব কয়টি শ্লোক একত্রিত করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব যে,জীব মাত্রই বীজ হইতে জাত হইলেও উহাদের জন্ম ও স্ফুরণ হয় বিবিধ স্থানে ও উপায়ে। এই বীজ স্ফুরণের স্থান ও উপায়ের বিভিন্নতা হেতু উহাদের যথাক্রমে—'জরায়ুজ, জীবজ, পোতজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, সমূর্চ্ছজ, রসজ ও স্বেদজ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সাধারণভাবে বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জীবদিগের ঐ সকল জননবাচক শব্দসমূহ সঙ্কলিত করিয়া স্বীয় অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি অভিধান প্রণয়ন করা। এইজন্য ঐ সকল শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করেন

নি। যতদূর বুঝা যায় এইখানে মৎস্য বলিতে তিনি গলদা প্রভৃতি চিংড়ী মাছকে বুঝিয়াছেন, রুই, কাতলা প্রভৃতি প্রকৃত মৎস্য জীবকে বুঝেন নাই। অনুরূপ ভাবে যুক আদি (যুকা নহে) জীব বলিতে তিনি যে কীট প্রভৃতি কোনও জীবকে বুঝেন নি, তাহা আমি পরে প্রমাণ করিব।

[হেমচন্দ্রের ন্যায় অমরকোষ অভিধানেও এইরূপ জননবাচক শব্দের কয়েকটি ব্যাখ্যাগত ভুল দেখা যায়। * এই গ্রন্থেও কৃমি দংশ বলিতে স্বেদজ জীব বলা হইয়াছে, কিংবা উহাতে স্বেদজ জীবকে কৃমি কীট হইতে একটি পৃথক জীব বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। কারণ অভিধান অভিধান মাত্র, উহা কোনও এক বিজ্ঞান শাস্ত্র নয়। এতদ্ব্যতীত এই অভিধান দুইটি এই শ্লোকগুলি রচিত হইবার বহুকাল পরে রচিত হইয়াছিল। এই সকল ভুল ইঁহারা কেন করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে পরে বিবৃত করা হইবে।]

বহু প্রাচীন হিন্দুমনীষী যে সমূর্চ্ছজ বলিতে প্রকৃত মৎস্য জীবকে এবং স্বেদজ বলিতে দংশ মশকাদিকে বুঝেন নি তাহা অন্যান্য বহু প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক ও উহাদের ভাষ্যসমূহ হইতে বুঝা যায়। এই সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ বিভাস্বত পুত্র মনু (C ৬০০ খ্রীঃ পূঃ) রচিত একটি প্রাচীন শ্লোক মনুসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

স্বেদজং দংশমশকং যুকামক্ষিক মৎকুনং।
উষ্মাণশ্চাপজায়ন্তে সচ্চালন্ত্যাৎ কিঞ্চিদীদৃশ্যং॥

* বিব্যোপাদুকাঃ দেবা মৃগবাদ্যা জরায়ুজাঃ।
স্বেদজাঃ কৃমিদংশাদ্যা পক্ষীসর্পায়োঽণ্ডজাঃ

অমরকোষ।

অণ্ডজাঃ পক্ষীনঃ সর্পনক্রামৎস্যাশ্চকচ্ছপা।
যানি চৈবং প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানী চ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংশিচ পিশাচশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ।

এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, স্বেদজ জীব, দংশমশক, যুকা (যুক নহে) ও উকুন জীবের বীজ উষ্মা দ্বারা স্ফুরিত হইয়া থাকে। [এই জন্য অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে এই সকল জীবদের উষ্মজ আখ্যায় ভূষিত হইতে দেখা যায়।] এতদ্ব্যতীত এই শ্লোকে আরও বলা হইয়াছে যে, পক্ষী, সর্প, নক্র, কচ্ছপ ও মৎস্য জীব ডিম্ব হইতে জাত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে উপনিষদোক্ত শ্লোক দুইটিতে আমরা দেখিয়াছি যে, জীব মাত্রেরই জন্মের হেতু হইতেছে বীজ, অর্থাৎ বীজ ব্যতিরেকে কোনও জীবের জন্ম হইতে পারে না। এক্ষণে মনুসংহিতার এই শ্লোকটি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে নিরস্থিক জীবদের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ডিম্বকে তাঁহারা বীজ এবং অস্থিক জীবদের নাতিবৃহৎ ডিম্বকে তাহারা অণ্ড আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। উপরন্তু মনুসংহিতার ঐ শ্লোকটিতে আমরা আরও দুইটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সন্ধান পাই, যথা, জলজ (ঔদক) বা Acquatic animal এবং স্থলজ বা Terres-torial animal। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুনিপ্রবর মনুর মতে উপরোক্ত নিরস্থিক ও অস্থিক, এই উভয় শ্রেণীর জীবদের কতকগুলি জলে ও কতকগুলি স্থলে বাস করে। মনুসংহিতার এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রভৃতি জীবগণের কতকগুলি জলে ও কতকগুলি স্থলে অবস্থান করে। আমি পরে দেখাইব যে, স্বেদজ জীব অর্থে প্রাচীন হিন্দুগণ আমিবা আদি এককোষ (One celled)

জীবকেই বুঝিতেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন যে, কি এককোষ জীব, কি বহুকোষ জীব, কি সরীসৃপ ও কি জরায়ুজ (স্তনপা) জীব, এই সকল প্রকার জীবই উহাদের শ্রেণী ভেদে জলে বা স্থলে বাস করিয়া থাকে। এই শ্লোকটি হইতে আরও বুঝা যায় যে, তিমি ও তিমিঙ্গল জীব যে জরায়ুজ জীব (মৎস্যের ন্যায় অণ্ডজ জীব নহে ইহাও তৎকালীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঐ শ্লোকটিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যথাক্রমে (পর পর) স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মহর্ষি মনু তাঁহার অমর গ্রন্থ মনুসংহিতায় উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ জীবকে প্রাণীরূপে ধরেন নি, এইজন্য তাঁহার উপরোক্ত শ্লোকে উদ্ভিজ্জ শব্দটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাণী-সমূহকে প্রাচীন হিন্দুগণ তাহাদের জনন প্রথানুযায়ী প্রথমে তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—স্বেদজ, অণ্ডজ (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) ও জরায়ুজ। ইহার পর তাহারা উহাদের স্ফুরণের স্থান অনুযায়ী আরও কয়েকটি বিভাগ ঐ মূল বিভাগত্রয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—রসজ, উষ্মজ, সমূর্চ্ছজ ইত্যাদি। প্রাচীন হিন্দুগণের মতে উপরোক্ত-রূপ পর্যায়ে ঐ সকল জীবগণ পর পর পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এইবার আমি এই স্বেদজ, রসজ, সমূর্চ্ছজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, জীবজ ও পোতজ প্রভৃতি জীবসমূহের জননবাচক শব্দ কয়টির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে একে একে ব্যাখ্যা করিব।

স্বেদজ জীব

প্রথমে এই স্বেদজ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা যাউক। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা ব্যতীত ধাতুগত অর্থ হইতেও এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়। প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণের মতে যে জীব মনুষ্যের স্বেদ বা ঘর্মানুযায়ী ঈষৎ লবণযুক্ত উদকে বা জলে প্রথম জাত হইয়াছিল তাহারাই হইতেছে স্বেদজ জীব।

এই স্বেদজ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রাচীন হিন্দু মতানুযায়ী জীবোৎপত্তির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিতে হইবে। উপনিষদ গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের জন্মের হেতু একমাত্র বীজ। অর্থাৎ পূর্বতন এক জীব বা Life হইতেই অপর আর এক জীব জন্মিতে পারে; কোনও এক Non-life বা অজীব হইতে কোনও এক জীবের বা Life-এর জন্ম হইতে পারে না। কিন্তু ভাগবতোক্ত শ্লোকে আমরা দেখিয়াছি যে, সৃষ্টিকালে পৃথিবীতে সুমিষ্ট জলরাশির উপরিভাগে অজীব বা Non-life হইতে প্রথম জীবের বা Life-এর সৃষ্টি হইয়াছিল। [জীব শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ইত্যাদি, ইতি ভাগবত] এই সকল তথ্য হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে এখনকার পৃথিবীতে অজীব হইতে জীবের সৃষ্টি সম্ভব না হইলেও জীবের সৃষ্টিকালে প্রাচীন পৃথিবীতে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তাহা না হইলে পৃথিবীতে কোথা হইতে কি করিয়াই বা প্রথম জীবগণ আসিল? তখনকার পৃথিবীতে কিরূপে ও কেন ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা আমরা ঋকবেদের ১০।১২৯।১-৭ সূক্ত হইতে জানিতে পারি। ঋকবেদের মতে

ঐ সময় পৃথিবী আলোকের উপর আলোক দ্বারা আবৃত ছিল এবং এই-জন্য ঐ সময় আলোক ও অন্ধকারে কোনও প্রভেদ ছিল না।

[এতদ্দ্বারা ঋকবেদের সূক্ত প্রণেতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ঐ সময় সূর্যের তেজ এত অধিক ছিল যে, ঐ সময় কোনও চক্ষুষ্মান জীব জন্মগ্রহণ করিলে তাহার চক্ষুমণি এমনি নিষ্প্রভ হইয়া যাইত যে তাহার পক্ষে কোনও বস্তু দর্শন সম্ভব হইত না।] ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং ঋকবেদের ঐ সূক্ত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, ঐ সময় পৃথিবী ছিল বায়ু (Oxygen ?) শূন্য এবং সমুদ্রের জলরাশি ছিল সুমিষ্ট বা প্রায় লবণশূন্য। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় বায়ুশূন্য (Oxygen ?) নভোমণ্ডলের তলায় সমুদ্রের সুমিষ্ট জলরাশির উপরিভাগে প্রচণ্ড সূর্যের তেজস্ক্রিয়া (Synthesis ?) দ্বারা অজীব হইতে প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়। এইজন্যই সম্ভবতঃ আর্য ঋষিগণ শাস্ত্রাদিতে সূর্যকে জীবের জনক ও পৃথিবীকে উহাদের মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। [অজীব হইতে যে জীব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ য়ুরোপে D'herelle সাহেব সম্প্রতি Bacteriophages নামক এক জীব ও অজীবের মধ্যবর্তী অনুজীব আবিষ্কার করিয়াছেন।] ভাগবতকার সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রথম জীব ঐ সময় প্রভাত সূর্যের প্রভাবে সমুদ্রের সুমিষ্ট জলে হিরন্ময় বীজাকারে অজীব হইতে জন্মগ্রহণ করে। ভাগবতকারের মতে পৃথিবীর এই প্রথম জীব জন্মগ্রহণ করার পরও বহুকাল ইহা সুপ্ত অবস্থায় বীজাকারে অবস্থান করে। পরে উপযুক্ত পরিবেশে উহারা যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্ফুরিত হয়। [আজও উদ্ভিদের বীজ সমূহ ও কোনও কোনও ব্যাকট্রিয়া জীব বহুকাল সুপ্ত অবস্থায় জীবিত থাকে।]

ভাগবতকারের মতে প্রথম জীব ছিল 'না-উদ্ভিদ না-প্রাণী'-রূপ উভয়ের মধ্যবর্তী এক জীব। ঋকবেদের ১।১৬৪।৪ সুক্তে ঋষি দীর্ঘতমা ইহাকে 'প্রথম জায়মানম' জীবরূপে অবিহিত করিছেন, অর্থাৎ তিনি ইহাকে প্রাণীও বলেন নি, উদ্ভিদও বলেন নি*। [এখনও ঐরূপ এক মধ্যবর্তী জীব দেখা যায় যাহাকে উদ্ভিদ বা প্রাণী বলা যায় না, কারণ উহাদের ব্যবহার এই উভয় জীবেরই অনুরূপ।] ঋকবেদের ঐ একই সুক্তে বলা হইয়াছে যে কালক্রমে এই প্রথম 'জায়মানম' স্থির জীব বা উদ্ভিদ এবং অস্থির জীব বা প্রাণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ভাগবতের মতে ঐ প্রথম জীব হইতে প্রথমে উদ্ভিদ ও তৎপরে প্রাণীর [স্থাবর মুক্তেভ্য বরা জঙ্গম মুক্তকা] সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই হওয়া স্বাভাবিক, কারণ উদ্ভিদ দ্বারাই প্রাণীর নিত্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। তাহা না হইলে উন্নত প্রাণীর সৃষ্টি পথ সুগম হইতে পারিত না।

যতদূর বুঝা যায় প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে, অজীব হইতে প্রথম জায়মানম বা প্রথম জীব সৃষ্টির সময় সমুদ্রের জল ছিল সুমিষ্ট। ঐ প্রথম 'জায়মানম' হইতে উদ্ভিদের সৃষ্টির সময়ও উহা প্রায় লবণশূন্য ছিল। [এই জন্য উদ্ভিদ অপেক্ষা জীব দেহে লবণাংশ অধিক থাকে ?] ইহার পর ঐ প্রথম জায়মানম হইতে প্রাণী সৃষ্টির সময় সমুদ্রজল মনুষ্যের স্বেদ বা ঘর্মের ন্যায় ঈষৎ লবণযুক্ত হইয়া যায়। ঐরূপ স্বেদ বা ঘর্মানুরূপ উদকে জন্ম বলিয়া পৃথিবীতে প্রথম জাত প্রকৃত প্রাণীকে বলা হইয়া থাকে স্বেদজ জীব। 'আমিবা' আদি [জন্তু মাতা, ইতি চরক] এককোষ (one celled) প্রাণিগণ ইহাদের বংশধর বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাদেরও স্বেদজ জীব বলিতেন।

এইবার প্রাচীন হিন্দুদিগের উপরোক্ত মতবাদসমূহ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখা যাউক ইহার মধ্যে কতটা

সত্য আছে। প্রাচীন হিন্দুগণ জীব সৃষ্টির কারণ নির্ণয়ার্থে য়ুরোপীয়দের ন্যায় বিবিধ পরিবেশের উপরই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু যে সকল পরিবেশ-সমূহের কথা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সেই সকল পরিবেশ ব্যতীত আরও কয়েকটি পরিবেশের কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সকল পরিবেশ হইতেছে তিনটি, যথা, (১) সূর্যের তেজ হ্রাস, (২) বায়ুতে অক্সিজেন বৃদ্ধি, এবং (৩) সমুদ্রজলের লবণ বৃদ্ধি। আমি প্রথমে এই ত্রয়ী ঘটনা যে পৃথিবীতে সত্যই ঘটিয়াছিল সেই সম্বন্ধে বলিব এবং উহার পর ঐ সকল ঘটনা ঘটার জন্যই যে পৃথিবীতে জীবোৎপত্তির সূচনা হইয়াছিল তাহাও আমি প্রমাণ করিব। অবশ্য সৃষ্টিক্রমের এই হিন্দু-মতসমূহের প্রমাণ আমি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রদান করিব। কারণ অধুনাকালে পৃথিবীর মনীষিগণ এই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

[এই জ্ঞান সম্ভবতঃ হিন্দুগণও য়ুরোপীয়দের ন্যায় এ্যাসট্রোনমীর সাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন। 'ভূতত্ত্ববিদ্যার' (zoology) সহিত 'নক্ষত্রবিদ্যা'ও যে প্রাচীন ভারতে একত্রে অধীত হইত তাহা আমরা ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে রচিত, ছান্দোগ্য ৭ম অঃ ১ম খণ্ড ২য় শ্লোকে দেখিয়াছি। শ্লোকটি এই পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয়েরা এ্যাসট্রোনমীতে যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।]

H. G. Wells প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদেরও মতে পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় অজীব বা Non-life হইতে জীব বা Life-এর উদ্ভব সম্ভব ছিল। তাঁহাদের মতে সূর্যকিরণ প্রসূত আলট্রাভায়লেট তরঙ্গ সিনথিসিস দ্বারা বিশেষ একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানকালীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন থাকায়

আজ আর ইহা সম্ভব হয় না। পূর্বেকার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই অক্সিজেন এত স্বল্প ছিল যে উহা ছিল না বলিলেই চলে। তৎকালীন পৃথিবী বক্ষের উগ্রতাপ ও মুহুর্মুহু অগ্নি উদ্‌গিরণ (Volcanic eruption) ছিল ইহার অন্যতম কারণ। এই জন্যে সূর্যের খররশ্মি সেই যুগে যাহা করিতে পারিয়াছে, আজ আর উহা তাহা পারে না। এইজন্য অজীব হইতে জীবের সৃষ্টিও আজিকার পৃথিবীতে আর হয় না। কারণ ইতিমধ্যে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং পৃথিবীও আর পূর্বের ন্যায় অগ্নি উদ্‌গিরণ করে না। এই বিশেষ উদ্ভিদ বায়ু হইতে যত অক্সিজেন গ্রহণ করে তদপেক্ষা তারা বহুগুণ অক্সিজেন নির্গত করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন পূর্ণ হইয়া যাওয়ার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ। *

ঐ সময় অক্সিজেনশূন্য প্রাচীন পৃথিবীর সমুদ্রজল যে প্রায় লবণশূন্য ছিল তাহাও উপলব্ধি করা আদপেই কঠিন নয়। কারণ বৃষ্টিপাতের কারণে পৃথিবীর মৃত্তিকার লবণাংশ ধৌত জল যুগ যুগ ধরিয়া নদী সহযোগে সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উঠিয়া পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু লবণাংশ সমুদ্রেই থাকিয়া যাওয়ায় উহার পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে (উদ্ভিদ সৃষ্টির পর) বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ন্যায় সমুদ্র জলেরও লবণাংশ যে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি আছে ? কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রকৃত প্রাণীর জন্ম সমুদ্রের জলে হয় বলিয়াই এখনও পর্যন্ত প্রাণীদেহের ঘর্ম ঈষৎ লবণাক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল পণ্ডিতদের মতে প্রাণী যে প্রথমে সমুদ্রে জন্মিয়াছিল ইহা তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। আমি মনে করি

* এই অক্সিজেন বা অম্লজানের উল্লেখও কয়েকটি মধ্যযুগীয় সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা গিয়াছে।

যে, মনুষ্যের স্বেদ বা ঘর্মানুরূপ লবণযুক্ত উদকের সহিত সমুদ্রের বর্তমান লবণাংশের তুলনা করিয়া স্বেদজ জীব যে কত লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব।

এইবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও সমুদ্রের লবণাংশ বৃদ্ধির সহিত সূর্যের তেজও যে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতপক্ষেই কমিয়া আসিতেছে সেই সম্পর্কীয় বিবিধ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জিন (JEAN) সাহেব ও অন্যান্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে প্রতি এগারো বৎসরে সূর্যের ডায়েমেটার এক মাইল করিয়া কমিয়া আসিতেছে। খ্রীঃ পূঃ ২,২২০ অব্দে সূর্যের যে পরিধি ছিল তদপেক্ষা আজিকার দিনের সূর্যের পরিধি ৩৭৫ মাইল কম। এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এক মিলিয়ন বৎসরে সূর্যের আয়তন প্রায় ১০০,০০০ মাইল কমিয়া যায়। এই জন্য সূর্যের ওজন ও উগ্রতাও ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সূর্য কিরণ দিয়াছে তুলনামূলকভাবে তাহার ওজন আজ প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন টন কম হইয়া গিয়াছে। HELMHOLTZ সাহেব বলেন যে এই জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সূর্যের প্রচণ্ড প্রতাপ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। তবে KELVIN সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা সত্ত্বেও সূর্য আরও ৫০ মিলিয়ন বৎসর পৃথিবীর বুকে কিরণ বিতরণ করিতে সমর্থ। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে সূর্যের আয়তন এইভাবে কমিয়া আসার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ প্রতিবৎসরে আমাদের পৃথিবীও ¼ ইঞ্চি করিয়া সূর্যের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের মতে সূর্যের আয়তন ক্রমশঃ কমিয়া আসায় এবং তৎজনিত পৃথিবী উহা হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাওয়ায় পৃথিবীর উপরকার উত্তাপও যুগ

যুগ ধরিয়া কমিয়া আসিতেছে। পর পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কীয় চিত্রটি অনুধাবন করিলে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ নির্ভুল রূপে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কারণ তাঁহারা মূলতঃ এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই বিবিধ প্রকার প্রাণীর জন্মের কারণ সম্বন্ধে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীর সর্বনিম্ন ভূস্তর ক্যামাব্রিয়ান স্তরের যে স্থানে প্রথম নিরস্থিক জীবের চিহ্ন দেখা যায় উহার অন্ততঃ পাঁচশত মিলিয়ন বৎসর পূর্বে প্রথম জীব জন্ম গ্রহণ করে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কিরূপে 'আমিবা' হইতে বিবিধ নিরস্থিক জীবের জন্ম হইয়াছিল তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণ আজও পর্যন্ত বলিতে অক্ষম। কিন্তু হিন্দুমনীষি-গণ প্রবর্তিত মতবাদ অনুধাবন করিলে ঐ সময়কার জীবসমূহের জন্ম ইতিহাস নির্ভুল রূপে অনুমান করা সম্ভব। হিন্দুগণের মতে উপরোক্ত তিনটি কারণের জন্য পৃথিবীতে যথাক্রমে স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকল জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ কর্ম করার জন্য অধুনা দৃষ্ট বিবিধ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্বেদজ, রসজ, সমূর্চ্ছজ প্রভৃতি জনন বাচক শব্দ কয়টির প্রকৃত অর্থ হইতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাইবে। স্বেদজ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার রসজ, সমূর্চ্ছজ ও উদ্ভিজ্জ শব্দ কয়টির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বলিব।

রসজ জীব

প্রাচীন হিন্দুগণের মতে স্বেদজ জীবের পর পৃথিবীতে রসজ জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বেদজ জীবের ন্যায় এই রসজ জীবেরও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে জীবসমূহের জন্ম ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুগণের মতে পৃথিবীতে রসের সৃষ্টি হওয়ার পর এই রসজ জীবসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রসের সৃষ্টি কেন ও কিরূপে হইয়াছিল তাহা পরে বিবৃত করা হইবে। হিন্দুদের মতে পৃথিবীতে যথাক্রমে স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ ও রূপ বোধের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে পৃথিবীতে পর পর ঐ সকল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত জীবদেহে ঐ সকল বোধের সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর প্রথম জাত স্বেদজ জীবগণকে এইজন্য এক মাত্র স্পর্শ-বোধ দ্বারাই জীবন যাপন করিতে হইত, কারণ তখন অন্য কোনও বোধ সম্পর্কীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি। ইহার পর কালক্রমে পৃথিবীতে রসের সৃষ্টি হইলে ঐ রসের সংস্পর্শে আসিয়া রসজ জীবের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ স্বেদজ জীব বলিতে এককোষ বা ব্যষ্টি জীবকে এবং রসজ জীব বলিতে বহুকোষ বা মুখ্য জীবকে বুঝিতেন। তাহাদের মতে রসের সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীতে খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটে এবং তৎজনিত ব্যষ্টি জীবসমূহ বহু সংখ্যায় বর্ধিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুকোষ বা মুখ্য জীবের সৃষ্টি করে। তাহাদের মতে এই মুখ্য জীবসকল পৃথিবীর তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী কেবলমাত্র স্পর্শ ও রস বোধ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। এইরূপ এক পরিবেশে পৃথিবীতে প্রথম বহুকোষ জীব সৃষ্টি হওয়ায় হিন্দুগণ তাহাদের রসজ জীব আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। প্রাচীন

হিন্দুগণের মতে বহুকোষ জীবদের এই রসবোধ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইয়া মৎস্যে আসিয়া উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জনন মত অনুযায়ী প্রাচীন হিন্দুরা সাধারণভাবে প্রাচীন বহুকোষ জীবদেরই রসজ্ঞ জীবরূপে বুঝিয়াছিলেন।

[রসের সংস্পর্শে আসিয়া রসজ্ঞ জীব যে সময় সৃষ্ট হয় সেই সময় দৃষ্টিবোধের সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। কারণ তৎকালীন সূর্যের প্রচণ্ড আলোকে চক্ষু থাকিলেও উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত। এইজন্য কেঁচুয়া আদি জীবের মধ্যে আমরা কেবলমাত্র আলোক বোধ (Light sense) দেখি। এই নিরস্থিক জীবদের অস্থিবাহী শব্দ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় অক্সিজেন পূর্ণ বায়ুর অভাবে বায়ুবাহী শব্দের উৎপত্তিও অসম্ভব ছিল—এইজন্য অনুকূল পরিবেশের অভাবে বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে উন্নত জীবের সৃষ্টি হইতে পারে নি। ইহার পর সূর্যের প্রচণ্ডতা পূর্বোক্ত কারণে ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে। এই সময় আরও বহু উদ্ভিদও সৃষ্ট হইয়া স্থলে উঠিবার পথে জলের কিনারায় আসিয়া পড়ে। কতকটা সূর্যের উগ্রতা হানির কারণে কতকটা এই সকল লতাগুল্মের মধ্যে আশ্রয় লওয়ার জন্য খোলকী জাতীয় কয়েকটি বহুকোষ জীবের অনন্নুত চক্ষুমণি সৃষ্টি হয়, কিন্তু সূর্যের উগ্রতা তখনও পর্যন্ত সহনশীল না হওয়ায় উহার প্রকৃত বর্ধন ঘটিতে পারে নি। ইহার পর যখন জলজ জীবগণ স্থলে উঠে সেই সময়েও সূর্যের প্রচণ্ডতা আশানুযায়ী কমে নি, অথচ সেই সময় ঐ সকল স্থলজ জীবের কর্ণও সুগঠিত হইতে পারে নি। এইজন্য তৎকালীন স্থলজ জীবদের মূলতঃ অস্থিবাহী শব্দের উপরই নির্ভরশীল হইতে হইত। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত কারণে অক্সিজেন বহুল হইয়া পৃথিবীতে বায়ু বহুগুণে বর্ধিত হয়, এইরূপ এক পরিবেশে সম্ভবতঃ জীবদেহে সর্বপ্রথম

বায়ুবাহী শব্দবোধের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন প্রায় বর্তমানকালীন পৃথিবীর অনুরূপ হইলে শীতল রুধির সরীসৃপদের উষ্ণ-রুধির স্তনপা ও পক্ষীজীবে রূপান্তরিত হইবার উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত কারণে সূর্যের খর রশ্মি প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা পাইতে থাকে এবং ইহার ফলে উচ্চতম জীবদের মধ্যে দৃষ্টিবোধেরও আধিক্য ঘটিতে থাকে।]

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, পৃথিবীতে সত্য সত্যই পর পর স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ ও রূপ জ্ঞান সম্পর্কীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সকল পরিবেশই স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধ-বেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও কর্মবেদী জীবের সৃষ্টি সম্ভবপর করে। এই সকল বিষয় বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুমনীষিদিগের এই সম্পর্কীয় মতামতসমূহ একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না।

প্রাচীন হিন্দুগণ পৃথিবীতে রসের সৃষ্টির পর যে রসজ জীবের সৃষ্টি হয় তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীতে এই রসের সৃষ্টি কেন হইয়াছিল তাহা তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বলেন নি। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কীয় কোনও প্রাচীন শ্লোক আমি উদ্ধার করিতে পারি নি। তবে কয়েকজন ভাষ্যকারদের মতে পৃথিবীতে উদ্ভিদের সৃষ্টি হওয়ার পর উহাদের পচন জনিত রসের কারণে-পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রসের সৃষ্টি হয়। এই সকল ভাষ্যকারদের মতে পৃথিবীর জলরাশি এইভাবে রসযুক্ত হইয়া রসাল হইলে উহার উপর এই রসজ জীবসমূহের সৃষ্টি হয়।

কিরূপ পরিবেশে ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায়। আমরা জানি পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ ছিল সবুজ উদ্ভিদ। ইহারা সূর্য হইতে তেজ সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিত। এই সকল উদ্ভিদের সাহায্যেই প্রথমে বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন পূর্ণ হইতে থাকে।

পরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অন্যান্য উদ্ভিদ ও আরও পরে উন্নত ধরণের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যাকৃট্রিয়া বা মাইক্রোব জীবের তখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। এই কারণে উদ্ভিদসমূহের মৃত্যুর পর ব্রাকৃট্রিয়ার অভাবে উহাদের দেহের পচনক্রিয়া না হইবারই কথা। এইরূপ অবস্থায় মৃত উদ্ভিদের দেহ দ্বারা সারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়া সৃষ্টির অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারিত। এইখানেই ঈশ্বর বলিয়া কোনও ব্যক্তি বা বস্তর অবস্থিতি সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। কারণ এই অনাসৃষ্টি হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই যেন ব্রাকৃট্রিয়া জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ব্রাকৃট্রিয়া জীবের পচন ধর্মরূপ এক বিশেষ ধর্ম আছে। ইহারা অদৃশ্য রূপে পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়াইয়া থাকিয়া মৃত উদ্ভিদ ও জীব দেহের পচন-ক্রিয়া সমাধা করে, তাহা না হইলে এই উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ দ্বারা বহুকাল পূর্বেই সমগ্র ধরিত্রী পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

এই ব্যাকট্রিয়া জীব 'আমিবা' আদি এক কোষ জীব হইতে বহুগুণে ক্ষুদ্র এবং আয়তনে ইহারা এক ইঞ্চির $\frac{১}{২৫০০০}$ ভাগের সমান। প্রায় নিউকুলাসবিহীন এই ব্যাকট্রিয়া জীব জনৈক জার্মান পণ্ডিত কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইলেও ইহাদের অবস্থিতি সম্পর্কে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুমনীষিরাও পূর্বাহ্ণে অনুমান করিতে পারিযাছিলেন। বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের বাদানুবাদ এবং কনাদ ঋষির পরমাণুবাদ হইতে ইহা বুঝা যায়। কনাদ ঋষির মতে জড় পদার্থসমূহ বিবিধ কণা বা অণু (Molicule) দ্বারা বিভক্ত এবং উহাদের ঐ সকল কণাসমূহও সর্বশেষ বিভাজ্যরূপ পরমাণু (Atom) দ্বারা বিভক্ত। তিনি এই এ্যাটাম্ থিওরী বা পরমাণুবাদ বুঝাইবার সময় ইহাও বলিয়াছেন যে, অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবগণও (সোনেন্দ্রিয়) ঐ রূপে বহু অনুজীবে বিভক্ত। ভাষ্যকারদের মতে এরূপ অণুজীব হইতে

পরমাণু জীবেরও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তাঁহারা এই পরমাণুজীবকে অণুজীবের (One celled) অধঃপাতিত বংশধর (degenarated) মনে করিতেন [উড়িষ্যার গোবর্ধন মঠে রক্ষিত প্রাচীন ভাষ্য দ্রষ্টব্য] তাঁহাদের মতে কোন পরমাণুজীব হইতে এই অণুজীবের সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহাদের মতে এই পরমাণুজীব হইতেছে অণুজীবদের অধঃপাতিত বংশধর। ভাগবতের মতে জীবদেহের শেষ বিভাজ্য জীব হইতেছে অণুজীব বা ব্যষ্টিজীব। তাঁহার মতে জীবদিগের দেহ এই সকল দেহাণু বা ব্যষ্টিজীবের এক বিরাট সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণে প্রাচীন ভাষ্যকারগণ মনে করিতেন যে ব্যাকট্রিয়া বা পরমাণুজীব সকল এককোষ বা অণুজীবদের অধঃপাতিত বংশধর মাত্র।

[য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অবশ্য এই ব্যাকট্রিয়া জীব সৃষ্টির অন্য এক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির প্রাক্কালে পরীক্ষা-মূলকভাবে বহুবিধ জীব সৃষ্টি হইতেছিল, যথা ব্যাকট্রিয়া, আমিবা, 'না উদ্ভিদ না প্রাণী' জীব, উদ্ভিদ ঘেঁসা প্রাণী, প্রাণী ঘেঁসা উদ্ভিদ, ফিলট্রেট জীব ইত্যাদি। য়ুরোপীয়দের মতে এই সকল মধ্যবর্তী জীবদের মধ্যে যাহারা প্রাকৃতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল তাহারাই পরবর্তী উন্নত জীবদিগের জন্ম দেয়।]

এই ব্যাকট্রিয়া জীবদের কতকগুলি মানুষের ক্ষতিকর বিবিধ রোগের বীজাণু; কিন্তু ইহাদের অপর কতকগুলি মানুষের পরম হিতকারী বন্ধু। দুগ্ধ হইতে দধির সৃষ্টি পর্যন্ত এই ব্যাকট্রিয়া জীবের সাহায্যে হইয়া থাকে। কোনও কোনও হিন্দুর ন্যায় পূর্বেকার য়ুরোপীয়গণও ইহাকে রাসায়ণিক পরির্তন মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ সকল হিন্দুগণও মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয়দের ন্যায় অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, দুধের মধ্যে ঐ প্রকারের জীবাণুসমূহ অবস্থান করে। এই সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ

বহু প্রামাণ্য শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, যথা 'বর্ষাসু চ স্বেদাদিনা অনতি দবোয়সৈব কালেন দধ্যাহ্বয়বা' এবং 'চলন্ত-পুতনাদি কৃমীরূপা উপলাভ্যান্তে', জয়ন্ত ন্যায়মঞ্জরী ইত্যাদি।

[হিন্দুদের মতে পৃথিবীতে যথাক্রমে পর পর স্পর্শ ও রসের সৃষ্টির পর গন্ধবোধের সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ উপরোক্ত কারণে রস সৃষ্টির পরই গন্ধবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য জীবদিগের কেমিক্যাল বোধে আমরা রসের সহিত গন্ধও সংযুক্ত দেখি। পূর্বকালে সূর্যের উগ্র ও প্রচণ্ড তাপ গন্ধকণাসমূহ পূর্বাহ্ণেই বিনষ্ট করিয়া দিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সূর্যের খরতাপ ও পৃথিবীর অগ্নি উদ্গার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিলে উহারা পূর্বের ন্যায় বিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট না হওয়ায় উহারা রসকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া রসের আকারে জীবদেহে পৌঁছাইত। উপরন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন বহুল পরিমাণে বর্ধিত হওয়ায় বায়ুবাহী গন্ধ বোধের জন্য উপযুক্ত পরিবেশেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যাকট্রিয়া জীবগণের দ্রুত বংশ বৃদ্ধির জন্যও পৃথিবীতে বহু প্রকারের গন্ধের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ পক্ষে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ ও কয়েকটি জীবদেহ ও পুষ্পাদির নিজস্ব গন্ধ ব্যতীত খাটাল ও আস্তাবলের গন্ধ, বৃষ্টিপাতের পর মৃত্তিকার সুমিষ্ট গন্ধ, পচ্যমান জীব ও উদ্ভিদ দেহের অপ্রীতিকর গন্ধ প্রভৃতি বহুবিধ গন্ধ, আমরা এই মাইক্রোব বা ব্যাকট্রিয়া জীবের অবস্থিতির জন্য পাইয়া থাকি।]

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, হিন্দুদের মতে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অজীব হইতে 'প্রথম জায়মানম' নামা এক 'না উদ্ভিদ না প্রাণী' রূপ জীবের জন্ম হয়। ইহার পর এই 'প্রথম জায়মানম' জীব হইতে প্রথমে উদ্ভিদ ও পরে প্রাণীর (দুইটি পৃথক ধারায়) সৃষ্টি হয়। এই সময় প্রাণিগণ

কেবলমাত্র তাহাদের স্পর্শ জ্ঞানের দ্বারা জীবন ধারণ করিত। ইহার পর এই প্রাণিদিগের কয়েকটি অধঃপাতিত হইয়া (?) পৃথিবীতে ব্যাকট্রিয়া জীবের সৃষ্টি করে। এই ব্যাকট্রিয়া জীব উদ্ভিদ দেহ পচাইয়া পৃথিবীতে রসের সৃষ্টি করিলে একদিকে প্রাণিগণের রস জ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে রস সৃষ্টির জন্য উহাদের খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটে ও তৎজনিত উহাদের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়; ইহার ফলে উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুকোষ প্রাণিসমূহের সৃষ্টি করে। ইহার পর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও সমুদ্র জলের লবণাংশ আরও বর্ধিত হইলে [লবণ জল পরিহারার্থে জীব নদীর জলে আসে এবং তৎজনিত উন্নত জীবের জন্ম হয়।] এবং সূর্যের প্রচণ্ড রশ্মির তেজ আরও কমিলে ও তৎসহ বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের হার আরও বাড়িলে জীবদেহে এই স্পর্শ ও রসজ্ঞানের পর গন্ধ জ্ঞান, শব্দ জ্ঞান (অস্থি ও বায়ুবাহী) ও রূপ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এইভাবে বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পর উহাদের সাহায্যে জীব নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হইলে প্রাণিগণ উত্তরোত্তর আরও উন্নত হইতে থাকে।

এক্ষণে প্রাচীন হিন্দুদের এই সকল মতের সমর্থনে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা তাহা বিবেচ্য। আমি মনে করি যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বীজ (Germ) সমূহের আকৃতি ও উহাদের স্ফুরণ প্রথা হইতে এই সকল হিন্দু মতের মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা বুঝা যাইতে পারে।

আদিম প্রাণিসমূহ জেলি (Jelley) সদৃশ প্রটোপ্লাসাম (Semi-fluid) দ্বারা সৃষ্ট। আদিম উদ্ভিদসমূহ দেখিতে প্রায় আদিম প্রাণীরই অনুরূপ। কিন্তু প্রাণিসমূহের ঐ জেলি-বিন্দু অনাবৃত থাকে, এই জন্য তাহারা অতীব গতিশীল। কিন্তু উদ্ভিদের ঐ জেলি-বিন্দু (সেলুলোস পেপারের ন্যায়) এক শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকায় উহারা পরিক্রমণে সমর্থ নয়।

উচ্চ প্রাণিদিগের দেহের কোষ (Cell) সমূহ অবশ্য উদ্ভিদের ন্যায় মৃতসার (dead membrane) দ্বারা পরস্পর হইতে বিভক্ত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ সকল আবরণ ইল্যাসটিক বা ফ্লেক্সিবেল হওয়ায় উহাদের অন্তর্বর্তী জীবসার বা প্রোটোপ্লাসাম প্রয়োজনমত আকার পরিবর্তনে অক্ষম। উদ্ভিদদের দেহও অনুরূপভাবে কোষ সমষ্টি দ্বারা গঠিত হইলেও উহাদের কোষ সমষ্টির আবরণকারী সেলুলোস্ মেমব্রেণ প্রাণিগণের তুলনায় বহুগুণে কঠিন (stiffer), এইজন্য উদ্ভিদগণ প্রাণিদিগের ন্যায় চলাফিরা করিতে পারে না। কিন্তু জননকার্যের জন্যে উহাদের যে বীজ সৃষ্টি হয় তাহা কি উদ্ভিদ কি প্রাণী, এই উভয় জীবেরই ক্ষেত্রে প্রায় অনাবৃত জেলি-বিন্দুর আকারেই প্রকট হয়, অর্থাৎ যে পূর্বতন জীব হইতে ইহারা উভয়ে উদ্ভূত হইয়াছে পুনরায় সেই জীবেতেই এই সময় ফিরিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অতি শৈশবে উদ্ভিদের মধ্যেও অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে যৎসামান্য মুভমেণ্ট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কোনও এক 'না প্রাণী না উদ্ভিদ' সদৃশ 'প্রথম জায়মানম্' জীব হইতেই উদ্ভিদ ও প্রাণী, এই উভয় জীবেরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মাইক্রোব বা ব্যাক্‌ট্রিয়া জীবের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহারা প্রকৃত পক্ষে প্রাণী হইলেও অধঃপতিত হইয়া উহাদের কারো কারো ব্যবহার বহুলাংশে উদ্ভিদের অনুরূপ হইয়া গিয়াছে। এমন বহু মাইক্রোবও আমরা দেখিতে পাই যাহারা এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহারা পরিক্রমণ পর্যন্ত করিতে পারে না। উদ্ভিদজীবের ন্যায় তাহারা কেবলমাত্র খাদ্য শোষণ, দেহের বর্ধন ও প্রজনন মাত্র ঘটাইতে পারে। বহু ব্যাক্‌ট্রিয়া বা মাইক্রোব জীবের উত্তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অসীম, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালীন সূর্যের অত্যুগ্র তাপ সহনের

উপযুক্ত হইবার জন্যই উহারা ঐরূপে অধঃপাতিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ উদ্ভাবিত সৃষ্টিক্রম মতসমূহ একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত হইবে না। যাহা হউক, বিবিধ প্রমাণসহ স্বেদজ ও রসজ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার প্রাচীন হিন্দুগণ প্রবর্তিত জননবাচক সমূর্চ্ছজ শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বলা যাউক।

সমূর্চ্ছজ জীব

এই সমূর্চ্ছজ শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে পৃথিবীর উদ্ভিদসমূহের জন্ম ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিতে হইবে। আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে উদ্ভিদসমূহ অগ্রগামীরূপে প্রথম জন্মিয়া জলজ প্রাণিদিগকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে আমি দেখাইব যে এই উদ্ভিদ প্রথমে পৃথিবীর স্থলভাগে উঠিয়া পৃথিবীর ভূস্তরকে প্রাণিদিগের বসবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই প্রাণিগণ স্থলে উঠিয়া সেইখানে নির্বিবাদে বসবাস করিয়া অধিকতর রূপ উন্নত হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদসমূহই পৃথিবীর রৌদ্রতপ্ত বালুকণা অপসারিত করিয়া জীবদিগের বসবাসের জন্য একদিকে যেমন [ব্যাকটিরিয়া সহযোগে] মৃত্তিকার (Soil) পুষ্টিসাধন করিযাছে, তেমনি অপর দিকে আপন অবয়ব দ্বারা উহারা জীবদিগের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যেরও সংস্থান করিয়া দিয়াছে। এই সকল উদ্ভিদগণ স্থলে উঠিবার প্রাক্কালে জলের কিনারায় আসিয়া সর্বপ্রথম লতাগুল্ম ও Algæ প্রভৃতি উদ্ভিদরূপে বাসা বাঁধে। এই সময় ইহাদের শিকড় সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম জলতলের মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারিযাছিল। এই সকল উদ্ভিদগণকে প্রাচীন হিন্দুগণ সমূর্চ্ছজ বা লতাগুল্ম নামে অবিহিত করিতেন।

প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণের মতে এই সকল উদ্ভিদের (ধীরে ধীরে) স্থলে অভিযানকালে তাহাদের পিছু পিছু বহু বহুকোষ রসজ প্রাণিগণও জলের কিনারায় আসিয়া ঐ সকল সমূর্চ্ছজ বা লতাগুল্মের মধ্যে তাহাদের বাসা বাঁধে। এই লতাগুল্মসকল আঁকড়াইয়া ধরিবার সুবিধার জন্যই বোধহয় ইহাদের কয়েকটি কালক্রমে অপাদা বহুকোষ জীব হইতে

গলদা চিংড়ী আদি পাদী বা অঙ্গযুক্ত খোলকী (CRUSTACEA) জীবসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের অঙ্গাদির একটু একটু করিয়া বর্ধন ঘটে। এইজন্য ইহাদের ঐ সকল অঙ্গ আমরা আজও যুক্ত দেখিয়া থাকি। সমূর্চ্ছজ বা লতাগুল্মের মধ্যে জন্ম বলিয়া এই বিশেষ বহুকোষ জীবকে প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ সমূর্চ্ছজ জীবরূপে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানকালীন গলদা চিংড়ী, কাঁকড়া আদি খোলকী জীব প্রভৃতি এই প্রাচীন সমূর্চ্ছজ জীবদেরই বিবিধ প্রকার বংশধর।

[এইবার বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর স্থানবিশেষের জল শুকাইয়া যাওয়া ছাড়া এই উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্থলে উঠিবার অন্য কোনও কারণ ছিল কিনা। সমুদয় সমুদ্রজল শুকাইয়া যাওয়ার প্রশ্ন সম্ভবতঃ উঠে না। একমাত্র সমুদ্র সংলগ্ন নদী ও তড়াগাদি এবং জলাভূমির বদ্ধ জলই মধ্যে মধ্যে শুকাইয়া যাওয়া সম্ভব। এমনও মনে করা যাইতে পারে যে কালক্রমে সমুদ্রের জল অতিরিক্ত লবণাক্ত হইয়া যাওয়ায় কোনও কোনও বহুকোষ জীবগণ পূর্বতন সমুদ্রসুলভ সুমিষ্ট জলের সন্ধানে নদী ও তৎসংলগ্ন তড়াগাদিতে আশ্রয় লইয়াছিল। বহু পণ্ডিত মনে করেন যে নদীর মোহনায় খরস্রোতে স্থির হইয়া থাকিবার জন্য পুরুষানুক্রমে সচেষ্ট হওয়ার কারণে এই বহুকোষ জীবের কতকগুলি শিরদাঁড়ার সৃষ্টি করিয়া মৎস্যজীবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। লবণ জল পরিহার করিয়া মিষ্টি জল সন্ধানে সমর্থ হইবার মত এই মৎস্যজীবে একপ্রকার কেমিকেল সেন্স বা রসায়ন বোধ আজও দেখা যায় যাহা অন্যান্য জীবগণ ইতিমধ্যে (আরও উন্নত হওয়ার কারণে ?) হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই বিশেষ প্রকার রসায়ন বোধ দ্বারা মৎস্যগণ জলে লবণের পরিমাপ নিরূপণ করিতে আজও পর্যন্ত সক্ষম। এই সকল কারণে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, যে সকল বহুকোষ জীব লবণ

জল পরিহার করিয়া নদীর খরস্রোতে বসবাস করিতে থাকে তাহারা হইয়া যায় মৎস্য এবং যে সকল বহুকোষ জীব ঐ একই কারণে নদীর কিনারার জলে লতাগুল্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা রূপান্তরিত হইয়া যায় গলদা চিংড়ী প্রভৃতি খোলকী জীবে। এই কারণে আজও পর্যন্ত এই সকল জীবকে প্রধানতঃ জলের কিনারাতেই লতাগুল্মের মধ্যে অধিক সংখ্যায় বাস করিতে দেখা যায়।

[খুব সম্ভবতঃ এই বহুকোষ জীবগণ তিনটি ধারায় বর্ধিত হইয়া অধুনাদৃষ্ট বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করে। ইহাদের একটি বংশ নদীর খরস্রোতের মধ্যে বাস করিয়া মৎস্যের সৃষ্টি করে। ইহাদের একটি বংশ নদীর কিনারায় লতাগুল্মের মধ্যে বাস করিয়া খোলকী জীবের এবং ইহাদের একটি বংশ স্থলে উঠিয়া কেঁচুয়া প্রভৃতি নুপুরক জীবের সৃষ্টি করে। এই নুপুরক জীব হইতে পরে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইহার পর মৎস্য জীব হইতে উভচর প্রভৃতি বিবিধ অস্থিক জীবের সৃষ্টি হয়।]

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সকল জীব জলাশয় বা নদী আদির কিনারায় লতা গুল্মের মধ্যে বাস করায় খোলকী জীবরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদেরই প্রাচীন হিন্দুগণ সম্মূর্চ্ছজ জীবরূপে অবহিত করিতেন। অধুনাদৃষ্ট গলদা চিংড়ীমাছ প্রভৃতি জীবগণ এই সম্মূর্চ্ছজ জীবগণের বংশধর, এইজন্য ইহাদেরও আর্যঋষিগণ সম্মূর্চ্ছজ জীবগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

এই সকল বিবিধ জননবাচক শব্দ ব্যতীত প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ কর্তৃক উদ্ভিজ্জরূপ একটি শব্দও পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই শব্দটিরও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে উদ্ভিদ জীবের জন্ম ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণের ধারণা ছিল যে, নদীর কিনারার

জলের 'সমূর্চ্ছজ' উদ্ভিদ্‌গণ পরে স্বল্প জলসম্ভূত জলাভূমির উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। এই সকল উদ্ভিদ লাঞ্ছিত জলাভূমিতে প্রথমজাত জীবদের হিন্দুমনীষিগণ বলিতেন উদ্ভিজ্জ জীব।

প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, এইরূপ এক অনুকূল পরিবেশে পৃথিবীর প্রথম উভচর জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্যই সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুগণ ভেক প্রভৃতি উভচর জীবমাত্রকেই উদ্ভিজ্জ জীব নামে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভিজ্জ শব্দটির এইরূপই অর্থ তাঁহারা করিতেন বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আমরা জীবদিগের জনন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্বেদজ, রসজ, সমূর্চ্ছজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি। ঐ সকল শব্দ প্রাচীন হিন্দুগণ ২০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ এবং তৎকাল পর পর্যন্ত অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সকল শব্দসমূহের অর্থ আমরা কয়েকস্থানে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি। ইহার কারণ সম্বন্ধে আমি এইবার আলোচনা করিব।

ইতিমধ্যে ভারত ভূমিতে বহুবিধ ধর্মবিপ্লব সুরু হইয়া যায়। এই সময় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় মানুষের চিন্তাশক্তি পরস্পর বিরোধী ধর্মমত সম্পর্কীয় বাদানু-বাদের মধ্যে মূলতঃ প্রযুক্ত হইতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও এই সময় ভারতীয়গণ বিজ্ঞানের চর্চা একেবারে ভুলিয়া যায় নি। ইহার পর ভারতের বুকে শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীয় আক্রমণ রূপ অপর আর এক অনাসৃষ্টি আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে আত্মরক্ষার্থে বা উহাদের বিতাড়নার্থে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই এই সময় ব্যস্ত ছিল। উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বহু প্রাচীন বিজ্ঞান ভারতবাসিগণ প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ রামায়ণ, মহাভারত রূপ মহাকাব্যদ্বয়ের

কথা বলা যাইতে পারে। এই দুইটি মহাগ্রন্থ এই আপৎকালের সময় বা উহার অব্যবহিত পরে বর্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নামগন্ধ ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ বারংবার রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে ঐ সময়কার হিন্দুগণ তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যও প্রাচীন বিজ্ঞানের ন্যায় প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সকল বিদেশী শাসকরা পরবর্তীকালে কতক বিতাড়িত হইলে এবং কতক ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিলে ভারতভূমিতে খ্রীষ্টীয় জন্মের প্রথম শতক হইতে পুনরায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হইতে থাকে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে বহু জ্ঞান বিজ্ঞান হিন্দুগণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এইজন্য এই সময় প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ নিরূপণার্থে তাহারা বহু পরস্পর বিরোধী ভাষ্য ও টীকা লিখিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় রচিত গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থই আমরা সঙ্কলিত গ্রন্থরূপে দেখিতে পাই। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে ইত্যুক্ত প্রভৃতি শব্দগুলির পুনঃপুনঃ উল্লেখ হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

অবস্থা দৃষ্টে প্রতীত হইবে যে, এই সময় হিন্দুগণ তাহাদের বহু পুরাতন জ্ঞান নূতন করিয়া অর্জন করিতেছিলেন। এইজন্য তাহাদের এই সম্পর্কে বহু ভ্রম বারে বারে করিয়া পরে আবার তাহা আমরা শুধরাইয়া লইতে দেখি।

প্রাচীন শ্লোকগুলিতে স্বেদজ, রসজ, সমূর্চ্ছজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি শব্দগুলির সন্ধান পাইয়া মধ্যযুগীয় হিন্দুগণ উহাদের নূতন করিয়া অর্থ করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু এই সময় তাঁহারা আপন আপন ধারণা মত উহাদের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে অর্থ করিতে থাকেন। যে সকল জীবের বীজ উষ্মাজনিত (heat and moisture) জাত হইত বলিয়া তাহাদের ধারণা হয় তাহাদের তাঁহারা বলিতে থাকেন স্বেদজ জীব। এই সকল মধ্যযুগীয়

মনীষীদের কেহ কেহ সমূর্চ্ছজ জীবকে মৎস্য জীবরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, পচ্যমান সমূর্চ্ছজ নামক লতাগুল্মের তাপে ইহাদের ডিম্ব অধিক সংখ্যায় স্ফুরিত হইয়া ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। রসজ জীবের প্রকৃত অর্থ ইহাদের কেহ দিতে পারেন নি। হেমচন্দ্র ইহাকে মদ্যকীট বলিলেও উহা কি জীব তাহা তিনি বলেন নি। উদ্ভিজ্জ জীব বলিতে ঐ সময়কার কোনও কোনও হিন্দুগণ বলিয়াছেন যে, ভেক প্রভৃতি জীবের বীজ পচ্যমান উদ্ভিদ হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া স্ফুরিত হয় বলিয়া উহারাই উদ্ভিজ্জ জীব।

[দলভ্য ঋষি (১০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দে) উদ্ভিজ্জ শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি যে-জীব দ্রুত অবস্থান্তর (Metaphormic) প্রাপ্ত হয় তাহাদের বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে ভেক, Coccdae প্রভৃতি জীব ভূঁইফোড় উদ্ভিজ্জ জীব। ভেক শৈশবে বেঙাচি অবস্থায় থাকে, পরে লেজ খসাইয়া ভেক হইয়া তারা ডাঙায় উঠে। এই-জন্য দলভ্য ঋষি ইহাদের রূপান্তরক্ষম জীব বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।]

[বীজ ব্যতীত কোনও যোনিজ জীব জাত হইতে পারে না ইহা প্রাচীন হিন্দুগণ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে অবগত থাকিলেও (উপনিষদ্), ভারতের উপরোক্ত বিদেশী শাসনকালে উহা পরবর্তীকালীন হিন্দুগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ অর্জিত ঐ সত্য তাঁহারা যে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই প্রবন্ধের পরিশেষে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিব। এক্ষণে এই বিশেষ সত্য সম্বন্ধে পরে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় হিন্দু মনীষিগণ সাধারণভাবে ইহাদের সকলকে অণ্ডজ জীব না বলিয়া স্বেদজ, রসজ, সমূর্চ্ছজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি

সত্যাসত্য নিরূপিত হইয়া থাকে। জীবের ক্রমবিকাশের ন্যায় মতা-মতেরও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে।

এই সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ 'উদ্ভিজ্জ' ও 'স্বেদজ' শব্দ দুইটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই দুইটি শব্দ লইয়া মধ্যযুগীয় হিন্দুদের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হইয়াছিল। মনীষী শঙ্করের মতে 'উদ্ভিজ্জ' জীব বা ভেক পচ্যমান জলীয় উদ্ভিদ হইতে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য উহাদের 'উদ্ভিজ্জ' বলা হইয়াছে। [উদ্ভিদ স্থাবরং ততো জাতম উদ্ভিজ্জম্]। মনীষী চরক এই সম্পর্কে মনীষী শঙ্করের মতে মত দিয়াছেন, কিন্তু সুশ্রুত ও দলভ্যের মতে ইহারা ভেকের ন্যায় Metamorphic বা রূপান্তরক্ষম জীব। অর্থাৎ ইহারা শৈশবে এক রূপ এবং বয়ঃ কালে অপর রূপ প্রকাশক। উদ্ভিজ্জ জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার স্বেদজ জীব সম্বন্ধে বলিব। সম্ভবতঃ কোনও কোনও হিন্দুর একদা ধারণা ছিল উষ্মাজনিত পচ্যমান দ্রব্য হইতে ইহাদের জন্ম, যদিও প্রাচীন হিন্দুগণ ১৫০০—১২০০ খ্রীঃ পূঃ কালে বলিয়া গিয়াছেন যে, এই জীবের মূল কারণ বীজ। এই সম্পর্কে ছান্দোগ্য প্রপ্যর্তক ও ভাগবত দ্রষ্টব্য। (অণ্ডোজোদ্ভি-জ্জয়োরেব যথাসম্ভব-মন্ত র্ভাব]—অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ এবং অণ্ডজ, এই উভয়ে স্বেদজ জীবও বটে। ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে এই যে, আমরা পচ্য-মান উদ্ভিদাদি হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে দেখি বটে, কিন্তু উহা বীজ ব্যতিরেকে কদাচ জন্মিতে পারে না। এই সম্পর্কে পাতঞ্জল ঋষির মতবাদটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার মহাভাষ্যে (১৬০ খ্রীঃ পূঃ) বলিয়াছেন যে, দূর্বাঘাস জীবজন্তুর স্তূপীকৃত কেশ হইতে জন্মায় এবং বৃশ্চিক প্রভৃতি পচ্যমান গোময় হইতে বাহির হইয়া আসে। পাতঞ্জল ঋষি প্রাচীন সাংখ্য বেদান্ত মতবাদের অনুকরণে—ইহাও বলিয়াছেন যে, এক হইতে অপরটা জন্মায় না, এক হইতে অপরটি

বহির্গত—[অবক্রমাস্তি] হইয়া আসে মাত্র। [কথং গোময়াদ্ বিশ্চিকা জায়তে গোলোমাবিলেমেভ্য—দূর্বাং জায়তে,—ইতি অবক্রমাস্তি না বস্তুভ্য, —মহাভাষ্য ১—৪—৩]। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিব যে হিন্দুগণ অবগত ছিলেন যে এক এক প্রকার বীজ এক এক প্রকার উত্তাপের দ্বারা স্ফুরিত হইয়া থাকে। এক এক প্রকার জীবের বীজ এক এক প্রকার পচ্যমান বস্তু বা উদ্ভিদ হইতে তাপ সংগ্রহ করে এবং উহার অভাবে ঐ বীজগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। দলভ্য ঋষির মতে স্বেদজ জীব মৃত্তিকা এবং জীবদেহ প্রভৃতি হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করে। [স্বংস্বেদজাঃ ভূবঃ শরীরস্য চ স্বংস্বেদাত্ উষ্মনঃ জাতাঃ।] এই স্বেদজ জীবের অন্তর্গত ক্রিমিজীব কোষ্ঠাভ্যন্তরে অবস্থিত পূরীষ বা মল হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া বীজ স্ফুরণ করে। [ক্রমায়ঃ কোষ্ঠপূরীষাদি বাষ্প সম্ভবাঃ, ইতি দলভ্যঃ]। জীবের মৃতদেহ হইতেও এই সকল জীবের বীজ স্ফুরিত হইয়া থাকে। [শর—সুশ্রুত ; Cf. শরীরে কিয়দ্ বৈলান্তরং সমুতপন্নাং ক্রম্যাদীনাং কথং চৈতন্যম্—গুণরত্ন, তর্করহস্যদীপিকা, জৈনমতম্]। পচ্যমান দুধ এবং দধি হইতেও ইহাদের বীজ স্ফুরিত হইয়া থাকে। [বর্ষাসু চ স্বেদাদিনা অনাতিদবয়োসৈব কালেন দধ্যাহ্বয়বা উপলভ্যন্তে ; জয়ন্ত ন্যায় মঞ্জুরী, অনিকা ৭ ভূতচৈতন্যপক্ষ।] দলভ্য ঋষির মতে বৃশ্চিক ষড়বিন্দু (ছয় বিন্দুযুক্ত বিষাক্ত কীট) প্রভৃতি জীব উষ্মা দ্বারা স্ফুরিত হয়। [কীটা বৃশ্চিক ষড়বিন্দু প্রভৃতয়ঃ] এবং বৃশ্চিকের বীজ গোময়, সর্পের বিষ্ঠা, পচ্যমান কাষ্ঠ হইতে তাপ গ্রহণ করে। [কথং গোময়াদ বৃশ্চিকা জায়তে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যে,—১—৪—৩ এবং সুশ্রুত কল্পস্থান—৭ অঃ] দলভ্য ঋষির মতে পিপীলিকাদি কীট ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং উহাদের ঐ ডিম্ব উষ্মার সাহায্যে স্ফুরিত হয়। এই কারণে তিনি এই জীবকে স্বেদজ ও অণ্ডজ—এই উভয় নামেই অভিহিত

করিয়াছেন, আবার এই একই জীবকে তিনি উদ্ভিজ্জ বলিয়াও অবিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি কোনও কোনও পিপীলিকা বা অনুরূপ জীবের শূক কীট দেখিয়া থাকিবেন। এই শূককীট (Larva) হইতে এক শ্রেণীর পিপীলিকা জাত হইতে দেখিয়া, তিনি এই শ্রেণীর পিপীলিকাকে উদ্ভিজ্জ বা ভেকের ন্যায় রূপান্তরক্ষম জীব বলিয়া থাকিবেন [স্বংস্বেদনেশ্চাপি কশ্চিত পিপীলিকা অণ্ডজা উদ্ভিজ্জাশ্চ]—এই শ্লোকে উল্লিখিত 'কশ্চিত পিপীলিকা' বাক্যটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। এই কারণে, দলভ্য এই বিশেষ শ্রেণীর পিপীলিকাকে একাধারে উদ্ভিজ্জঃ, স্বেদজঃ এবং অণ্ডজঃ জীব বলিয়াছেন। দলভ্যের মতে মশক, ডাঁশ [দংশমশকাদায়] প্রভৃতি জীবও এইরূপ এক একটি স্বেদজ জীব। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি এই মশক প্রভৃতি জীবেরও শূককীট বা Larva দেখিয়াছিলেন।

উপরোক্তরূপ আলোচনা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ প্রাণিদিগের জনন বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের কাহারও সন্দেহের উদ্রেক হয়। সত্যান্বেষী ঋষিগণ অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁহাদের এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে উহাদের কয়েকটি জীব হয়তো যৌনিসংকর (cross division)। দলভ্য নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছেন; পক্ষীদের মধ্যে বলাকা একটি জীব—কিন্তু উহাদের কেহ কেহ শাবক উৎপন্ন করে, কেহ কেহ অণ্ড উৎপন্ন করে। তাহা হইলে ইহারা কোন্ বিভাগীয় জীব হইবে? [পক্ষীষু বলাকা জরায়ুজা অণ্ডজাশ্চ]। সর্পদের মধ্যে অহিপতকা নির্বিষ (Colubrines) সর্প। ইহারা শাবক উৎপন্ন করিয়া থাকে—তাহা হইলে ইহারা কোন্ জীব? পিপীলিকা স্বেদজ জীব হইয়াও ডিম্ব পাড়ে, কিন্তু তাহারা উদ্ভিজ্জ-রূপেও প্রকাশ পায়। এইখানে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, দলভ্য

এক শ্রেণীর পিপীলিকা বা অনুরূপ জীবের শূককীট দেখিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, [স্বেদজেভ্যেবপি কশ্চিত পিপীলিকা অণ্ডজা উদ্ভিজ্জাশ্চঃ]। কোনও অণ্ডজ জীব যে ডিম্বের বদলে সরাসরি শাবক উৎপন্ন করে, এই কথা অসত্য নয়। 'র‍্যাটল্' সাপ সরাসরি বাচ্চা পাড়িয়া থাকে। কোনও কোনও পক্ষীর পক্ষেও সরাসরি বাচ্চা উৎপাদন করা অসম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে ইহাদের ডিম্ব দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া গিয়া এখানেই শাবক উৎপাদন করে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকদের মতে খাদ্যের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্য ও উহার অন্যান্য তারতম্যের কারণে এইরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে, বলাকা অর্থে দলভ্য কোন্ জীব বুঝিয়াছেন—তাহা বলা দুষ্কর। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে এক প্রকার ভেকও আছে যাহাদের ডিম্ব বেঙাচী (Tadpole) উৎপাদন না করিয়া সরাসরি শাবক বা Frogling প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ উহাদের যা কিছু জৈব পরিবর্তন তাহা দেহাভ্যন্তরেই ঘটিয়া থাকে।

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টি হইতে বুঝা যায় যে, জীব মাত্রেরই স্ফুরণের জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ বিশেষ-রূপে অনুধাবন করিতেন। বহু মৎস্য এবং কীটাদি জীব বাছিয়া বাছিয়া এমন স্থানে ডিম্ব রক্ষা করে যেখানে পচ্যমান বস্তু আছে। সকল সময় ডিম্ব রক্ষার জন্য এইরূপ উপযুক্ত তাপমান স্থান তাহারা আবিষ্কার করিতে পারে নি, এইজন্য বংশরক্ষার কার্যও তাহাদের ব্যাহত হইয়াছে। এইজন্য নিরস্থিক জীবগণ এবং মৎস্যজীবগণ বহুল সংখ্যায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র ডিম্ব বা বীজসমূহের মধ্যে যে-গুলি সৌভাগ্যক্রমে পচ্যমান দ্রব্যসমূহে পতিত হয়, একমাত্র সেই-গুলি স্ফুরিত হইয়া জীবদেহে রূপান্তরিত হয় বা হইতে পারে।

এই তাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা জীবদিগের সন্তান লালন-পালন রীতি সম্বন্ধেও বহু গবেষণা করেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল এবং কিরূপ নিবিড় পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহারা উহা অর্জন করিতেন—তাহা নিম্নের শ্লোক দুইটি হইতে বুঝা যাইবে। প্রথম শ্লোকটি পদ্মপুরাণ হইতে (৯০০-১৪০০ খ্রীঃ অঃ) এবং দ্বিতীয়টি মহাভারত (৪০০ খ্রীঃ পূঃ—৪০০ খ্রীঃ অঃ) হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"দর্শন ধ্যানসাং স্পর্শের্মীন কূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ।
পুষন্তি-স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ।"

—পদ্মপুরাণ

"মনসা স্নেহপূর্ণেন যন্ন স্মরসি কেশব।
কূর্ম্মানামিব শরণাং তেন জীবামহে বয়ম॥"

মহাভারত (বনপর্ব)।

শ্লোক দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, মৎস্যগণ কেবলমাত্র দর্শন দ্বারা সন্তান পালন করিয়া থাকে। এমন বহু মৎস্য আছে যাহারা দৃষ্টি দ্বারা সন্তানদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া সর্বদাই কাছে কাছে থাকিয়া তাহাদের পালন করে। ইহাদের কেহ কেহ শাবক উৎপাদনের সময় জলের মধ্যে বিশেষ একটি এলাকা অধিকার করিয়া থাকে এবং সেই এলাকায় অন্য কোন মৎস্য আসিলে তাহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। মৎস্য শিশুগণ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এই এলাকার মধ্যেই বাস করে এবং মৎস্য ঐ শাবকদের কখনও চক্ষের বহির্ভূত হইতে দেয় না। এই সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য চিত্র উদ্ধৃত করা হইল। সাধারণভাবে মৎস্যদের পক্ষে তাহাদের শাবকদের মধ্যে মধ্যে দর্শন দেওয়া ছাড়া

স্বল্প পরিসর স্থানে দৃষ্টি সহাযোগে সন্তান পালন

আর বিশেষ কিছু করিবারও থাকে না। এই শ্লোক দুইটিতে আরও বলা হইয়াছে যে, কূর্ম প্রভৃতি সরীসৃপ জীবগণ ধ্যান দ্বারা সন্তান পালনাদি কার্য করিয়া থাকে। এই বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে সরীসৃপগণ ডিম্ব প্রসব করিয়াই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। তাহাদের ঐ ডিম্ব ও তৎজাত শাবকের ললাটে কি হইল বা না হইল তৎসম্পর্কে তাহারা কোনও খবরই রাখে না। [অবশ্য মলয়ের ন্যায় দুই এক জাতীয় সর্প ডিম্ব রক্ষা ও বাচ্চা পালন করে বলিয়া জানা গিয়াছে।] এতদ্ব্যতীত প্রাচীন টীকাকারগণের মতে এই কূর্ম ও কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ তাহাদের ডিম্ব মাটিতে বা বালুতে পুঁতিয়া রাখিয়া পাহারা দিবার জন্য নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সাময়িকভাবে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও পুনরায় তাহারা সেই স্থানে ফিরিয়া আসে। অবশ্য ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিজে এখনও যাচাই করিয়া দেখিতে পারি নি। তবে ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বালুর ও মাটির উত্তাপ হইতে ঐ ডিম্ব তাপ সংগ্রহ করে। প্রাচীন হিন্দুদের মতে স্ব স্ব সন্তানদের জন্য চিন্তা (?) করা ছাড়া তাহাদের আর কিছু করিবারও নাই। এই শ্লোকে আরও বলা হইয়াছে যে, পক্ষিগণ স্পর্শ দ্বারা ডিম্ব স্ফুরণ করে। পক্ষী ডিম্ব যে পক্ষীর স্পর্শজনিত তাপ সংগ্রহ করে তাহা সকলেই জানেন। ঐরূপ স্পর্শ দ্বারা উহারা তাহাদের শাবকও লালন-পালন করিয়া থাকে।

জরায়ুজ

জরায়ুজ পরিভাষাটি ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে উপনিষদের যুগে সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়। যে সকল জীবের বীজ জরায়ুর অভ্যন্তরে জাত, স্ফুরিত ও বর্ধিত হয়, তাহাদের হিন্দু ঋষিগণ বলিতেন জরায়ুজ জীব। আর্য-ঋষি-গণের মতে পশু, মনুষ্য, ব্যাল বা হিংস্র জন্তু, মৃগ প্রভৃতি উভতোদতঃ জীব, রাক্ষস, মনুষ্য, পিশাচ—এই জরায়ুজ জীবের অন্তর্গত। সুশ্রুত এবং মনুসংহিতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুশ্রুতোক্ত শ্লোকটি ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মনুসংহিতা হইতে এই সম্পর্কে অপর একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"পশবশ্চ মৃগশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসিচ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥

মনুসংহিতা।

এইখানে রাক্ষস বলিতে আদিম মানব বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মাংসভোজী বন্যমানুষ পুরাকালে বহু সংখ্যায় বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। অধুনাকালে, উহাদের কতক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি সভ্যতার আবহাওয়ায় পড়িয়া মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর এই পিশাচ শব্দটি দ্বারাও কোনও এক কল্পিত জীব বুঝায় না। ইহারা রাক্ষসেরও পূর্বেকার কোনও অতি অসভ্য মানুষ হইলেও হইতে পারে, ঋক্‌বেদের যুগে হয়ত ইহাদের নিঃশেষিত প্রায় বংশের দুই এক ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত জীবিত ছিল। এই শ্লোকটিতে রাক্ষস ও পিশাচের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, মনুসংহিতাও একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ।

এই জরায়ুজ জীবদিগকে সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুগণ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিতেন, যথা জীবজ এবং পোতজ। জীবজ অর্থে যে সকল জীব জরায়ু অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে এবং যাহাদের জন্মের পর দেহের সহিত ফুল (Placenta) সংলগ্ন থাকে তাহাদের বুঝায়; পোতজ অর্থে যে সকল জীব জরায়ু অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহাদের ফুল জন্মের সহিত নির্গত হয় না তাহাদের বুঝায়। যাহাদের ফুল শাবক জন্মের কিছু পরে নির্গত হয় তাঁহাদের মতে উহারাও পোতজ জীব।

পরবর্ত্তীকালে জৈন পণ্ডিত উমাস্মতিও (৪০ খ্রীঃ অঃ) জীবদিগের এই জনন বিভাগ সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা করেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত ভাষ্যটি হইতে ইহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

জরায়ুজানাং মনুষ্য-গো-মহিষা-জাবিকাশ্চ খরোষ্ট্র-মৃগ-বরাহ-গবয়-সিংহ-ব্যাঘ্রঋ-দ্বীপী-শ্ব-শৃগাল-মার্জ্জারাদীনাম্। (২) অণ্ডজানাং সর্প-গোধা- কৃকলাস-গৃহগোলিকা- মৎস্য-কূর্ম্ম-নক্র- শিশুমারাদীনাম্। পক্ষীনাঞ্চ লোমপক্ষীনাং হংস-চাষ-শুক-গৃধ্র-শ্যেন-পারাবত-কাক-ময়ুর-মদগু-বক-বলাকাদীনাম্। (৩) পোতজানাং শল্লক-হস্তি শ্বাবিল্লাপক-শশ-শায়িকা-নকুল-মুষিকাদীনাম্ চর্ম্মপক্ষাণাং চ পক্ষাণাং জলুকা-বল্-গুলিভারাণ্ড-পক্ষিবিড়ালাদীনাং গর্ভে জন্ম।—উমাস্মতি, অধ্যায় ২ সূত্র ৩৪।

জরায়ুজ জীব বলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন ঋষিগণ যে-সকল জীব জরায়ু অভ্যন্তরে জন্ম গ্রহণ করে তাহাদেরই বুঝিতেন। কিন্তু এইখানে

জরায়ুজ শব্দটা এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। এইখানে জরায়ুজ অর্থে যে সকল জীব জরায়ু অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে এবং তৎসহ যাহাদের জন্মের পর দেহের সহিত ফুল (Placenta) সংলগ্ন থাকে, তাহাদেরই মাত্র বুঝান হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল জীবকে জীবজ আখ্যা দিয়া উহা জরায়ুজের একটি উপবিভাগ রূপে ব্যবহার করিতেন। উমাস্বতি কেন এই জীবজ বা অনুরূপ শব্দ এই সম্পর্কে ব্যবহার করেন নাই, তাহা বলা বড় দুষ্কর।

উমাস্বতির উপরিউক্ত ভাষ্য হইতে আমরা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষারও সন্ধান পাই। যথা, গবয় বা Ungulata, চর্মপক্ষ বা Chiroptera, শল্লক বা Rodentia ইত্যাদি।

উমাস্বতি নিম্নলিখিত জীব কয়টিকে জরায়ুজ জীবের (জীবজ ?) অন্তর্গত এক একটি জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) মানুষ (২) গরু (৩) মহিষ (৪) ছাগ, মেষ (৫) অশ্ব (৬) গর্দভ (৭) উষ্ট্র (৮) হরিণ (৯) যুক বা চমর (১০) গবয় (১১) সিংহ (১২) ব্যাঘ্র (১৩) ভল্লুক (১৪) দ্বীপী (১৫) শূকর (১৬) শৃগাল (১৭) মার্জার বা বিড়াল (১৮) কুকুর।

এই তালিকার মধ্যে বানরের নাম উল্লেখ না থাকিলেও উহাকেও ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পোতজ বলিতে জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি যে সকল জরায়ুজ জীবগণের ফুল (Placenta) জন্মের কিছু পরে পড়ে এবং যাহাদের ফুল দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে না তাহাদেরই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মানুষ, বাঁদর এবং ক্রব্যাদ বা হিংস্র জন্তু (Carnivora) ব্যতিরেকে অপরাপর উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদের অন্তর্গত প্রায় সকল জীববংশকেই জৈন পণ্ডিতগণ এই পোতজ জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। উপরি-

উক্ত ভাষ্যটি হইতে বুঝা যাইবে যে, নিম্নলিখিত জীবগুলিকেও তাঁহারা পোতজ জীব বলিতেন।

(১) শল্লক বা Rodentia জীব (২) স্ববিত্ত এবং লাপক আদি কীটভুক (৩) শশ শয়িকা অর্থাৎ শশক প্রভৃতি (৪) নকুল বা বেজী। [নকুল হিংস্র বা ক্রব্যাদ জীব কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাকে পোতজ জীবের অন্তর্গত করা হয়েছে।] (৫) মূষিক (৬) বাদুড় আদি চর্মপক্ষ পক্ষী (Chiroptera), যথা—ভল্গুলি (উড়োশিয়াল), পক্ষী-বিড়াল (উড়ো বিড়াল), জলৌকা, এক প্রকার রক্ত শোষক বাদুড়। [এই রকম বাদুড় পূর্ব-পৃথিবীতে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।] এইভাবে আমরা দেখিতে পাই Proboscodea বা শুণ্ডক জীবগণ Rodentia, Insectivora বা কীটভুক জীবগণ এবং চর্মপক্ষ বা Chiroptera জীবগণ এই পোতজ জীবের অন্তর্গত এক একটি জীববংশ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে সকল জীবগণের ফুল বা Placenta তাহাদের শাবক সহ গর্ভ হইতে নির্গত হয় না অর্থাৎ যে সকল জীবের ফুল শাবক জন্মের কিছু পরে গর্ভ হইতে নির্গত হয় তাহাদেরই জৈন পণ্ডিতগণ পোতজ বলিয়াছেন। অপরদিকে তাঁহারা বলিয়াছেন, জরায়ুজ জীবদিগের জন্মকালে এই ফুল শাবক দেহে সংলগ্ন থাকিয়াই নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই যদি তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে ক্রব্যাদ বা Carnivora জীব, মানুষ এবং বানর জীবদেরও তাঁহারা পোতজ বলিয়া অভিহিত করেন নাই কেন? তাহা বলা বড়ই দুষ্কর। সম্ভবতঃ, মানুষের জন্মকালে তাঁহারা এই ফুল দেহের সহিত সংলগ্ন থাকিয়াই নির্গত হইতে দেখিয়াছেন। অপরদিকে তথাকথিত পোতজ জীবদের জন্ম তাঁহারা সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে না পারিয়া হয়তো মনে করিতেন যে উহাদের জন্মকালে ফুল আদৌ নির্গত হয় না।

জরায়ুজ শব্দটা এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। এইখানে জরায়ুজ অর্থে যে সকল জীব জরায়ু অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে এবং তৎসহ যাহাদের জন্মের পর দেহের সহিত ফুল (Placenta) সংলগ্ন থাকে, তাহাদেরই মাত্র বুঝান হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল জীবকে জীবজ আখ্যা দিয়া উহা জরায়ুজের একটি উপবিভাগ রূপে ব্যবহার করিতেন। উমাস্বতি কেন এই জীবজ বা অনুরূপ শব্দ এই সম্পর্কে ব্যবহার করেন নাই, তাহা বলা বড় দুষ্কর।

উমাস্বতির উপরিউক্ত ভাষ্য হইতে আমরা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষারও সন্ধান পাই। যথা, গবয় বা Ungulata, চর্মপক্ষ বা Chiroptera, শল্লক বা Rodentia ইত্যাদি।

উমাস্বতি নিম্নলিখিত জীব কয়টিকে জরায়ুজ জীবের (জীবজ ?) অন্তর্গত এক একটি জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(১) মানুষ (২) গরু (৩) মহিষ (৪) ছাগ, মেষ (৫) অশ্ব (৬) গর্দভ (৭) উষ্ট্র (৮) হরিণ (৯) যুক বা চমর (১০) গবয় (১১) সিংহ (১২) ব্যাঘ্র (১৩) ভল্লুক (১৪) দ্বীপী (১৫) শূকর (১৬) শৃগাল (১৭) মার্জার বা বিড়াল (১৮) কুকুর।

এই তালিকার মধ্যে বানরের নাম উল্লেখ না থাকিলেও উহাকেও ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পোতজ বলিতে জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি যে সকল জরায়ুজ জীবগণের ফুল (Placenta) জন্মের কিছু পরে পড়ে এবং যাহাদের ফুল দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে না তাহাদেরই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মানুষ, বাঁদর এবং ক্রব্যাদ বা হিংস্র জন্তু (Carnivora) ব্যতিরেকে অপরাপর উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবদের অন্তর্গত প্রায় সকল জীববংশকেই জৈন পণ্ডিতগণ এই পোতজ জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। উপরি-

উক্ত ভাষ্যটি হইতে বুঝা যাইবে যে, নিম্নলিখিত জীবগুলিকেও তাঁহারা পোতজ জীব বলিতেন।

(১) শল্লক বা Rodentia জীব (২) শ্ববিত্ত এবং লাপক আদি কীটভুক (৩) শশ শয়িকা অর্থাৎ শশক প্রভৃতি (৪) নকুল বা বেজী। [নকুল হিংস্র বা ক্রব্যাদ জীব কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাকে পোতজ জীবের অন্তর্গত করা হয়েছে।] (৫) মূষিক (৬) বাদুড় আদি চর্মপক্ষ পক্ষী (Chiroptera), যথা—ভল্গুলি (উড়োশিয়াল), পক্ষী-বিড়াল (উড়ো বিড়াল), জলৌকা, এক প্রকার রক্ত শোষক বাদুড়। [এই রকম বাদুড় পূর্ব-পৃথিবীতে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।] এইভাবে আমরা দেখিতে পাই Proboscodea বা শুণ্ডক জীবগণ Rodentia, Insectivora বা কীটভুক জীবগণ এবং চর্মপক্ষ বা Chiroptera জীবগণ এই পোতজ জীবের অন্তর্গত এক একটি জীববংশ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে সকল জীবগণের ফুল বা Placenta তাহাদের শাবক সহ গর্ভ হইতে নির্গত হয় না অর্থাৎ যে সকল জীবের ফুল শাবক জন্মের কিছু পরে গর্ভ হইতে নির্গত হয় তাহাদেরই জৈন পণ্ডিতগণ পোতজ বলিয়াছেন। অপরদিকে তাঁহারা বলিয়াছেন, জরায়ুজ জীবদিগের জন্মকালে এই ফুল শাবক দেহে সংলগ্ন থাকিয়াই নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই যদি তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে ক্রব্যাদ বা Carnivora জীব, মানুষ এবং বানর জীবদেরও তাঁহারা পোতজ বলিয়া অভিহিত করেন নাই কেন? তাহা বলা বড়ই দুষ্কর। সম্ভবতঃ, মানুষের জন্মকালে তাঁহারা এই ফুল দেহের সহিত সংলগ্ন থাকিয়াই নির্গত হইতে দেখিয়াছেন। অপরদিকে তথাকথিত পোতজ জীবদের জন্ম তাঁহারা সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে না পারিয়া হয়তো মনে করিতেন যে উহাদের জন্মকালে ফুল আদৌ নির্গত হয় না।

এই যোনিজ বিভাগ সম্বন্ধে সমুদয় শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া কিন্তু প্রতীত হইবে যে "জরায়ু" শব্দটি অর্থে যে সকল জীবগণ জরায়ুর অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের সকলকেই বুঝাইয়া থাকে, এবং জীবজ এবং পোতজ শব্দটি বরং এই জরায়ুজ জীবের উপবিভাগ বুঝাইবার জন্যই অধিকাংশ পণ্ডিতগণ ব্যবহার করিযাছেন। পোতজ অর্থে সম্ভবতঃ যে সকল জীবের জন্মের সহিত ফুল পড়ে না বা উহা পরে পড়ে তাহাদের এবং জীবজ শব্দটি অর্থে যে সকল জীবের জন্মের সময় ফুল পড়ে তাহাদের বুঝাইত।

অণ্ডজ

অণ্ডজ পরিভাষাটিও জরায়ুজ প্রতিশব্দের স্থায় ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে উপনিষদের যুগে প্রথম সৃষ্ট হয়। যে সকল উন্নত জীবের বীজ ডিম্বের স্থায় আয়তনে বৃহদাকার হয়, এবং যাহারা ঐরূপ ডিম্বের মধ্যে জাত, স্ফুরিত ও বর্ধিত হয় তাহাদের বলা হইয়াছে অণ্ডজজীব। প্রাচীন হিন্দুগণ প্রকৃত মৎস্য, পক্ষী ও সর্প আদি সরীসৃপদের অণ্ডজ জীব বলিতেন। নিম্নের শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে মনুসংহিতা প্রণেতার মতে, পক্ষী, সর্প স্থলজ জীব এবং মৎস্য, কূর্ম ও কুম্ভীরাদি জলজ জীব যাহারা বৃহদাকার ডিম্ব প্রসব করে তাহাদের অণ্ডজ জীব বলা হয়। উপরোক্ত একটি শ্লোকে সুশ্রুতও বলিয়াছেন যে, খগ (পক্ষী), সর্প আদি সরীসৃপ জীব হইতেছে অণ্ডজ জীব। এই সম্পর্কে মনুসংহিতায় উল্লিখিত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"অণ্ডজাঃ পক্ষীনঃ সর্পনক্রামৎস্যাশ্চকচ্ছপাঃ
যানি চৈবং প্রকারানি স্থলজাম্যোদকানীচ। —মনুসংহিতা।

এই শ্লোকটি হইতে আমরা আরও দুইটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সন্ধান পাই। যথা, জলজ (ঔদক) বা Aquatic animal এবং স্থলজ বা Terrestorial বা Land animal-এই জলজ ও স্থলজ শব্দ দুইটি আমরা আরও বহু প্রাচীন শ্লোকে পাইয়াছি।

মনুসংহিতায় উল্লেখিত শ্লোক কয়টি ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থের শ্লোকসমূহেও আমরা এই অণ্ডজ ও জরায়ুজ পরিভাষার উল্লেখ দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত উপরি উদ্ধৃত আখ্যান ভাগে জৈন পণ্ডিত উমাস্বতিও এই অণ্ডজ বিভাগটি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্প, গোধা, কৃকলাস (ইং চ্যামেলিয়ন), গৃহগোলিকা (ইং হাউস-গ্লোকোস), মৎস্য, কূর্ম, নক্র ও শিশুমার প্রভৃতি অণ্ডজ জীব, তাঁহার মতে এই সকল জীব ডিম হইতে জাত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জৈন

পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষিগণ (লোমপক্ষ), যথা,—হাঁস, চাষ, শুক, গৃধ্র, শ্যেন, পারাবত, কাক, ময়ুর, মদগু, বক, বলাকা প্রভৃতি জীবগণও অণ্ডজ জীব। কারণ এই সকল জীবগণও অণ্ড হইতে জাত হয়।

উপরোক্ত শ্লোক কয়টি হইতে আমরা যে সকল জনন সম্পর্কীয় শ্রেণীবাচক শব্দ পাইয়াছি তাহাদের একত্রে সঙ্কলিত করিয়া নিম্নের তালিকাতে সন্নিবেশিত করা হইল :—
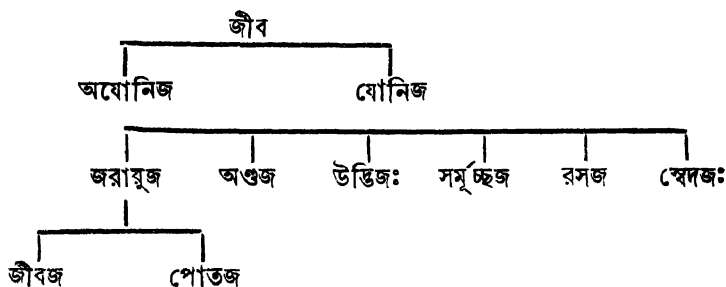
সম্ভবতঃ বুঝিবার সুবিধার জন্য পরবর্তীকালে পক্ষী, সর্প প্রভৃতির বৃহদাকার ডিম্বকে অণ্ড এবং অন্যান্য জীবের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ডিম্বকে বীজ নামে অভিহিত করা হইত। এই অণ্ডের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, উহাদের আকার বর্তুল ও পেশীর ন্যায় হইয়া থাকে। দলভ্য ঋষির 'অণ্ডং পেশয়াকার বর্তুলং' এই উক্তি এবং শ্রীধর রচিত কণ্ডলী উক্ত 'অণ্ডং বিম্বং তেন বেষ্টিতং জায়তে তত অণ্ডজং পৃথিবী নিরূপণং পৃথিবী' ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায়। এই অণ্ডের ন্যায় জরায়ুর স্বরূপ সম্বন্ধেও প্রাচীন হিন্দুদের সম্যক্ রূপ ধারণা ছিল। উদয়ন তাহার কিরণবলী টীকাতে এবং শ্রীধর তাঁহার 'কণ্ডলী' পুস্তকে জরায়ু সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—'গর্ভে বেষ্টন্-চর্মপুটকং জরায়ুঃ জরায়ুরিতি গর্ভেশয়স্য অভিধানং তেন বেষ্টিতং জায়তে' ইতি জরায়ুজম্।

জীবাণু-বিদ্যা

ক্ষুদ্রতম জীব বা এককোষ প্রাণীকে জীবাণু বলা হইয়া থাকে। এই জীবাণু শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুপরিচিত শব্দ। ভাগবতকার (৫০০-৬০০ খ্রীঃ) এই প্রাণীটিকে 'ব্যাষ্টি-প্রাণ' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। এই কারণে এই বিদ্যাকে ব্যাষ্টি-বিদ্যাও বলা যাইতে পারে, আধুনিক পণ্ডিতগণ এই বিদ্যার নাম দিয়াছেন প্রোটোজুয়ালজী।

এই বিদ্যার আমরা প্রথম পরিচয় পাই অথর্ববেদে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ), পরে আমরা ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখি চরকে। চরক ও সুশ্রুতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উৎকর্ষতা হইতে বুঝা যায় যে, উহাদের আলোচ্য বিষয় খ্রীষ্টপূর্বকাল হইতে সৃষ্ট হইতেছিল, তাহা না হইলে ঐ সকল জ্ঞান অতো উৎকৃষ্টরূপে ঐ সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতে পারিত না। বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথম আলোচনা আমরা অথর্ববেদেতেই পাই। বর্তমানকালে আমরা যে চরক গ্রন্থ দেখি তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে মূল চরকসংহিতা হইতে দিধবল কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। মূল চরকসংহিতাটি আবার সম্রাট কনিষ্কের (৭৪ খ্রীঃ) গুরু চরক কর্তৃক আত্রেয় পুনর্বসুর শিষ্য অগ্নিবেশ রচিত একটি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে সংক্ষিপ্তকারে সঙ্কলিত হয়। অনুরূপভাবে বর্তমানাকারে আমরা যে সুশ্রুত গ্রন্থ দেখিতে পাই উহা ধন্বন্তরীর শিষ্য সুশ্রুত রচিত বৃদ্ধ সুশ্রুত গ্রন্থ হইতে নাগার্জুন কর্তৃক সংক্ষিপ্ত আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। যতদূর বুঝা যায় এই চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ দুইটি পূর্বতন চিকিৎসাশাস্ত্রসমূহ হইতে খ্রীষ্টপূর্বজন্মের প্রথম শতক হইতে দ্বিতীয়

শতকের মধ্যে বর্তমান আকারে রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ যে আরব দেশের মধ্যমে য়ুরোপেও প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে।

'উয়ুন্-উল্ অম্বা ফিতুল কাতুল অৎবা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বোগ্‌দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন। 'সরক্', 'সর্‌স্দ' ও 'যেদাদ' নামক তিনখানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আরব দেশে নীত হয়। উক্ত তিনখানি গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান নামের অপভ্রংশ। [Asiatic Res. Vol. XII]

উপরোক্ত তথ্য হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষে এই জীবাণু-বিদ্যার চর্চা ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্ট জন্মের প্রথম বা দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে Leeuwenhoek সাহেব নামক জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত ১৬৭৫ খ্রীঃ অঃ বৃষ্টির জলে এই এককোষ প্রাণীকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং ইহার বহু পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সকল জীবদিগকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ও তৎসহ উহাদের বিবিধ বাসস্থান সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিয়াছিলেন।

প্রারম্ভে হিন্দুমনীষিগণ জীবাণু-বিদ্যাকে (Protozoology) কৃমিবিদ্যার অন্তর্গত একটি বিদ্যা মনে করিতেন ; এমন কি কীটবিদ্যাকেও (Entomology) কৃমিবিদ্যার অন্তর্গত একটি বিদ্যা মনে করা হইত। বলা বাহুল্য যে, চিকিৎসা-বিদ্যার সৃষ্টির সহিত প্রাচীন কৃমিবিদ্যার প্রথম সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য এই কৃমিবিদ্যা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কৃমিবিদ্যা (Helminthology), 'কীটবিদ্যা' (Entomology) এবং 'জীবাণু-বিদ্যা' (Protozoology) নামে তিনটি পৃথক বিদ্যার সৃষ্টি করে। এই সকল জীবাণু প্রাণিদিগের মধ্যে যাহারা জীবদেহে স্থান করিয়া

লইয়াছিল, পরবর্তীকালে তাহাদের বলা হইত 'বীজাণু'। এই 'বীজাণু' শব্দটাও সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুপরিচিত শব্দ। এই জন্য এতৎ সম্পর্কীয় জ্ঞানকে বলা যাইতে পারে 'বীজাণু-বিদ্যা' বা Bacteriology।

চরক তাঁর আয়ুর্বেদ গ্রন্থে কৃমি নামধেয় জীবকে দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা 'বাহ্যকৃমি' * এবং 'অভ্যন্তর কৃমি'। অথর্ববেদে আবার এই অভ্যন্তর কৃমিকে দুইটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা দৃষ্টকৃমি ও অদৃষ্টকৃমি (অঃ বেঃ ২।৩১।৫)। নিম্নের তালিকাটি হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে ঃ—
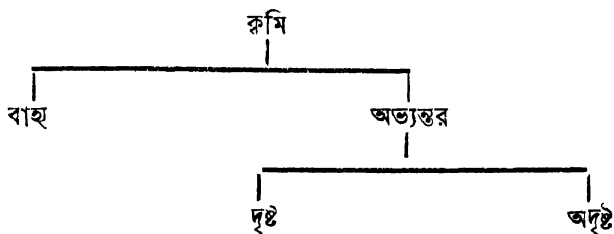
বাহ্যকৃমি বলিতে এখানে যে উকুন প্রভৃতি কীট জীবকে বুঝানো হইয়াছে, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে বুঝা যায়। 'অভ্যন্তর কৃমি' দ্বারা এইখানে প্রকৃত কৃমি এবং 'জীবাণুপ্রাণী', এই উভয়বিধ জীবকে বুঝানো হইয়াছে। এই অভ্যন্তর কৃমিসমূহ আবার দুইটি উপ-বিভাগে বিভক্ত, যথা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। প্রকৃত কৃমিকে 'দৃষ্ট কৃমি' এবং জীবাণু প্রাণীকে 'অদৃষ্ট কৃমি' বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন 'কৃমিবিদ্যা' ধীরে ধীরে তিনটি উপ-বিদ্যায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

---

* "নামেতো বিংশতি বিধা বাহ্যস্তত্র মলোদ্ভবা
তিল প্রমাণ সংস্থান বর্ণা কেশম্বাবাশ্রয়া
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যুকা লিক্ষাশ্চ নামতো"—চরক

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পূর্বতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এই কৃমি ও কীটজাতীয় জীবসমূহকে একত্রে Vermes জীব বলিতেন। পরে তাহারা এই Vermes জীবকে বিবিধ শ্রেণীর জীবে বিভক্ত করিয়া লন। ইউরোপে Linnœus (১৭৫৮ খ্রীঃ অঃ) সাহেবও অনুরূপ ভাবে Vermes জীব বলিতে মলাস্ক, ওয়ারম্ একাইনোডারম্, সিলেণ্টে্টা ও প্রোটোজুয়াকেও বুঝিতেন। ইনি ইনসেক্ট বিভাগটি দ্বারা সমুদয় 'আরথোপড্' জীবদেরও বুঝিতেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দেও বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক Carl Genbarers এবং Clans প্রভৃতিও এই Vermes শব্দের দ্বারা জীবদিগের একটি প্রাথমিক বিভাগ বুঝিতেন এবং বিবিধ শ্রেণীর নিরস্থিক জীবের সহিত Balanoglossus ও Tunicata প্রভৃতি অস্থিক জীবকেও এই বিভাগের অন্তর্গত এক একটি জীব মনে করিতেন। ইউরোপে Lankester সাহেব সর্বপ্রথম এই Vermes বিভাগের উপরোক্ত জীব দুইটিকে অস্থিক জীবরূপে স্বীকার করিয়া বাকীগুলির স্থান Arachnida, Arthopoda, Platyhelminthes প্রভৃতি বিভাগে নির্দেশ করিয়া দেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন হিন্দুগণেরও কেহ কেহ সরীসৃপ বলিতে প্রকৃত সরীসৃপসহ ভেক জীবদেরও বুঝিতেন। অনুরূপভাবে য়ুরোপে Linnœus সাহেব এ্যামফিবিয়া বলিতে ভেকের সহিত সরীসৃপদেরও ধরিতেন। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যায় যে বর্তমান ইউরোপীয়গণের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুগণও প্রারম্ভে জীববিভাগ সম্পর্কে একই প্রকার ভুল করিয়াছিলেন।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমি কেবলমাত্র জীবাণুবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অতি প্রাচীনকালে জীবাণু প্রাণিদের হিন্দুরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সেই সম্বন্ধে মানুষের স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীনকালে লিখিত সুস্পষ্ট

প্রামাণ্য শ্লোকগুলিকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি নি। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশেষে আমি বিশদরূপে আলোচনা করিব।

'অদৃষ্ট কৃমি' যে এককোষ জীবাণু বা বীজাণু প্রাণী এবং উহা যে প্রকৃত কৃমি নয় তাহা নিম্নের পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকটি * হইতে বুঝা যায়। এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, জ্বর প্রভৃতি রোগসমূহ এক অদৃষ্ট কৃমির কারণে হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, জ্বর প্রভৃতি রোগের কারণ যে 'প্যারাসাইটিক পোরোজোয়া' (লোমদ্বীপা) তাহাও তাঁরা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। নিম্নের শ্লোকে উক্ত জ্বর রোগ যে জীবাণুর দ্বারা ঘটিয়া থাকে তাহা চিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সকল রোগের লক্ষণ হইতে উহাদের কোনটি প্রকৃত কৃমি এবং কোনটি জীবাণু বা বীজাণু, তাহা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। এই সকল রোগের লক্ষণ হইতে বিবিধ বীজাণু বা কৃমিজীবের সংস্কৃত নামের Corresponding ইংরাজী নামও নির্ণয় করা যায়।

অথর্ববেদে [C.f. ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ] এই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কৃমি (জীবাণু) জীবের বাসস্থান সম্বন্ধে বহু কথা পাওয়া যায়। ইহারা পর্বতে, বনে, গাছে, জলে ও অন্তরীক্ষে (বায়ু) দৃষ্ট হয়; ইহারা পশু বা মানবের দেহে প্রবেশ করে (অঃ বেঃ ২।৩১।৫); ইহা অন্ত্র, মস্তক ও পার্ষ্ণীতে থাকে (অঃ বেঃ ২।৩১।৪; চক্ষু, নাসিকা ও দন্তেও ইহা দৃষ্ট হয় (অঃ বেঃ, ৫।২৩।৩)।

উপরের তথ্য হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, চক্ষুর অগোচর বীজাণু

* জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগং সদনং ভ্রম
ভক্তদ্বেষোহতি সারশ্চ সঞ্জাত ক্রিমি লক্ষণং

জীবগণ যে বায়ুবাহী হইয়া শূন্যেও বাস করিতে পারে তাহাও প্রাচীন হিন্দুগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা য়ুরোপীয় পণ্ডিত Pasteur সাহেব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উপরের অথর্ববেদোক্ত (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) আখ্যান ভাগ হইতে আরও জানা যায় যে প্রাচীন হিন্দুগণ মনুষ্যের বা কোনও জীবের দন্ত হইতেও এই জীবাণু জীবের সন্ধান (?) পাইয়াছিলেন। [আমি হিন্দুগণের গবেষণা পদ্ধতি শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখাইব যে প্রাচীন হিন্দুগণ এই সকল অনুজীব দেখিবার উপযোগী লেন্স নির্মাণ করিতেও সক্ষম ছিলেন।] য়ুরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে Leeuwenhoek সাহেবও তাঁর স্বনির্মিত লেনসের সাহায্যে পরে তাঁহার দন্তের শ্লেষ্মপিণ্ডএও এই অনুজীবের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আর্য ঋষিগণ জীবাণু বা এককোষ প্রাণিদের বাসস্থান সম্পর্কে উক্তরূপ মতামত খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরকাল পূর্বে প্রকাশ করিলেও উহার সহিত বর্তমান পণ্ডিতগণের মতামতের এতটুকুও অসমাঞ্জস্য নাই। ইহাদের বাসস্থান সম্পর্কীয় আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে—J. Stuart Thomson M.Sc. Ph. D., F. R. S. E. (1923) লিখিত 'Animal Kingdom' নামক পুস্তকের, ১২ পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পংক্তির তর্জমা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আর্যঋষিগণ বহুকাল পূর্বে এই সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে নূতন কিছুই ইঁহারা বলেন নাই—

"জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে (বায়ুতে) এমন কি অত্যুচ্চ পর্বত শিখরেও ইহাদের বাস। দেহ cyst দ্বারা আবৃত করিয়া ইহারা ধূলিকণা ও বায়ুর সহিত যত্রতত্র গমন করিতে পারে। গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান স্থানে ইহারা সমভাবে বাস করে। পুষ্করিণী, স্রোতস্বিনী, বালুকা সৈকত, সমুদ্রগর্ভেও ইহাদের সন্ধান মিলে। ভিজামাটি, পরিত্যক্ত বিষ্ঠা এবং

উদ্ভিদ ও জীবদেহের অভ্যন্তরেও ইহারা বাস করে। এমন কি, জীব-দেহের রক্তবাহী ধমনীতেও ইহারা স্থান করিয়া লইয়াছে।"

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী এই এককোষ জীবগণকে তিনটি মূলবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, (১) ফ্ল্যাজিলেটা এবং সিলিয়েটা টাইপ; ইহারা অতীব গতিশীল, (২) প্যারাসিটিক স্পোরোজোয়ান টাইপ; ইহারা প্রায় গতিহীন এবং (৩) এ্যামিবয়েড্ টাইপ; ইহারা মন্থর-গতি জীব। ইহাদের মধ্যে স্পোরোজোয়ান জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে পরগাছা বা প্যারাসাইটরূপে বাস করে; কিন্তু সিলিয়েটা, ফ্ল্যাজিলেটা এবং এ্যামিবা বা এ্যামিবয়েড্ প্রাণী জীবদেহের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে এই উভয়বিধ স্থানেই বসবাস করিয়া থাকে।

হিন্দু প্রাণী-বিজ্ঞানবিদ্‌গণও উপরোক্তরূপে এককোষ প্রাণিগণকে তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা, (১) কেশদা ও লোমদা; কেশদা অর্থে ফ্ল্যাজিলেটা এবং লোমদা অর্থে সিলিয়েটা। (২) লোমদ্বীপা প্রাণী; প্যারাসাইটিক স্পোরোযোয়ান? (৩) জন্তুমাতা ও উডুম্বরা; এ্যামিবা বা এ্যামিবয়েড্ টাইপ ইত্যাদি।

এই সকল জীবের উপরোক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত, উহাদের জীবনধারা সম্বন্ধেও তাঁহারা অবহিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শ্রেণীর এককোষ জীবের আকৃতি ও স্বভাবের সহিতও তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের এই বিশেষ বিদ্যার জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল তাহা নিম্নের চরকোক্ত (৭৮ খ্রীঃ অঃ) শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম Protozoologist রূপে সুখ্যাতি একমাত্র চরক ঋষি ও অথর্ব-বেদ প্রণেতাদেরই প্রাপ্য। এই বিশেষ খ্যাতি ইউরোপীয় পণ্ডিত Leeuwenhoek সাহেব (১৬৭৫ খ্রীঃ অঃ) কোনক্রমেই দাবী করিতে পারেন না।

"স্থানং রক্তবাহিন্যো ধমন্য। সংস্থামণ বো,
বৃত্তাশ্চাপাদশ্চ। সূক্ষ্মত্বাবচ একে ভবন্ত দৃশ্য।
বর্ণস্তেষাং তাম্র। নামাণি, কেশদা, লোমদা
লোমদ্বীপাঃ সৌরসা উডুম্বরা জন্তুমাতারশ্চেতি।"
—(৭ম অধ্যায়, চরকসংহিতা, বিমানস্থানম্)

তাৎপর্য্য ঃ—স্থান রক্তবাহীধমনী, আকৃতিতে অতি সূক্ষ্ম, প্রায়ই গোলাকার, অপাদা বা পদশূন্য। অনেকে এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুরও অদৃশ্য। ইহাদের বর্ণ তাম্র। প্রকারভেদে এই সব জন্তুগণ কেশদা, লোমদা, লোমদ্বীপা, সৌরসা, উডুম্বরা ও জন্তুমাতা নামে অভিহিত হয়।
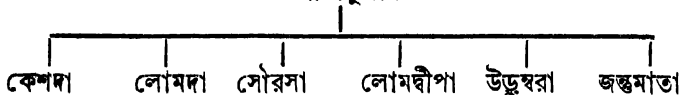
উপরের শ্লোকটি কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় অবতারণা করা হইলেও উহাতে বহুবিধ জীবাণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শ্লোকটিতে উল্লিখিত জীবাণুদেহের নামের অর্থ হইতেই উহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। শ্লোকটিতে আমরা যথাক্রমে ছয় জাতীয় জীবাণুর সন্ধান পাই। যথা, (১) কেশদা (২) লোমদা (৩) সৌরসা (৪) লোমদ্বীপা (৫) উডুম্বরা ও (৬) জন্তুমাতা।

[আয়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ (১০০-২০০ খ্রীঃ) পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, বিবিধ বীজাণু দ্বারা যে বিবিধ রোগের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকল বীজাণু জীব যে রক্তধমনীতে স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহা প্রাচীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুগণ এই তথ্য সুপ্রাচীনকালে অনুমান বা আবিষ্কার করিতে পারিলেও য়ুরোপে রবার্ট্ কক্ সাহেব ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ
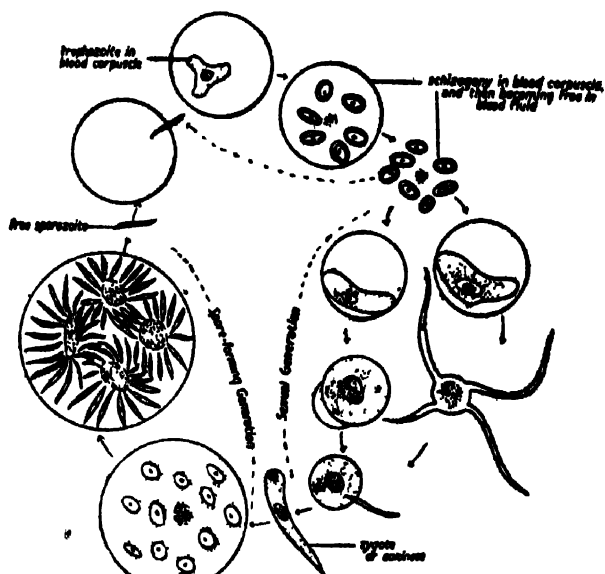
ম্যালেরিয়া বীজাণুর জীবন-চক্র (স্পোরোজোয়ান বা লোমদ্বীপ ?)
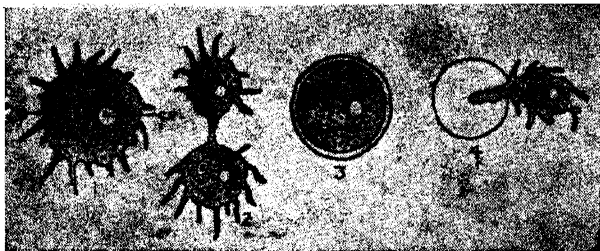
কোষবদ্ধ আমিবা বা উড়ুম্বরা জীবসহ আমিবার জীবন-চক্র
(Cysted Amæba)
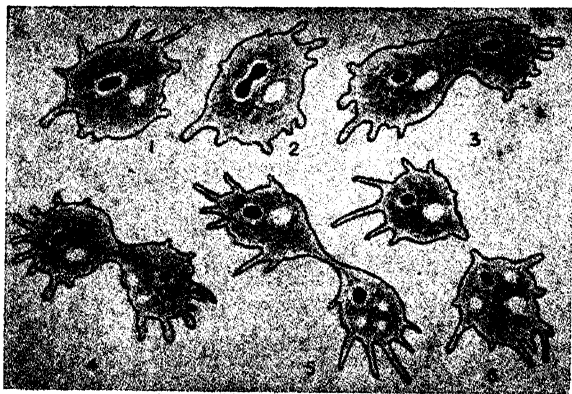
এককোষ জন্তুমাতা জীবের বিভক্তি (আমিবা বা জন্তুর মাতা)

বরাবর সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে এই সকল জীব বিবিধ রোগের বাহন এবং উহারা রক্ত ধমনীতে বাস করে।]

প্রথমে জন্তুমাতা সম্বন্ধে বলা যাউক। এককোষ আমিবা জীবই পৃথিবীর আদিতম জীব, প্রাচীন হিন্দুগণ এই কারণে আমিবা জীবকে জন্তুমাতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই আমিবা জীবের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এইজন্য ইহাদের পিতা না বলিয়া মাতা বলা হইয়াছে। পৃথিবীর প্রতিটি জীবের আদিমূল হইতেছে এই আমিবা জীব। গ্রীক ভাষায় আমিবা অর্থে অস্থায়ী (change) বুঝায়। আমিবা এক এক সময় এক একপ্রকার আকৃতি ধারণ করে এবং উহাদের কোনও স্থায়ী অঙ্গাদি নাই, এইজন্য উহাদের য়ুরোপীয়গণ আমিবা নাম দিয়াছেন। অপর দিকে প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার নাম দিয়াছেন 'জন্তুমাতা', কারণ পৃথিবীর জীব মাত্রেই এই আমিবা জীব হইতে উদ্ভূত। ইহাদের দেহ জেলির ন্যায় স্বচ্ছ এবং উহা প্রটোপ্লাসম্ বা জীব-সার দ্বারা সৃষ্ট। ইচ্ছামত ইহারা দেহাবয়বের বর্ধন বা সংকোচন করিতে সক্ষম। ইহাদের দেহ অতি দ্রুত আয়তনে বর্ধিত হয়। আয়তনে বাড়িলে উহাদের দেহের ভিতরাংশে আহার পৌঁছাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা তৎক্ষণাৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পূর্বতন আকারের দুইটি অনুরূপ আমিবা জীবের সৃষ্টি করে। এইভাবে উহারা পুনঃপুনঃ বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। সাধারণতঃ আকারে ইহারা এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০০}$ ভাগ হইয়া থাকে। ইহারা এতো ক্ষুদ্র যে, সকল ক্ষেত্রে উহাদের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। তবে লেনসের সাহায্যে উহাদের উত্তমরূপেই দেখা গিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কথঞ্চিৎ বৃহৎ তাহাদের অবশ্য চেষ্টা করিলে চর্মচক্ষুতে দেখা যাইতে পারে। বহু আমিবা জীবকে স্বচ্ছ জলেও সন্তরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের

দেহে জৈব-মনি বা নিউক্লিয়াসও দেখা গিয়া থাকে। বিভক্ত হইবার সময় ইহাদের দেহের জীব-সারের সহিত এই জৈবমনিও বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহারা দেহের অংশবিশেষের বর্ধন ঘটাইয়া সাময়িকভাবে অঙ্গ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। এই সকল দেহাঙ্গের সাহায্যে উহারা খাদ্যকণা সংগ্রহ ও শোষণ করিয়া তাহা আহার করে। ইহাদের কেহ কেহ উদ্ভিদকণা (Algæ) কেহ কেহ ক্ষুদ্রতম জীব ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহে একটি সঙ্কোচনক্ষম (contractile) গহ্বর বা (vacuole) দেখা যায়। উহাদের নিষ্ক্রামন-ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই গাত্রাবরণ হীন অযৌনজ এককোষ জীব প্রাণিদিগের আদি বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মার ন্যায় ইহাদের নিরাকার ও অমরও বলা যাইতে পারে; কারণ ইহাদের কোনও স্থায়ী আকার নাই। ইহারা বারে বারে বিভক্ত হয়, কিন্তু মরে না। আমিবা জীব সাধারণত বাহিরের জীব; জীবদেহে থাকিলেও উহারা ক্ষতি করে না, কিন্তু এক শ্রেণীর আমিবা নিদারুণ আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে। এইরূপ মনে হয় প্রাচীন হিন্দুগণ আমাশয় রোগীর শৌচকৃত উদকের বা বিষ্ঠার মধ্যে কিংবা পুষ্করিণীর জলে ইহার প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন। আমাশয় রোগীর রক্তবাহের মধ্যে তাঁহারা এই জীবকে গোলাকাররূপে দেখিয়া হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইহারা জীবের রক্ত ধমনীতেও স্থান করিয়া লইয়াছে।

জন্তুমাতা বা আমিবা সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার উড়ুম্বরা সম্বন্ধে বলিব। উড়ুম্বরা জীব অর্থে সম্ভবতঃ এ্যামিবয়েড বা গোলাকার আমিবাকে বুঝানো হইয়াছে। উড়ুম্বরা অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে যজ্ঞিডুমুর বুঝায়। অর্থাৎ যজ্ঞিডুমুরের ন্যায় (globlular) আকৃতি বিশিষ্ট জীব হইতেছে উড়ুম্বরা। আমিবা জীব cyst তৈয়ারী করিলে বা কোষবদ্ধ হইলে

গোলাকার দেখিতে হয়। বস্তুতঃ পক্ষে লেনসের তলায় উহাদের ক্ষুদ্র যজ্ঞিডুমুরের ন্যায়ই দেখাইয়া থাকে। প্রতিকূল পরিবেশে (drought) ডুমুরের ন্যায় গোলাকার হইয়া দেহনির্গত একপ্রকার রসের সাহায্যে কোষ (chitinoid cyst) সৃষ্টি করিয়া উহার মধ্যে তাহারা কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় (dormant) থাকে। অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইলে ইহারা পুনরায় জাগ্রত হইয়া আসে এবং তাহার পর নূতন এনার্জিসহ পূর্বের ন্যায় জীবনচক্র অতিক্রম করিতে থাকে। সম্ভবতঃ ইহাদেরও আর্যগণ আমাশয় রোগীর রক্তবাহ্যে বা শৌচকৃত উদকে দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপ অবস্থায় উহাদের আমিবা হইতে পৃথক কোনও এক জীব মনে করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ বিষ্ঠার রক্ত জলধৌত করিয়া পরীক্ষাকালে ইহাদের দেখিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইহারাও বুঝি মানুষের রক্তধমনীতে স্থান করিয়া লইয়াছে।

জন্তুমাতা সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার সৌরসা জীব সম্বন্ধে বলিব। 'সৌরসা' অর্থে সূর্যের ন্যায় রশ্মিযুক্ত জীবাণু বুঝায়। ইহা আমাদের Sun-animalcule নামক এককোষ জীব। সম্ভবতঃ তড়াগ প্রভৃতির স্বচ্ছজলে, কিংবা স্রোত প্লাবিত বিষ্ঠা বা মৃত্তিকাতে বা আমাশয়জনিত রক্তস্রাবী রোগীর শৌচে ব্যবহৃত রক্তাপ্লুত উদকে আর্যঋষিগণ ইহার প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন। রক্তবিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য নীত জলের সহিত আসিয়া উহারা বিষ্ঠার রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। কারণ পরীক্ষার জন্য রক্তবিষ্ঠা জলে গুলিয়া লওয়ার রীতি ছিল। ঐ জীব যে জলের সহিত বাহির হইতে আসিয়াছে তাহা না বুঝিয়া আর্যগণ মনে করিয়াছিলেন যে উহারাও বুঝি রক্তধমনীর রক্ত হইতেই বাহিরে ঝরিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বে অঙ্কিত ফটো-চিত্র হইতে ইহার স্বরূপ এবং আকৃতি সম্যকরূপে বুঝা যাইবে। সূর্যের রশ্মির ন্যায় শুঁয়া ইহার চারিধারে

ঘিরিয়া আছে। এইজন্য এই এককোষ প্রাণীকে সৌরসা জীব বলা হইয়া থাকে।

সৌরসা জীব সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার 'কেশদা' জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। কেশদা অর্থে—যে কেশ দেয় তাহাকে বুঝায়। যেমন 'বরদা' অর্থে যিনি বর দেন কিংবা 'শুভদা' অর্থে যিনি শুভ আনয়ন করেন। এই কেশদা বলিতে যে জীবাণুর দেহে একটি, দুইটি বা ততোধিক কেশ বা flagella সংযুক্ত থাকে—তাহাকেই বুঝায়। এই জীবকে ইংরাজিতে বলা হয় flagellate জীব। এই কেশ বা flagiela পাতলা চুলের আকারে দেখিতে হয়। সাধারণ ভাষায় আমরা ইহাকে শুঁয়া বা কেশ বলিয়া থাকি। বাসস্থানের প্রভেদ হেতু এই ফ্ল্যাজেলেটা বা কেশদা জীব দুই প্রকারের হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাশয়ে বাস করে, তাহাদের Intestinal flagellate বলে এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা রক্তধমনী তথা রক্তকণার মধ্যে বাসা নেয় তাহাদের বলা হয় Hœmo-flagellates। ঘুম রোগ স্থষ্টকারী Trypanosoma জীবও এইরূপ একজীব এবং ইহারা রক্তধমনীতে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই উভয়বিধ জীবকেই 'কেশদা' জীব বা ফ্ল্যাজেলেটা বলা যাইতে পারে। পার্শ্বের চিত্রে এই 'কেশদা' জীবের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিকৃতি হইতে বক্তব্য বিষয়ের সম্যক ধারণা হইবে।

কেশদা জীব সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার লোমদা জীব সম্বন্ধে বলিব। 'লোমদা' অর্থে যে সকল জীব লোম দেয় বা বাহির করে তাহাদের বুঝাইয়া থাকে। লোমদা জীব বলিতে আমরা Ciliata জাতীয় জীবাণুদের বুঝিয়া থাকি। এই সকল স্থক্ষ্মানুস্থক্ষ্ম জীবাণুর দেহে লোমের ন্যায় অতি স্থক্ষ্ম বহু Cilia বা শুঁয়া আছে। এই Cilia বা লোমের সাহায্যে ইহারা সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা
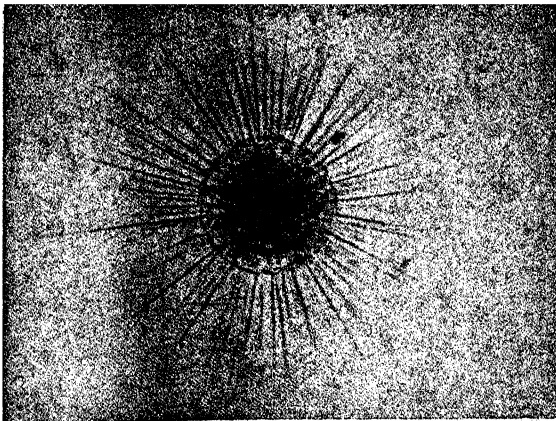
এককোষ সৌরসা জীব

এককোষ কেশদা জীব
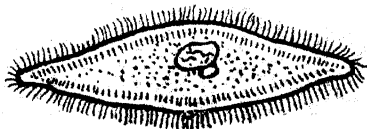
এককোষ লোমদা জীব

প্রায়শঃক্ষেত্রে জীবদিগের ক্ষতিকারক হয় না,—কিন্তু কথনও কথনও ইহারা জীবদেহে আমাশয় রোগের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ জীবদেহের Caecum ও Appendixএর মধ্যে বাসস্থান স্থাপন করিয়া থাকে। ইহারা কেহ কেহ দৈর্ঘ্যে ৫০—৭″ হইয়া থাকে। খুব সম্ভবত, আমাশয় জনিত রক্তের সহিত আর্যঋষিগণ ইহাদের নির্গত হইতে দেখিয়া থাকিবেন। এই কারণে বোধহয় তাঁহারা উহাদের বাসস্থান রক্তবাহী ধমনীতে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এই প্রকার লোমদা জীবের ইংরাজী নাম Balantidium colai এই লোমদা জীবের একটি প্রতিকৃতি পার্শ্বের চিত্রে প্রদত্ত হইল। উহাদের এই প্রতিকৃতি হইতে এই বিশেষ জীবাণুর প্রকৃত স্বরূপ ও প্রতিকৃতি বুঝা যাইবে।

এই লোমদা ও কেশদা জীব অর্থে যে সকল জীবাণু যথাক্রমে কেশ বা লোম দেয় বা বাহির করে তাহাদের বুঝাইয়া থাকে। দ্রুত চলাফেরার সুবিধার্থে ইহারা আপন দেহে যথাক্রমে কেশাকৃতি ও লোমাকৃতি শুঁয়া বাহির করিয়াছে। বংশবৃদ্ধির সময় কিন্তু এই কেশদা জীব কেশ বা শুঁড় গুটাইয়া গোলাকার হইযা এ্যামিবার মত দুই ভাগ হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে এই এ্যামিবা জীবদের মধ্যে যাহারা কালক্রমে আত্মরক্ষার্থে বা অন্য কোন কারণে স্থায়ী গাত্রাবরণ সৃষ্টি করিয়া সঞ্চরণের জন্য কেশ বা লোমের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদেরই আমরা কেশদা এবং লোমদা জীব নামে অভিহিত করি। ইহাদের গাত্রাবরণের সৃষ্টি হওয়ার জন্য ইহাদের দেহে খাদ্য গ্রহণের জন্য একপ্রকার মুখেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কেশদা জীবগণ তাহাদের ঐ কেশ বা ফ্লাজেলা যথাক্রমে উঠাইয়া ও নামাইয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। অনুরূপভাবে লোমদাগণ তাহাদের গাত্র-লোম নাড়াইয়া নাড়াইয়া দ্রুত সঞ্চরণ

করিয়া থাকে। প্রয়োজনমত ক্রমিক পরিবর্তনের কারণে এ্যামিবা বা জন্তুমাতা জীব হইতে এই কেশদা ও লোমদা প্রভৃতি প্রতিটি জীবাণুর সৃষ্টি হয়। [এই কারণে সর্দি হইলে শ্বাসনলীর গাত্রসংলগ্ন 'কেশযুক্তকোষ'-সমূহ তাহাদের কেশ সাময়িক রূপে হারাইয়া আজও পর্যন্ত 'এ্যামিবা-রূপ গোলাকার কোষে' পরিণত হইয়া বহির্গত হয়।] প্রাচীন হিন্দু মনীষিদের মতে এই এককোষ কেশদা জীবগণই পরবর্তীকালে পরস্পর যুক্ত হইয়া বহুকোষ উন্নত জীবদের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে আমরা হিন্দু সৃষ্টিক্রম শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, কোনও কোনও আধুনিক অবৈজ্ঞানিক টুলো পণ্ডিত এই 'কেশদা' ও 'লোমদা' জীবাণুদের সম্বন্ধে বহু ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহাদের কেহ কেহ কেশদা ও লোমদা অর্থে যারা কেশ বা লোম খায় বা উহাতে আশ্রয় করে তাহাদের বুঝেন। উহাদের বাসস্থান সুস্পষ্টরূপে রক্তবাহী ধমনীতে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এমন কি ঐ সকল জীবদের নামের সুস্পষ্ট অর্থ এবং শ্লোকে প্রদত্ত বিবরণও তাঁহারা উপেক্ষা করেন।

[উপরের তথ্য হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ এককোষ জীবসমূহকে উহাদের শুঁয়া অনুযায়ী উহাদের বিবিধ উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অনুরূপ ভাবে য়ুরোপে Stein সাহেবও Infusoria জীবের cilia অনুযায়ী উহাদের বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ঐ সকল উপশ্রেণীর তিনিও এক একটি বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করিয়াছিলেন।]

এই কেশদা ও লোমদা শব্দ দুইটি সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বায়লজিষ্ট হ্যালডেন সাহেবের সহিত একবার আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানান যে, জার্মাণ ভাষায় সিলিয়েটা ও ফ্লাজেলেটার নামকরণ পূর্বে 'কেশদা ও লোমদা'র সম অর্থে করা হইয়াছিল। 'কেশদা' ও 'লোমদা' জীবাণু সম্পর্কে বলা হইল। এইবার 'লোমদ্বীপা' জীবাণু প্রাণী সম্বন্ধে বলা যাউক। এই 'লোমদ্বীপা' জীবাণুকে Sporozoan টাইপের জীব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এক বিন্দু রক্তের বা রক্তকণার মধ্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে ছড়াইয়া থাকিয়া ইহারা কণারূপ লোমদ্বীপের (Speck) ন্যায় শোভা পায়। ম্যালেরিয়া জীবাণু একটি Sporozoan জীব ইহাদের একটি প্রতিকৃতি পার্শ্বের চিত্রে প্রদর্শিত হইল। জীবনচক্রের দুই একটি ক্ষেত্রে উহাদের লোম-দ্বীপের (Speck) ন্যায় দেখিতে হয়।

কিন্তু আমি মনে করি যে লোমদ্বীপ বলিতে প্রাচীন হিন্দুগণ কোনও এক Sporozoan জীব বুঝেননি। কারণ লেন্স আবিষ্কার করিতে পারিলেও শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ বলিতে আমরা যা বুঝি তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারেন নি। আমরা জানি যে অনুকূল পরিবেশে 'আমিবা' জীব দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা টুকরা টুকরা হইয়া ক্ষুদ্র লোমের ন্যায় বহু বিন্দুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। খুব সম্ভবতঃ রক্ত-আমাশয় রোগীর বিষ্ঠাধৌত একবিন্দু জলে এইরূপ বহু লোমানুরূপ (Speck) কণা দ্বীপের ন্যায় শোভিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন উহারা আমিবা' হইতে পৃথক আর এক জীব। রক্ত-আমাশয় রোগীর বিষ্ঠা মিশ্রিত জলে ইহাদের সন্ধান পাইয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইহারাও রক্তধমনীর রক্ত হইতে গুহ্যপথে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

খুব সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত শ্লোকটি আর্য ঋষিগণ এই আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবকে স্মরণ করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন—

করিয়া থাকে। প্রয়োজনমত ক্রমিক পরিবর্তনের কারণে এ্যামিবা বা জন্তুমাতা জীব হইতে এই কেশদা ও লোমদা প্রভৃতি প্রতিটি জীবাণুর সৃষ্টি হয়। [এই কারণে সর্দি হইলে শ্বাসনলীর গাত্রসংলগ্ন 'কেশযুক্তকোষ'-সমূহ তাহাদের কেশ সাময়িক রূপে হারাইয়া আজও পর্যন্ত 'এ্যামিবা-রূপ গোলাকার কোষে' পরিণত হইয়া বহির্গত হয়।] প্রাচীন হিন্দু মনীষিদের মতে এই এককোষ কেশদা জীবগণই পরবর্তীকালে পরস্পর যুক্ত হইয়া বহুকোষ উন্নত জীবদের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে আমরা হিন্দু সৃষ্টিক্রম শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, কোনও কোনও আধুনিক অবৈজ্ঞানিক টুলো পণ্ডিত এই 'কেশদা' ও 'লোমদা' জীবাণুদের সম্বন্ধে বহু ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহাদের কেহ কেহ কেশদা ও লোমদা অর্থে যারা কেশ বা লোম খায় বা উহাতে আশ্রয় করে তাহাদের বুঝেন। উহাদের বাসস্থান সুস্পষ্টরূপে রক্তবাহী ধমনীতে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এমন কি ঐ সকল জীবদের নামের সুস্পষ্ট অর্থ এবং শ্লোকে প্রদত্ত বিবরণও তাঁহারা উপেক্ষা করেন।

[উপরের তথ্য হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ এককোষ জীবসমূহকে উহাদের শুঁয়া অনুযায়ী উহাদের বিবিধ উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অনুরূপ ভাবে য়ুরোপে Stein সাহেবও Infusoria জীবের cilia অনুযায়ী উহাদের বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ঐ সকল উপশ্রেণীর তিনিও এক একটি বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করিয়াছিলেন।]

এই কেশদা ও লোমদা শব্দ দুইটি সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বায়লজিষ্ট হ্যালডেন সাহেবের সহিত একবার আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানান যে, জার্মাণ ভাষায় সিলিয়েটা ও ফ্লাজেলেটার নামকরণ পূর্বে 'কেশদা ও লোমদা'র সম অর্থে করা হইয়াছিল। 'কেশদা' ও 'লোমদা' জীবাণু সম্পর্কে বলা হইল। এইবার 'লোমদ্বীপা' জীবাণু প্রাণী সম্বন্ধে বলা যাউক। এই 'লোমদ্বীপা' জীবাণুকে Sporozoan টাইপের জীব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এক বিন্দু রক্তের বা রক্তকণার মধ্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে ছড়াইয়া থাকিয়া ইহারা কণারূপ লোমদ্বীপের (Speck) ন্যায় শোভা পায়। ম্যালেরিয়া জীবাণু একটি Sporozoan জীব ইহাদের একটি প্রতিকৃতি পার্শ্বের চিত্রে প্রদর্শিত হইল। জীবনচক্রের দুই একটি ক্ষেত্রে উহাদের লোম-দ্বীপের (Speck) ন্যায দেখিতে হয়।

কিন্তু আমি মনে করি যে লোমদ্বীপ বলিতে প্রাচীন হিন্দুগণ কোনও এক Sporozoan জীব বুঝেননি। কারণ লেন্স আবিষ্কার করিতে পারিলেও শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ বলিতে আমরা যা বুঝি তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারেন নি। আমরা জানি যে অনুকূল পরিবেশে 'আমিবা' জীব দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা টুকরা টুকরা হইয়া ক্ষুদ্র লোমের ন্যায় বহু বিন্দুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। খুব সম্ভবতঃ রক্ত-আমাশয় রোগীর বিষ্ঠাধৌত একবিন্দু জলে এইরূপ বহু লোমানুরূপ (Speck) কণা দ্বীপের ন্যায় শোভিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন উহারা আমিবা' হইতে পৃথক আর এক জীব। রক্ত-আমাশয় রোগীর বিষ্ঠা মিশ্রিত জলে ইহাদের সন্ধান পাইয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইহারাও রক্তধমনীর রক্ত হইতে গুহ্যপথে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

খুব সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত শ্লোকটি আর্য ঋষিগণ এই আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবকে স্মরণ করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন—

অথৈ তয়োঃ পার্থেন কতরেণ চ ন
অনীমানি ক্ষুদ্রান্ত সকৃদাবর্ত্তীনি
ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যে
—তত্তৃতীয় স্থানং তেনাসৌ লোকো-
ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তাদেষ
(শ্লোক—॥ ৩৬৬ ॥ ৮ ছান্দোগ্য উপনিষদ পঞ্চম অধ্যায় ৫৬৯)

তাৎপর্যঃ—যাহারা জ্ঞান-কর্মপথ ভ্রষ্ট, তাহারা উভয় পথের কোনও পথেই গমন করে না। তাহারা সেই এক 'জায়শ্চম্রিয়শ্চ' সঙ্গক ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে জন্মলাভ করিয়া থাকে।

এককোষ জীবসমূহ পুনঃপুনঃ বিভক্ত হইয়া একই সঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু বরণ করিয়া লয়। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহারা জন্মলাভও করিয়া থাকে। এইজন্য 'জায়শ্চম্রিয়শ্চ' বাক্য দ্বারা হিন্দুরা বিবিধ এককোষ জীবকেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন শ্যামাপোকা প্রভৃতি জীবকে হয়তো এই শ্লোক দ্বারা বুঝানো হইয়াছে, কিন্তু একথা সত্য যে উহারা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে না, পরদিন প্রত্যূষে উহাদের মৃত অবস্থাতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল কারণে এই শ্লোক দ্বারা উহারা আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবদেরই বুঝিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এককোষ বীজাণুজীবের সন্ধান আর্যগণ কিরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আজ আর কাহারও অজানা নেই যে পূর্বকালে ভারতবর্ষে বিষ্ঠা, সীবন ও মূত্র পরীক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল। আত্রেয়সম্প্রদায়ের বৈদ্যশাস্ত্র গ্রন্থের বিবরণ হইতে আমরা "কালজ্ঞান" নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখি। এই পুস্তক অমুদ্রিত এবং গ্রন্থকারের

নামও অজ্ঞাত। রোগীর মলমূত্র এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয়ের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ ছিল। 'বনৌষধি দর্পণ' নামক গ্রন্থও এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, পুরাকালীন রাজাগণ যুদ্ধযাত্রাকালে বৈদ্যদিগকে সঙ্গে লইতেন। বৈদ্যগণ পথে ও প্রান্তরে অবস্থিত জলাশয়ের জল পরীক্ষা করার পর উহা সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হইত।

যতদূর বুঝা যায় শক্তিশালী লেনসের সাহায্যেই হিন্দুগণ রক্ত, বমন, বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই কাচ ও মণি নির্মিত লেনস যে প্রাচীন হিন্দুগণ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি সুপ্রাচীন শ্লোকও আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। হিন্দু-গবেষণা পদ্ধতি শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি বিশদ-রূপে ইহার আলোচনা করিব।

কৃমি-বিদ্যা

কৃমি-বিদ্যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'হেল্‌মিনথলজী'। আমরা ইহার প্রথম উল্লেখ পাই আমাদের বেদগ্রন্থে (C. ২০০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ)। প্রারম্ভে কীট-বিদ্যা ও জীবাণু-বিদ্যাও এই কৃমি-বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই তিনটি বিদ্যা পৃথক আকার ধারণ করে। অথর্ববেদ প্রণেতাগণ যজ্ঞে নিহত পশুর দেহে ইহাদের সর্বপ্রথম সন্ধান পান। বিবিধ পশুর পাকস্থলী, রক্তধমনী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি স্থানে—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয়বিধ কৃমির সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন। 'জীবাণু-বিদ্যা' শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে আমি আলোচনা ইতিপূর্বেই করিয়াছি। অথর্ববেদের ২।৩২।১ শ্লোকে গাভীর দেহের ভিতর কৃমি সম্পর্কীয় বহু কথার উল্লেখ আছে। বৈদ্যরাজ চরক (১৬ খ্রীঃ অঃ) এই কৃমিকুল সম্পর্কে বিশেষরূপে আলোচনা করেন। চরক বর্ণিত বিবিধ প্রকৃত কৃমির সংস্কৃত নামের করেস্‌পণ্ডিং ইংরাজী নাম ঐ সকল কৃমির দ্বারা উদ্ভূত রোগের লক্ষণ হইতে নির্ভুল রূপে ধারণা করা যায়। প্রকৃত পক্ষে বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ চরক ঋষি এবং তাঁহার পূর্ববর্তীগণ পৃথিবীর প্রথম কৃমিবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত।

এইবার এই প্রকৃত কৃমি বা কৃমি-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই কৃমিশাস্ত্র সম্পর্কে আর্য মনীষিগণ বহুবিধ আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের জ্ঞান কিরূপ গভীর তাহা নিম্নের শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে।

"কফদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধা সর্পন্তি সর্ব্বতঃ।
পৃথুব্রধ্নানিভা কোচিৎ কোচিদ্‌গণ্ডূপদোপমাঃ॥

ক্বড়ধান্যাঙ্কুরা কাবাস্তনু দীর্ঘাস্তথান বঃ।
শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ সপ্ত ধাতু তে॥
অন্ত্রর্দা উদরবেষ্টা, হৃদয়দা, মহাগুদা।
চুরবো দর্ভকুসমা সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥" চরক-আয়ুর্বেদ

তাৎপর্য্য ঃ—কফজনিত ক্বমিসকল আমাশয়ে জাত ও পরিবর্ধিত হইয়া উদরে ইতস্তত বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি চর্মলতা সদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলক (কেঁচো) সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাক্বতি, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ, যথা ; অন্ত্রদা, উদরবেষ্টা, হৃদয়দা, মহাগুদা, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধা।

"পক্কাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিনঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োমুখাঃ॥

* * * *

পৃথুবৃর্ত্ততনুস্থূলা শ্যাব পীতাসিতাসিতাঃ॥
তে পঞ্চনাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুক মকেরুকা।
সৌসুবাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি॥

তাৎপর্য্য ঃ—পুরীষজ ক্রিমিসকল পক্কাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখন অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগীর উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পুষ্টাক্বতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি স্থূল এবং কেহ শ্যাম, কেহ পীত, কেহ শ্বেত, কেহ বা ক্বষ্ণবর্ণ। নামভেদে

ইহারা পাঁচ প্রকার, যথা ; ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্যা ও লেলিহ।

উপরের শ্লোক দুইটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, (১) অন্ত্রদা (২) উদরবেষ্টা (৩) হৃদয়দা (৪) মহাগুদা (৫) চরু (৬) দর্ভকুসম (৭) সুগন্ধ ; এই সাত প্রকার কৃমি, কফজ কৃমি, এবং (১) ককেরুক (২) মকেরুক (৩) সৌসুরাদা (৪) সশূলাখ্যা (৫) লেলিহ, এই পাঁচ প্রকার কৃমি পুরীষ কৃমি। এই পুরীষ কৃমি সকলের মধ্যে কয়েকটি সম্ভবতঃ প্রকৃত কৃমি নয়, উহাদের কেহ কেহ এককোষ জীবাণু বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমে কফজ কৃমি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কফজ কৃমির অন্তর্গত অন্ত্রদা একটি অন্যতম জীব। জীবের অন্ত্রে ইহারা বাস করে, এইজন্য ইহাদের অন্ত্রদা বলা হয়। উপরের শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অন্ত্রদা কৃমির আকৃতি ছিল স্থুল। ইহারা জীবের আমাশয়ে জাত এবং পরিবর্ধিত হয় এবং উদরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। সহজেই বুঝা যায় যে, আর্যগণ Nemotoda বা বর্তুল কৃমিকেই অন্ত্রদা কৃমি বলিয়াছেন। পর পৃষ্ঠায় এই কফজ কৃমির একটি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। প্রতিকৃতি হইতে উহার স্বরূপ ও আকৃতি বুঝা যাইবে।

অন্ত্রদা কৃমি সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার উদরবেষ্টা কৃমি সম্বন্ধে বলিব। শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে উহাদের আকৃতি ছিল চর্মলতা সদৃশ। ইহা হইতে মনে হয় যে, আর্যগণ চিপিটক কৃমি (Platihelmenthes) জীবকে উদরবেষ্টা বলিতেন। ইহারা অনেক সময় সাত বা আট ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। দেখিতে ইহারা লম্বা চাবুকের মত। মুখাংশের সাহায্যে উদরের কোনও স্থানে সন্নিবেশিত থাকিয়া চর্মলতা সদৃশ দেহলতা দ্বারা ইহারা উদরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। এইজন্যই

অন্ত্রদা জীব বা রাউণ্ড ওয়ার্ম্ (বর্তুল কৃমি)
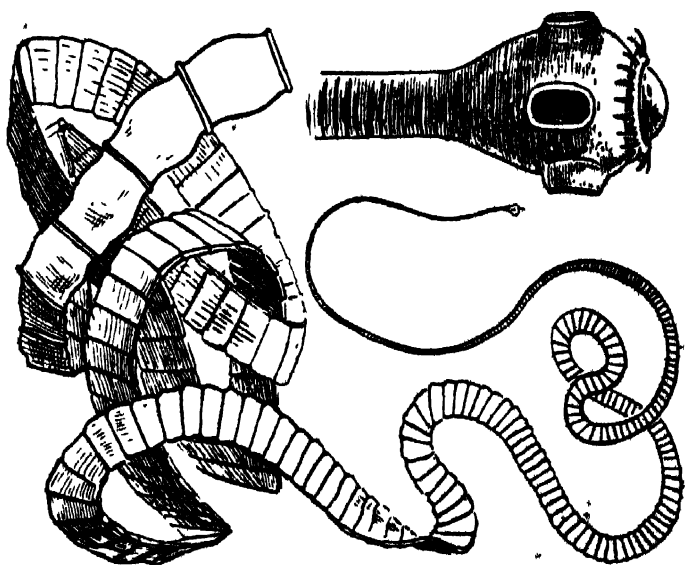
উদর-বেষ্টা বা টেপ্-ওয়ার্ম (চিপিট কৃমি)

বোধ হয় ইহাদের নাম হইয়াছে উদরবেষ্টা। পরগাছা রূপে বাস করায় ইহাদের খাদ্যনলী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা অপরের ভুক্তদ্রব্য আপন দেহ দ্বারা শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়। পর পৃষ্ঠায় এই চিপিটক কৃমির একটি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

অথর্ববেদে (২০০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) এই চিপিটক কৃমি সম্পর্কে বিশদ রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। 'বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা' হইতে আমি এই সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে আর্যঋষিগণের কৃমি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) শালুন (২।৩১।১,২), ইহা কুবীর অর্থাৎ জালের মত জড়াইয়া থাকে, বিশ্বরূপ (নানা রূপধারী—দেহের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন রূপ), চতুরক্ষ (চারিটি চক্ষু), সারঙ্গ (নানা বর্ণযুক্ত) এবং অর্জুন (শ্বেতাভ)। ইহাকে আমরা ফিতা-কৃমি (Tape—worm Tænia solium অথবা T. saginata) মনে করি। ইহারা ফিতার ন্যায় চ্যাপ্‌টা, দৈর্ঘ্যে ১০।১২ ফুট। মস্তক অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাতে চারটি ভাণ্ডের মত অঙ্গ (Sucker) আছে, ইহার দ্বারা অন্ত্রের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। ঐ ভাণ্ড চারিটিকে চক্ষু বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র মস্তকের পশ্চাতে বহুসংখ্যক পর্ব ক্রমান্বয়ে সজ্জিত। এই পর্বগুলির আকৃতি ও আয়তন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ; এইজন্যই ইহা বিশ্বরূপ।

অথর্ববেদে (২।৩২।৬) ক্রিমি সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে, 'তোমার শৃঙ্গ দুইটি ছিন্ন করি এবং তোমার বিষাধার কুযুম্ভ (স্থলী) ভেদ করি।' এই প্রাণী বিশেষ ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা—ইহাকে Cysticercus Cellulosae বলা হয়। ইহার মস্তকের পিছনে পর্বগুলির পরিবর্তে একটি থলি থাকে।

(২) অথর্ববেদে (২।৩২।৪,৫) উক্ত হইয়াছে যে, কৃমিদিগের

রাজা, সচিব, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলে হত হউক। ইহার বাসস্থান এবং বাসস্থানের চারিদিক নষ্ট হউক। আমরা ইহাকে 'Tænia Echinococcus' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ফিতাকৃমির বাল্যাবস্থা বলিয়া মনে করি। ইহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বৃহৎ স্থলীর আকারে বর্তমান থাকে; স্থলীটি আয়তনে শিশুর মাথার ন্যায় বড় হইতে পারে। ইহার ভিতর জলের ন্যায় একপ্রকার রস আছে। এই স্থলীর প্রাচীর হইতে বহু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলী প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহাদের ভিতরও ঐরূপ স্থলী প্রস্ফুটিত হইতে পারে। এইরূপে দুই তিন বংশ একই সঙ্গে বর্তমান থাকে। এইজন্য রাজা, সচিব, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র স্থলীগুলিকে ফুল্লকা বলা হইয়াছে। এই স্থলী মানুষ বা গবাদি পশুর দেহের ভিতর (যকৃৎ, ফুসফুস ও মস্তিষ্কে) বর্ধিত হয়।

অথর্ববেদে চিপিটক কৃমির ন্যায়, বর্তুল কৃমির সম্বন্ধেও বহুবিধ তথ্যের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে এই বর্তুল কৃমির অন্তর্গত বহু প্রকার কৃমির কথাও লিখিত আছে। 'বেদে প্রাণীর কথা' হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল

(১) অলুগণ্ডু, অলান্দু (অঃ বেঃ, ২।৩১।২, ৩; কৌ, সূ ৪।৩)। ইহা অবস্কর (সায়নের মতে নিম্নমুখ হইয়া গমন করে), চ্যাধ্বর (নানা পথ প্রস্তুত করিয়া গমন করে) এবং পার্ষ্ণী হইতে নির্গত হয় (অ. বে ২।৩১।৪); ইহা কুরীর (অর্থাৎ জালবদ্ধ)। এই সকল বিবরণ হইতে ইহাকে Dracunculus medinensi মনে হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে দুই ফুটের উপর। পূর্ণাবস্থায় ইহা চর্মের ক্ষততলে বাস করে। প্রায়ই পায়ের গোড়ালির ক্ষতে দৃষ্ট হয়। দেশীয় লোকেরা ইহাকে একটি কাঠিতে জড়াইয়া প্রত্যহ ১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত বাহির করিতে

থাকিয়া এক পক্ষে সমুদয় ক্রমিটিকে বাহির করিয়া ফেলে। কৌশিক-সূত্রে এ'কথার উল্লেখ আছে।

(২) এই ক্রমি (অঃ, বেঃ ৫।২৩।৯) ত্রিশীর্ষ (তিনটি মস্তক বিশিষ্ট), ত্রিকুকুদ সারঙ্গ (নানা বর্ণ যুক্ত) এবং অর্জুন (শ্বেতাভ)। ইহাকে Ascaris lumbricoides' মনে করা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুটের উপর। মুখের চারিপার্শ্বে তিনটি গোলাকার প্রবর্ধন আছে এবং ইহা অন্ত্রে বাস করে। যখন প্রথম নির্গত হয়, তখন ইহার বর্ণ রক্তাভ-পীত অথবা ধূম্রাভ-পীত থাকে; কিছুক্ষণ পরে বর্ণ শ্বেতাভ হইয়া যায়।

(৩) এই ক্রমি-শিশুদের দেহে (অন্ত্রে) বাস করে (অঃ বেঃ ৫।২৩।২, ৭)। ইহা যেবাষাদ (পৈপ্পালাদ শাখায় যবাযবা—যবের ন্যায় পরিমাণ বিশিষ্ট অর্থাৎ যবের ন্যায় দীর্ঘ)। কঙ্কষাস (লম্ফদায়ক), এজৎক (জোরে নড়িতে থাকে), শিপবিত্নুক (চাবুকের মত লম্বা)। ইহা আমাদের ছেলেদের ছোট ক্রমি Oxyuris vermicularis। ইহা অনেক সময় মলদ্বার হইতে নির্গত হয়। এই জাতীয় ক্রমি মাটি, জল প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয়। পৈপ্পলাদ শাখায় আমরা 'শিপভিন্নক' কথা দেখি; ইহার অর্থ যাহার চাবুকের ন্যায় একটি ভিন্ন দেহাংশ আছে, এইরূপও হইতে পারে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার দেহের একাংশ চাবুকের মত সূক্ষ্ম এবং আর এক অংশ অন্যরূপ। যবাযবা অর্থে আমরা দৈর্ঘ্যে দুইটি যবের পরিমাণ ধরিতে পারি; তাহা হইলে ইহা Trichuris trichiura। ইহারা বৃহৎ অন্ত্রের অভ্যন্তরে বাস করে।

অন্ত্রদা এবং উদরবেষ্টা ক্রমি সম্বন্ধে বলা হইল। এক্ষণে কফজ ক্রমির অন্তর্গত হৃদয়াদা, মহাগুদা, চুরবো, দর্ভকুসম ও সুগন্ধা নামক ক্রমির কথা বলিব। ইহাদের মধ্যে, হৃদয়াদা ক্রমিকে আমি Dirofilaria এবং দর্ভকুসুম ক্রমিকে আমি Liver fluke বলিয়া মনে করি।

কীট-বিদ্যা

কীট-বিদ্যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'এন্‌টমলজি'। প্রারম্ভে ইহা কৃমি-বিদ্যার অন্তর্গত একটি বিদ্যা ছিল। পরবর্তীকালে ইহা একটি পৃথক বিদ্যায় পরিণত হয়। এই কীট-বিদ্যা প্রাচীনকালে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল—তাহা নিম্নের একটিমাত্র শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে :—

'কটুভিঃ বিন্দুলেখাভিঃ পক্ষৈঃ পাদৈঃ মুখৈঃ নখৈঃ
শূকৈঃ কণ্টকলাঙ্গুলৈঃ সংশ্লিষ্টৈঃ পক্ষরোমাভিঃ
স্বনৈ প্রমাণৈঃ সংস্থানৈঃ লিঙ্গৈশ্চাপি শরীরগৈঃ
বিষবীর্যৈশ্চ কীটানাং রূপজ্ঞানাং বিভাব্যতে।

তাৎপর্য :—রঙ, বিন্দু বা রেখা, পক্ষপাদ (Pedal Appendages), মুখ (mouth with antinnae—মুখ সন্দংশ, ইতি দলভ্য), নখ (claws), কণ্টক (Sharp pointed hair or filaments), লাঙ্গুল (stings in tail), সংশ্লিষ্ট পক্ষরোমাদি (hymenopterous character), গুণাগুণ শব্দাদি, আকার ও আকৃতি (Size and structure of the body), লিঙ্গ (Sexual organ), বিষ ও তাহার ক্রিয়ার প্রকার-ভেদের উপর নির্ভর করিয়া কীটের রূপ বা যোনি (species) নির্দেশ করিবে।

শ্লোকটির রচয়িতা ঋষি লাদায়ন (c/ ২০০ খ্রীঃ পূঃ) পৃথিবীতে কীট-তত্ত্বের বা কীট-বিজ্ঞানের প্রথম স্রষ্টা। দলভ্য ঋষি (১০০-২০০ A. D.) তাঁহার গ্রন্থের কল্পস্থানে লাদায়ন ঋষিকে এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে কীট-জীবের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম বা সংজ্ঞা আমরা পাইয়া থাকি।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, ঋষি লাদায়ন পৃথিবীর প্রথম কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। এই কীট-বিদ্যা ভারতবর্ষে ২০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে এই বিদ্যার চর্চা কেবলমাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। মহামতি Jan Swammerdam (1637-1680) ইউরোপে এই বিদ্যায় সর্বপ্রথম পারদর্শিতা লাভ করেন। ইনি সর্বসমেত ৩০০০ বিভিন্ন যোনীর কীট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইউরোপে অপর এক মনীষী Malpighi (1620-1694) কীট জীবের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করেন। ইহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চর্চারম্ভের আনুমানিক ১৬শ বৎসর পর ইউরোপে এই বিদ্যার প্রথম চর্চা বা অনুশীলন আরম্ভ হয়।

উপরোক্ত ভারতীয় কীটবিদ্যাবিষয়ক তথ্য ব্যতীত আমরা বিভিন্ন আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদিতেও (১০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ) বহু কীটবিষয়ক তথ্য পাইয়া থাকি। চরকের সময়ও সম্ভবতঃ কীট-বিদ্যা কৃমি-বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। এইজন্য চরক ঋষি কীটজীবকে বাহ্য কৃমিরূপে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নের প্রামাণ্য শ্লোকটি হইতে ইহা বুঝা যাইবে :—

'নামতো বিংশতি বিধা বাহ্যস্তত্র মলোদ্ভবা।
তিল প্রমাণ সংস্থান বর্ণা কেশম্বাবাশ্রয়াঃ ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মশ্চ যুকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ ॥

—চরক।

তাৎপর্য্য :—ইহারা বিংশতি প্রকারের হইয়া থাকে। এই বাহ্য ক্রিমি সকল গাত্র, মল ও স্বেদ হইতে উদ্গত। উহাদের পরিমাণ, আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। উহারা যুকা ও লিক্ষি (লিকি) নামে অভিহিত। যুকগণ বহুপাদ বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও কেশাশ্রয়ী এবং লিক্ষাগণ সূক্ষ্ম, শ্বেতবর্ণ ও বস্ত্রাশ্রয়ী।

চরকোক্ত এই বাহ্য ক্রিমি সকল পরবর্ত্তীকালে কীটবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই কীট-শাস্ত্রকে প্রাচীন হিন্দুদের কেহ কেহ, পুলকশাস্ত্র বলিতেন। পুলকশাস্ত্র সম্পর্কীয় প্রামাণ্য শ্লোকটি নিম্নের পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হইল। * কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই ক্রিমি ও কীটকে একত্রে 'পুলক' বলা হইত। তবে, এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

এই কীট-বিদ্যার সমধিক উৎকর্ষের কয়েকটি বিশেষ কারণও ঘটিয়াছিল। বৈদ্যশাস্ত্রকারগণকে চিকিৎসা কার্য্যের সুবিধার্থে বহু পিপীলিকা-কীটকে স্বগৃহে পালন পর্য্যন্ত করিতে হইত। রোগীর মূত্রে মিষ্ট বা 'সুগারের' আধিক্য আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকা রক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত শল্য তন্ত্রীগণ (Surgeons) শল্য করণের (Operation) পর এই পিপীলিকাগণের সাহায্যে জীবকায়া সীবন পর্য্যন্ত করিতেন। নিম্নের শ্লোকটি হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে।

* নীলাঙ্কুর্ক্বামবস্তজ ক্ষুদ্রকীট বহির্ভব।

পুলকাস্তভয়োহপিস্যু কীটসা কৃময়োহর্ণব॥

চরক—আয়ুর্ব্বেদ

"মচ্ছূনাৎ যকৃসংদৃঢ়ম অন্ত্রম যদচ্ছাবমক্ষয়েৎ
ছিদ্রন্ত্রস্ন্যতু স্থূলে-দংশয়িত্বা পিপীলিকৈঃ
বহুশঃ সংগ্রীহিতানি জ্ঞাত্বা দিত্বা পিপীলিকাঃ।
প্রতিযোগৈ প্রবেশ্যন্ত্রং প্রৈয়ৈ সিব্যেৎ বনং ততঃ
তথাজাতদকং সর্ব্বমুদরম্ ব্যধয়েৎ ভিষক।
বামভাগে তধোনভে নাড়ীং দত্বা য গলয়েৎ॥
মিশ্রাব্য চ বিমিদ্ধৈতবেষ্টায়েৎ বাসসা উদরম্॥

চরক—উদরস্থানম।

পিপীলিকার তন্তুদ্বারা ঐ যুগের শল্য তন্ত্রীগণ অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থানের সীবনকার্য সমাধা করিতেন। অস্ত্রোপচার সমাধার পর ক্ষতস্থানের দুই পার্শ্বে মধু লেপন করা হইত; এবং তাহার পর উহার উপর এক একটি পিপীলিকা এমনভাবে বসাইয়া দেওয়া হইত যাহাতে মধুর আস্বাদনে তাহারা ক্ষতের উভয় প্রান্তের চর্ম কামড়াইয়া ধরিয়া উহাদের একত্রিত করিতে পারে। ইহার পর কাঁচি-যন্ত্রের দ্বারা এই পিপীলিকাসমূহের পশ্চাদংশ একে একে কর্তন করা হইত। এই অবস্থায় উহাদের 'মরণ কামড়ের' জন্য (death-clutch) ক্ষতস্থানের চর্মের প্রান্তদ্বয় উহাদের মুখের দাঁড়ার দ্বারা একত্রিতই হইয়া রহিত। জীবকায়ার সহিত জীবকায়া বা জীবতন্তু যেরূপ মিশিয়া যায়, সাধারণ সূত্র বা উদ্ভিদতন্তু সেইরূপ কদাচ মিশে না; উপরন্তু বহির্বস্তু (সাধারণ সূত্র) দ্বারা ক্ষতস্থানে 'সেপ্টিসেমিয়া' রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত জীবতন্তু হইতে এইরূপ রোগের উৎপত্তি সম্ভাবনা কম থাকে। সম্ভবতঃ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ সীবন কার্যের জন্য এইরূপ অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন

এই সকল ক্ষতের স্থান ও স্বরূপ অনুযায়ী সীবন কার্যে ব্যবহারের জন্য ছোট ও বড় বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা শিশিতে বা পাত্রে ভরিয়া পালন করাও হইত।

মূত্রে মিষ্টির পরিমাণ বুঝিবার জন্য, বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ, বিভিন্ন প্রকার পিপীলিকাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিভিন্ন (কম বেশী) পরিমাণের মিষ্টির অবস্থানের প্রয়োজন আছে। এইরূপে প্রাচীন হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার এ্যানাটমী সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানার্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

কয়েকটি কীট পতঙ্গের সহিত যে বিবিধ প্রকার রোগের সম্বন্ধ আছে তাহাও প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ অবগত ছিলেন। শুশ্রুত (২০০ খ্রীঃ) সুস্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন যে, এক প্রকার জ্বর রোগ মশকের দংশনের কারণে ঘটিয়া থাকে। বলাবাহুল্য ম্যালেরিয়া জ্বর যে এক প্রকার মশকের দংশনের জন্য হয় তাহা তিনি সুপ্রাচীন কালেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বর যে মশক দংশনের জন্য উৎপাদিত হয়, অধুনাকালে তাহা Sir Ronald Rossকে কলিকাতার অপার সারকুলার রোডস্থ ভবনে বসিয়া নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। আমি স্বর্গগত প্রাচীন ব্যাকট্রীয়লজিষ্ট রায় ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি যে, শুশ্রুতের এই শ্লোকটি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াই ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কারের জন্য তিনি মশক জীবটিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন।

[পরবর্তীকালে ভারতীয় সুধীসমাজ এই কীটা-বিদ্যা একেবারে ভুলিয়া যাইলেও এই দেশের কৃষকসমাজে ইহার ব্যবহারিক জ্ঞান আজও পর্যন্ত বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হইল।

"আমাদের বেগুন ক্ষেতের বেগুন গাছগুলো এই সময় বিবর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শুকাইয়া যাইতে থাকে। বিব্রত হয়ে আমি এই সম্পর্কে আমাদের গ্রামের এক অশীতিপর বয়স্ক বৃদ্ধ চাষীর নিকট দুঃখ করছিলাম। ঐ বৃদ্ধ চাষী সব কথা শুনে পর দিন ক্ষুদে পিঁপড়ে বা ঐ জাতীয় এক প্রকার কীট শিশিতে ভরে এনে বেগুন বৃক্ষের গোড়ায় উহাদের ছেড়ে দিয়ে বললে, 'কর্তা আর কোন ভয় নেই, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ঐ ক্ষেতে এক প্রকার অদৃশ্য কীট বাসা বেঁধেছে। এই সব পিঁপড়া জাতীয় ক্ষুদেজীব ঐ সকল ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীটদের কয়েক-দিনের মধ্যেই খেয়ে শেষ করবে।' আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম আমার বেগুন গাছগুলো ধীরে ধীরে পুনর্জীবন লাভ করে সতেজ হয়ে উঠছে।"

উপরে ঐ কাহিনীটির মধ্যে কতোটা বৈজ্ঞানিক সত্য আছে তাহা আমি জানি না। তবে ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে কীট-বিদ্যার মূল সত্যটি এই দেশের অজ্ঞ চাষী-সমাজও একদিন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

অথর্ববেদে বহু প্রকার কীট জীবের উল্লেখ আছে। ইহাদের কয়েকটি সংস্কৃত নাম কীটজীবের বর্তমান বৈজ্ঞানিক নামের স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্য। 'বেদের প্রাচীন কথা' হইতে এইরূপ কয়েকটি কীটের নামের উল্লেখ করা হইল।

(১) অরঙ্গর (ঋঃ বেঃ ১০।১০৬।১০), অরঙ্গর অর্থে যে 'গুন গুন' করে। (২) সরঘ (ঋঃ বেঃ ১।১১২।২১), (তৈ, ব্রা ৬।১০।১, পঞ্চ, ব্রা ১২।৪।৪) সরঘ অর্থে যে হুল দিয়া আঘাত করে। (৩) অল্পশয়ু (অঃ বে, ৪।৩৬।৯) সায়ন ঋষির মতে ইহা অল্পকায়, শয়ন-স্বভাব এবং সঞ্চারণাক্ষম—অর্থাৎ চলিতে পারে না। (৪) ইন্দ্রগোপ (বৃঃ আঃ

উঃ, ২।৩।৬), ইহা রক্তবর্ণ। (৫) উপজিহ্বিকা, উপচীকা, উপদীকা এবং পৈপ্পলাদশাখার উপজিকা। অথর্ববেদে (২।৩।৪, ৬।১০০।২) ইহার মৃত্তিকায় উচ্চ গৃহনির্মাণের কথা আছে। সম্ভবতঃ ইহা উইপোকা বা Termes obesus (৬) খদ্যোৎ (ছাঃ উঃ), জোনাকি পোকা। (৭), জভ্য, ভর্দ (অঃ বেদ, ৬।৫০।১-২)। জভ্য অর্থে চর্বনকারী; ভর্দ অর্থে ছিদ্রকারী, ইহারা শস্যনাশক পতঙ্গ। (৮) তৃণস্কন্দ (ঋ, বে ১।১৭২।৩); ইহা গঙ্গাফড়িং। (৯) দংশ (ছাঃ-উঃ ৬।৯।৩, ৬।১০।২) —ডাঁশ জাতীয় বা Tabanus গণভুক্ত। (১০) নদনিমন (অঃ বে, ৫।২০।৮); অর্থাৎ শব্দকারী। সম্ভবতঃ ইহা উচ্চিঙ্গট গণভুক্ত জীব। (১১) পিপিল পিপীলিকা (অঃ বেঃ ৭।৫৬।৭, ২০।১৩৪।৬; পঃ ব্রা ৫।৬।১০, ১৫।১৭।৮; (বৃঃ আঃ উঃ) (১।৪।৯।২৯; ঐঃ ব্রাঃ ১।৩।৮ ২।১।৬)—পিপীলিকা, প্লুসী (ঋঃ বেঃ ১।১৯১।১) ; প্লুসী অর্থে দাহকর। সম্ভবতঃ, ইহা কাঠ-পিপঁড়া; বক্ষ লাল, দেহ ও মস্তক কালো, দংশন বেদনাদায়ক। (১২) ভৃঙ্গ (অঃ বেঃ ৯।২।২২); ইহা বড় মৌমাছি (১৩) মক্ষি, মক্ষিকা (ঋঃ বে, ১।১৬২।৯) এবং অথর্ববেদে (১১।১।২, ১১।৯।১০) —ইহাদের অপক্ব ও পচা মাংস ভক্ষণের কথা উল্লেখ আছে। (১৪) মউচি (ছাঃ উঃ ১।১০।১) ; সম্ভবতঃ ইহা পঙ্গপাল, কারণ ইহাদের শস্য নষ্টকারী বলা হইয়াছে। (১৫) মশক; অথর্ববেদে ইহাকে 'ত্রিপদংশী' এবং অর্ত বলা হইয়াছে। সায়ন ঋষি 'ত্রিপদংশী' শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা তিন অঙ্গের সাহায্যে দংশন করে। অর্ত শব্দের তিনি অর্থ করিয়া গিয়াছেন, 'অল্পসামর্থ্য'। আমরা জানি মশকের একটি দীর্ঘাকার 'শুঁড়' আছে। এই 'শুড়' চর্মে বিদ্ধ করিয়া মশক রক্ত শোষণ করে। ইহার দুই পার্শ্বে দণ্ডাকার স্পার্শন অঙ্গ আছে; প্রকৃতপক্ষে ইহারা দংশন কার্যে কোনও সাহায্য না করিলেও ভ্রমক্রমে হয়তো

ইহাদেরও দংশনাঙ্গ বলা হইয়াছে। (১৬) বঘ (অঃ বেঃ ৬।৫৩,৩), সায়ন ইহার অর্থ করেন, যে নাশ করে; তিনি ইহাকে পতঙ্গ মনে করেন, ইহাতে চোয়ালের কথা আছে। (১৭) ব্যদ্ধর (অঃ বেঃ ৫।৬৩।৩)—ইহার অর্থ, যে অরণ্যে নানাপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে। ইহা একটি অরণ্য পতঙ্গ। (১৮) সূচিক (ঋঃ বেঃ ১।১৯১।৭)—যাহারা সূচের মত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহারা সূচিক। সম্ভবতঃ ইহারা মশক বা ছারপোকা। (১৯) সৃজয়, (তৈঃ সঃ), সম্ভবতঃ ইহা কাঁঠালে মাছি। (২০) স্তেগ, 'তেগ (বাজসনেয়ি সংহিতা ২৫।১) এবং (তৈঃ সঃ ৫।৭।১১)—সম্ভবতঃ ইহা একপ্রকার মক্ষিকা।"

উপরের এই সকল কীটজীবের নাম উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যে, ইহা হইতে কীটবিষয়ক ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নামের 'করেসপণ্ডিং' সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নামও যে পাওয়া যাইতে পারে—তাহা দেখানো। আমার মতে সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার হইতে বিবিধ জীবের বহু অর্থসূচক বৈজ্ঞানিক নাম আমরা অনায়াসে উদ্ধৃত করিতে পারিব। 'ডেরিভেটিভ মিনিং' বা ধাতুগত অর্থ হইতে এই সকল অর্থবোধাত্মক নামের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করিতে পারিলে অল্পায়াসেই বহু সমস্যার সমাধা হইবে।

এই সম্পর্কে কীট জীব ব্যতীত অপর কয়েকটি নিরস্থিক জীবের কথাও বলা যাইতে পারে। বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে উহাদেরও বহু উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উর্ণনাভ, উর্ণনাভী জীবের কথা বলা যাইতে পারে (তৈঃ ব্রা ১।১।৩।৪, তৈঃ সা ৫।১।৪, ৫।১০।৯, শঃ ব্রা ১৪।১।১।৮), ইহা মাকড়সা; উহার উদরের পশ্চাদ্দেশে কতকগুলি গ্রন্থি আছে। তাহা হইতে রস নির্গত হয়; এ রস বায়ুস্পর্শে দৃঢ় হইলে সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত হয়। এইজন্য ইহার উর্ণনাভ নাম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অথর্ববেদে 'কঙ্কপর্বন' নামে এক জীবের (অঃ বেঃ—৭।৬৬।১) উল্লেখ আছে।

এই নামের অর্থ যে, যাহার দেহ কঙ্কণের ন্যায় পর্বযুক্ত। ইহা 'তেঁতুলে বিছা' জাতীয় জীব। ঋগ্‌বেদে (১।১৯১।১) কঙ্কত, নবকঙ্কত এবং সতীন-কঙ্কত নামে তিনটি দাহকর প্রাণীর কথা বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চিরুনি (কঙ্ক) সদৃশ এই জীব সকল তিন প্রকার শতপদী জীব। সাধারণ বিছার ন্যায় অথর্ববেদে (৭।৫৬।৮) শর্কোট নামক একটি জীবের উল্লেখ আছে; অথর্ববেদে বলা হইয়াছে যে, ইহার দুই বাহু, মস্তক অথবা মধ্য দেহে বিষ নাই, কিন্তু পুচ্ছদেশে বিষ আছে। ময়ূর ও পিপীলিকা শর্কট ভক্ষণ করে। বলা বাহুল্য যে, ইহা বৃশ্চিক বা কাঁকড়া-বিছা।]

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নানা প্রকার কীটের ও তাহার বিষক্রিয়ার সম্বন্ধে বলা আছে। আয়ুর্বেদের মতে পিপীলিকা ছয় প্রকার—যথা; স্থূলশীর্ষা, সংবাহিকা, ব্রাহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা। আয়ুর্বেদের মতে মক্ষিকা জাতীয় জীব এই পাঁচ প্রকার—যথা; কান্তলিকা, পিঙ্গলিকা, মধুলিকা, কাষায়ী ও স্থলিকা। আয়ুর্বেদের মতে মশক জাতীয় জীবও পাঁচ প্রকার—যথা; সামুদ্র, পরিমণ্ডল, হস্তিমশক, কৃষ্ণ ও পার্বতীয়। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে আরও প্রায় ৮০টি বিবিধ কীটের নামের উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এই সকল গ্রন্থে বহু প্রকার লুতা ও বৃশ্চিকের নামেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল জীবের বিবিধ নামের বিবিধ অর্থ এবং উহাদের বিষের ক্রিয়া হইতে উহাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইবে।

জলৌকা ও কিঞ্চুলিকা

প্রাচীন হিন্দুগণ নূপুরিকা (ringlike) বা এ্যানিলিড্ এবং গণ্ডুপদী (knotty leg) বা অরথোপোড্ জীব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। গণ্ডুপদী জীবকে তাঁহারা গলদা আদি (?) 'বহুপদী', বিছা আদি 'শতপদী', কীটপতঙ্গাদি ষটপদী এবং উর্ণনাভী আদি 'অষ্টপদী' প্রভৃতি জীব বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।
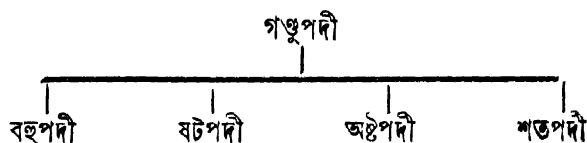
অনুরূপভাবে প্রাচীন হিন্দুগণ নূপুরিকা জীবগণকে কিঞ্চুলিকা (কেঁচুয়া), জলৌকা (জোঁক) প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিযাছেন। জলৌকা প্রভৃতি জীবকে তাঁহাদের কেহ কেহ ক্ষোত্তব্যা জীবও বলিতেন। যে জীবকে পিষিয়াও মারা (elastic) যায় না, ক্ষোত্তব্যা অর্থে তাঁহারা তাহাদেরই বুঝিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই কিঞ্চুলিকা ও জলৌকা জীবকে মানুষের পরম হিতকারী বন্ধুরূপে বলিয়া গিয়াছেন। কিঞ্চুলিকা সম্বন্ধে যে ইহা অতীব সত্য তাহাতে কোনও ভুল নাই। লাঙ্গল সৃষ্টির পূর্বে ইহারাই ভূমির উর্বরা শক্তি বর্ধিত করিয়া জীবের উপকার করিত। ব্যাকটেরিয়া জীবদিগের পর ইহারাই মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিকে সাহায্য করে। ইহারা মৃত্তিকায় গহ্বর করিয়া নিম্নের মৃত্তিকা ভক্ষণান্তে উপরে উঠাইয়া দেয় এবং

তৎসহ বৃষ্টির বারিকণার এবং উদ্ভিদ মূলের মৃত্তিকার নিম্নে যাত্রা পথ সুগম করে। উহারা যে পচ্যমান উদ্ভিদ আহার করে তাহা নির্গত হইয়া সর্বোত্তম সারেরও সৃষ্টি হয়। ডারোইন সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক 'একার' ভূমিতে ৫৩০০০ সংখ্যার উপর কিঞ্চুলিকা (earth-worm) বাস করিতে পারে এবং প্রতি বৎসর প্রায় দশ টন মৃত্তিকা উহারা ভক্ষণান্তে বাহিরে উদ্গার করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে পনরো বৎসর কালের মধ্যে মাত্র এই কয়টি কিঞ্চুলিকা দ্বারা ঐ ভূমি তিন ইঞ্চি পরিমাণ মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত হইতে পারে।

এই কিঞ্চুলিকা জীবদের ন্যায় জলৌকা জীবও আর্যঋষিগণের মতে মানুষের বহুবিধ উপকার করিয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ সাধারণতঃ ইহাদের চিকিৎসা কার্যেই অধিক ব্যবহার করিতেন। এইজন্য এই জীব সম্বন্ধে তাঁহারা বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নের আখ্যান ভাগ হইতে ইহা সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

প্রথমে জলৌকা জীব সম্বন্ধে বলা যাউক। জলৌকার বাংলা নাম 'জোঁক'। ইংরাজিতে ইহাকে leech বলা হয়। জল ইহাদের ওকঃ অর্থাৎ বাসস্থান। এইজন্য 'জোঁক' জীবকে জলৌকা বলা হয়। জলৌকা সম্বন্ধে সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতের মতে এই জলৌকা সবিষ ও নির্বিষ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সবিষ জলৌকা ছয় প্রকার এবং নির্বিষ জলৌকাও ছয় প্রকার। প্রথমে সবিষ জলৌকার কথা বলিব। সুশ্রুতের মতে উহাদের নাম, কৃষ্ণা, কর্বুরা, অলগর্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা। ইহাদের মধ্যে অঞ্জন (কজ্জল) চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূলমস্তকবিশিষ্ট জলৌকাকে কৃষ্ণা বলে। যে সকল জলৌকা বর্মিমৎস্যের ন্যায় (বাইন মাছের তুল্য) আয়ত ও ছিন্নোনত কুক্ষিবিশিষ্ট তাহাদিগকে কর্বুরা বলে। যাহার

গাত্রে রোম আছে, পার্শ্বদেশ বৃহৎ এবং মুখ কালো তাহার নাম অলর্গদা। যাহার গাত্রবর্ণ রামধনুর ন্যায় বিচিত্র এবং ঊর্ধ্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার দ্বারা চিত্রিত তাহার নাম ইন্দ্রায়ুধা। ঈষৎ কৃষ্ণ, পীত-বর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্র পুষ্পাকৃতির চিত্রবিচিত্র জলৌকাদের সামুদ্রিকা বলে। যাহার শরীর বৃষের অণ্ডকোষের ন্যায় অধোভাগে দ্বিধা বিভক্ত এবং যাহার মুখ ক্ষুদ্র তাহার নাম গোচন্দনা।

সবিষ জলৌকার শ্রেণী সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার নির্বিষ জলৌকা সম্বন্ধে বলিব। সুশ্রুতের মতে নির্বিষ জলৌকাও ছয় প্রকার। যথা—কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকী, পুণ্ডরিমুখী, ও সাগরিকা। ইহাদের মধ্যে যাহাদের দুইপার্শ্ব মনছালের রঙের ন্যায় রঞ্জিত এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধবর্ণবিশিষ্ট তাহাদের কপিলা বলে। যাহারা অল্পরক্ত বর্ণবিশিষ্ট, গোলাকার, পিঙ্গলবর্ণ ও শীঘ্রগামিনী তাহাদের পিঙ্গলা বলে। যাহারা যকৃতের ন্যায় নীললোহিত বর্ণবিশিষ্ট, শীঘ্র রক্তপায়ী এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ মুখ সংযুক্ত তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী বলে। যাহাদের মূষিকের (ইঁদুরের) ন্যায় আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত তাহাদের মূষিকা বলে। যাহারা মুগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও পদ্মের তুল্য বিস্তীর্ণ মুখবিশিষ্ট তাহাদের পুণ্ডরিমুখী বলে। যাহারা স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ তাহাদের সাগরিকা বলে।

এই জলৌকাদের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধেও সুশ্রুত অবগত ছিলেন। তাঁহার মতে যবন বা তুরস্ক দেশ, পাণ্ড্য (কাম্বোজের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত দেশ), ইন্দ্রপ্রস্থ বা পুরাতন দিল্লীর নিকটে, নর্মদা নদীর তীরবর্তী সহ্যদেশে ও পৌতান বা মথুরা প্রদেশে দীর্ঘকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী নির্বিষ জলৌকা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন যে, মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও

পুরীষ দ্বারা কলুষিত বা পচা মলিন জলে সবিষ জলৌকা উৎপন্ন হয়, এবং পদ্ম, নীলোৎপল, উৎপল, সৌগন্ধিক (কহ্লার বা সাদা সুঁড়ী), কুবলয় (রক্তোৎপল) পুণ্ডরীক (শ্বেতোৎপল) ও শৈবালযুক্ত নির্মল জলে নির্বিষ জলৌকা বাস করে।

সুশ্রুত এই সকল জলৌকাদের কিরূপে ধরিতে ও রক্ষা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, আর্দ্র-চর্ম বা কাঁচা চামড়া বা অন্য কোনও দ্রব্য দ্বারা জলৌকা ধরিতে হইবে। তৎপর একটি বৃহৎ নূতন ঘটে সরোবর বা দীঘির জল রাখিয়া তাহাতে উহাদের রাখিয়া দিবে। উহাদের আহারার্থে শৈবাল, শুষ্ক-মাংস ও পদ্ম উৎপলাদি জলজ পদার্থের মূল চূর্ণ করিয়া দিবে ও থাকিবার নিমিত্ত তৃণ ও পদ্মাদি জলজ উদ্ভিদের পত্র সেই পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। দুই বা তিন দিন অন্তর জল ও খাদ্যদ্রব্য পরিবর্তন করিয়া পুনরায় অন্য খাদ্য দিবে এবং প্রতি সাত দিন অন্তর পাত্র পরিবর্তন করিয়া উহাদের অন্য পাত্রে রাখিয়া দিবে।

সুশ্রুতের কালে চিকিৎসকগণ, যে-সকল রোগীর রক্তের চাপ অধিক থাকিত, তাহাদের দেহ হইতে নির্বিষ জলৌকার সাহায্যে বাড়তি রক্ত মোক্ষণ করিয়া লইয়া রোগীদের নিরাময় করিতেন। এইজন্য, সবিষ ও নির্বিষ জলৌকার ভেদ তাঁহাদের নির্ণয় করিতে হইত এবং নির্বিষ জলৌকাদের প্রয়োজনবোধে ব্যবহারের জন্য তাঁহারা উল্লিখিত উপায়ে স্বগৃহে তাহাদের রক্ষাও করিতেন।

সর্প-বিদ্যা

সর্প-বিদ্যা সম্বন্ধে কোনও পৃথক প্রাচীন পুস্তকের সন্ধান আমি এ পর্যন্ত পাই নাই। কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সর্প সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। সুশ্রুত নাগার্জুন (c—১০০—২০০ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার পুস্তকের কল্পস্থানে বিষতন্ত্র (Toxicology) সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বহুবিধ সর্পের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে একপ্রকার নির্বিষ এবং চারিপ্রকার সবিষ সর্পের মধ্যে একটি বর্ণ-শঙ্কর সর্পেরও উল্লেখ আছে। তিনি সর্পকুলকে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—
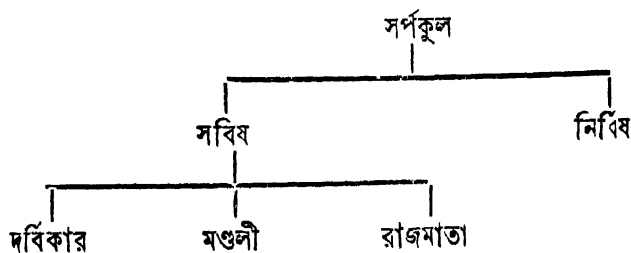
দর্বিকার সর্পগণকে সুশ্রুত নাগার্জুন কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, পদ্ম, মহা-পদ্ম, শঙ্খপ্রাণী (Naina Tripudians, Naja Bungarus) প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাব মতে ইহারা দিবাভাগে বহির্গত হয় এবং ইহারা অতীব দ্রুতগামী। তাঁহার মতে ইহারা ফণায় রথচক্র, লাঙ্গল, ছত্র প্রভৃতির চিহ্ন ধারণ করে। মণ্ডলীসর্প অর্থে সম্ভবতঃ vipera, viperidae (?) সর্পকে বুঝানো হইয়াছে। ইহারা তাঁহার মতে

স্থূল (পুষ্টবঃ), মন্থরগতি ও রাত্রিচর। ইহাদের দেহে মণ্ডলাকার (আদর্শ মণ্ডল) চিহ্ন আছে। চরকের (৭৬ খ্রীঃ অঃ) মতে ইহাদের ফণা নাই। তাঁহার মতে রাজমাতা সর্পেরও ফণা নাই। উহারা রাত্রিচর, গাত্রে ইহারা বহু বিন্দু ও দাগ প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করে এবং ইহাদের পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব বিচিত্র বর্ণের হয়। নির্বিষ সর্পদের মধ্যে অজগর বলিতে Boidœ এবং বৃক্ষেশয় বলিতে Tree Snake বা Deudrophis সর্প বুঝানো হইয়াছে। ইহার মতে দর্বিকারগণ শৈশবে, মণ্ডলিগণ মধ্য বয়সে এবং রাজমাতাগণ শেষ বয়সে অতীব হিংস্রভাবাপন্ন এবং বিষধর হইয়া উঠে। আয়ুর্বেদোক্ত (১০০—২০০ খ্রীঃ অঃ) বিবিধ সর্পের বিবরণ সম্বন্ধে এইবার বিশদরূপে আলোচনা করিব।

আয়ুর্বেদে, বিবিধ সর্পের বিষ, উহার শক্তি ও ক্রিয়া এবং প্রতিষেধক ঔষধাদি ও চিকিৎসাবিধি বিশদ ও নির্ভুলরূপে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা বিষতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। আমরা কেবল মাত্র সর্পের দেহ-বিজ্ঞান এবং শ্রেণীবিভাগের কথা বর্তমান পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। সুশ্রুত নাগার্জুন তাঁহার পুস্তকের কল্পস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে এই সর্পজীব সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বৈদ্যরাজ চরকও তাঁহার বৈদ্যগ্রন্থে সর্প সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ও তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্পকুলকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যথা—

(১) দর্বিকার; যে সকল সর্পের চক্রে বা ফণায় রথের চাকা, লাঙ্গল, ছত্র স্বস্তিক যন্ত্র ও অঙ্কুশের আকৃতি দেখা যায় এবং যাহারা শীঘ্রগামী, তাহাদিগকে দর্বিকার সর্প বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা ২৬। যথা, কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপালী, লোহিতাভ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণ, ককুদপদ্ম,

মহাপদ্ম, দর্ভপুচ্ছ, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটিমুখ, বিষ্কির, পুষ্পাভিকীর্ন, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশিরা, অলগর্দ, অশীবিষ।

(২) মণ্ডলীসর্প; যে সকল সর্পের অঙ্গে বিচিত্র মণ্ডলাকার চিহ্ন থাকে, যাহারা ধীরে ধীরে গমন করে, এবং যাহারা অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, তাহাদের মণ্ডলীসর্প বলে। এই মণ্ডলীশ্রেণীর সর্প ২২ প্রকার। যথা—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পুষত, বোধ্রপুষ্প, মিলিণ্ডক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণু-পত্রক, শিশুক, মদন, পালিন্দর, পিঙ্গলতন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, আগ্নিক, বভ্রূ, কষায়, পারাবাত, পুস্তাভরণ, চিত্রক, ত্রনীপদ।

(৩) রাজীমান; যে সকল সর্পের শরীর তৈলাক্তবৎ চিক্কণ, যাহাদের দেহে উর্ধ্বাধঃ বক্রভাবে বিচিত্র বর্ণের রেখা থাকে, তাহাদের বলা হয় রাজীমান সর্প। এই শ্রেণীর সর্প দশ প্রকার। যথা— পুণ্ডরীক, রাজচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দমক, তৃণশোধক, সর্ষপক, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্রক, গোধূমক ও কিক্কিসাদ।

[যে সকল সর্পের মস্তক, মুখ, জিহ্বা ও চক্ষু বৃহৎ তাহারা পুংসর্প। যাহাদের ঐ সকল প্রত্যঙ্গ তাদৃশ বৃহৎ নয়, তাহারা স্ত্রীসর্প। যাহারা কতক পুংচিহ্ন ও কতক স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করে এবং যাহাদের বিষের তত তেজ নাই ও ক্রোধ অল্প তাহারা নপুংসক সর্প।]

(৪) নির্বিষ সর্প; নির্বিষ সর্পের সংখ্যা ১২। যথা—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতিরথঃ, শুরিকা, পুষ্পক, আহিপাতক, অন্ধাহিক, গৌরাহিক ও বৃক্ষেশয়।

(৫) বৈকরঞ্জ; ইহারা বর্ণশঙ্কর সর্প। উহাদের নাম, যথা—মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজী। কৃষ্ণসর্পের ঔরসে ও গোনসী নামক সর্পিনীর গর্ভে কিংবা গোনসী সর্পের ঔরসে ও কৃষ্ণসর্পিনীর গর্ভে যে সর্প জন্মে

তাহাকে বলা হয় 'মাকুলি'। অনুরূপভাবে বাজিল ও গোনসী সর্পের সংযোগে সৃষ্ট হয় 'পোটগল' এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজমাতা সর্পের সংযোগে সৃষ্ট হয় 'স্নিগ্ধরাজী।'

[মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজী—এই ত্রিবিধ সর্পের স্ত্রী-পুং হইতে ৭ প্রকার সর্প জন্মিয়াছে। ইহারা এই বর্ণসঙ্কর সর্পের অন্তর্গত। উহাদের নাম, যথা—দিবলোক, রোধ্রপুষ্প, রাজচিত্রক, পোটগল, পুষ্পভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বোল্লিতক। এই সাত প্রকার বর্ণসঙ্কর সর্প সন্ততির মধ্যে প্রথম তিনটির অর্থাৎ দিব্যলোক, রোধ্রপুষ্প ও রাজচিত্রকের বিষ, রাজীমল সর্পের তুল্য, এবং শেষোক্ত চারটির, অর্থাৎ পোটগল, পুষ্পভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প এবং বোল্লিতকের বিষ মণ্ডলীসর্পের তুল্য জানিবে।]

চরকঋষির মতে পন্নগী অর্থাৎ স্ত্রীসর্প প্রায়শঃ জ্যৈষ্ঠমাসে ঋতুমতী হয়। আষাঢ়ের সংযোগে পন্নগীর গর্ভধান হয় এবং উহারা কার্তিক মাসে ২৪০টি অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ডগুলির মধ্যে যে-গুলির বর্ণ মরকত মণির সদৃশ, অর্থাৎ সবুজবর্ণ—সেইগুলি হইতে পুংসর্প, যে গুলির উপর লম্বা লাল ডোরা থাকে সেইগুলি হইতে স্ত্রীসর্প এবং যেগুলি শিরীষপুষ্প তুল্য সেই-গুলি হইতে নপুংসক সর্প জন্মে।

যাহারা মানুষকে দংশন করে তাহাদিগকে ভৌম সর্প বলে। ইহারা সংখ্যায় ৮০টা। এই ৮০ প্রকার সর্প পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—দর্বিকর, মণ্ডলী, রাজীল বা রাজীমাল, নির্বিষ এবং বৈকরঞ্জ অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর। কোন কোন সর্প স্বভাবতঃ অতি হিংস্রক—তাহারা বিনা অপরাধেই দংশন করে। কেহ কেহ চরণাহত হইলে, কেহবা ক্রুদ্ধ হইলে, কেহবা ক্ষুধিত হইলে দংশন করিয়া থাকে। কোন কোন সর্প পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দংশন করে, আবার কেহবা অতি নিকটবর্তী না হইলে একেবারেই দংশন করে না। কোন কোন সর্প ভীত হইয়া বা শরীরে অধিক বিষ

সঞ্চয় হইলে দংশন করে। সর্পের স্বভাব অনুযায়ী চরকাদি প্রাচীন বৈদ্যগণ নিম্নোক্তরূপে সর্পের অপর এক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যথা—

(১) ব্রাহ্মণ: গাত্রবর্ণ মুক্তা, রৌপ্য, সুবর্ণবৎ বা কপিল। ফণায় উপবীতের চিহ্ন, মুখ রক্তবর্ণ, গাত্রের গন্ধ—বিল্বপুষ্প, বেণার মূল, পদ্মপুষ্প বা গুল্‌গুলের গন্ধের মত।

(২) ক্ষত্রিয়:—অত্যন্ত ক্রোধী, চক্ষু রক্তবর্ণ। গাত্রের বর্ণ—পাকা-জাম, খেজুর বা কাজলের মত। ফণায় অর্ধচন্দ্র, শঙ্খ, চক্র, লাঙ্গল প্রভৃতি অঙ্কিত থাকে। গাত্রের গন্ধ—জাতিপুষ্প, চাঁপাফুল, পল্লাগপুষ্প, পদ্ম বা অগুরুর মত।

(৩) বৈশ্য: পারাবতের মত গাত্রবর্ণ। গাত্রে বিন্দুতুল্য বা মণ্ডলা-কৃতি চিহ্ন। গাত্রের গন্ধ—ছাগ, কুড়, ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃতের তুল্য।

(৪) শূদ্র:—গাত্রের বর্ণ গম, মহিষচর্ম, চিত্রিত ব্যাঘ্রচর্ম ও কাদার মত। গাত্র রুক্ষ এবং বিন্দু ও রেখাপ্রাপ্ত। গাত্রের গন্ধ মদ্য বা রক্তের তুল্য।

রাজীল সর্প রাত্রির শেষ প্রহরে, মণ্ডলী সর্প রাত্রির প্রথম হইতে তৃতীয় প্রহরে এবং দর্বিকার সর্প দিবসে বিচরণ করে। ব্রাহ্মণ সর্প প্রাতে, ক্ষত্রিয় সর্প মধ্যাহ্নে এবং বৈশ্য ও শূদ্র সর্প অপরাহ্ণে বিচরণ করিয়া থাকে।

এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) ব্যতীত ভবিষ্যপুরাণ (৫০০-১২০০ খ্রীঃ অঃ) ও অগ্নিপুরাণেও (৯০০-১০০০ খ্রীঃ অঃ) সর্প সম্বন্ধে বহু বিবরণ আছে। ভবিষ্যপুরাণ মতে নাগ (Naiae) কুলের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যৌনসঙ্গম ঘটে। পরবর্তী বর্ষাকালে সর্পদেহে তাদের বর্ধন ঘটে। ইহার পর কার্তিক মাসে ২৪০টি করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল ডিম্বের অধিকাংশই তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

অবশিষ্ট ডিম্বগুলি হইতে দুই মাস পরে সর্পশিশু ডিম্ব বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া আসে। অগ্নিপুরাণের মতে এক মাস পরেই তাহারা ডিম্ব হইতে নির্গত হয়। ডিম্ব সকল সুবর্ণাভ হইলে পুংসর্প, ঈষৎ লম্বা (Oval) এবং ফ্যাকাশে বর্ণের হইলে স্ত্রীসর্প এবং উহারা শিরিষ ফুলের বর্ণ হইলে নপুংসক সর্পের উৎপত্তি হয়। সাত দিন পরে সর্পগণ কৃষ্ণবর্ণের হইয়া উঠে এবং পক্ষাধিক কাল পরে ইহাদের বিষ দাঁত (দংষ্ট্রাযু) নির্গত হয় এবং উহা ২৫ দিন পর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ছয় মাস পর নাগকুল খোলস (কঞ্চুক) ত্যাগ করে।

নাগগণ তাহাদের বক্ষাংশের চর্ম বারেক সঙ্কুচিত এবং বারেক বিস্ফারিত করিয়া উহাতে সংলগ্ন সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় পদদ্বারা সঞ্চরণ করে। এই সকল পদান্তরূপ অঙ্গ সংখ্যায় দুই শত চল্লিশ। সর্পের গাত্রে আঁশ (সম্বয়) আছে। এই সকল আঁশ (Scales or scutes) বা সম্বয়ের সংখ্যাও দুই শত চল্লিশ। সম্ভবতঃ উপ-সম্বয়গুলি (Sub-coudals) এই সংখ্যার মধ্যে গণনা করা হয় নাই। সর্পসকল, মনুষ্য, বেঁজি, ময়ূর, চকোর, বৃশ্চিক, শূকর, বিড়াল এবং গরুর খুরের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে। অন্যথায় তাহারা একশত বিশ বৎসর জীবিত থাকিতে সক্ষম। কিন্তু পুরাণকারদের মতে নির্বিষ সর্প মাত্র ৭৫ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকে।

অগ্নিপুরাণের মতে সর্পের সর্বসমেত ৩২টি দন্ত আছে, তন্মধ্যে (উভয় দিকে দুইটি দুইটি করিয়া) চারিটিতে বিষোদ্গার হইয়া থাকে। এই সকল দন্তের নাম যথাক্রমে 'কালরাত্রি' ও 'যমদূতিকা' (Fangs) এবং 'করালী' ও 'মকরী'।

উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দুমনীষিগণ প্রাচীনকাল হইতে ১২০০ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত সর্প সম্বন্ধে বহুবিধ গবেষণা ও আলোচনা

করিয়াছেন। এই সকল তথ্যের সমধিক উৎকর্ষতা ইহাও প্রমাণ করে যে, এই বিদ্যার চর্চা আরও পূর্বকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় প্রাণী-বিদ্যা পাঠে দেখা যায় যে, এই সর্প-বিদ্যার প্রকৃত আলোচনা ১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে ইউরোপে আরম্ভ হইয়াছিল।

দেহ-বিজ্ঞান

* দেহ-বিজ্ঞানকে ইংরাজিতে Anatomy বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে ইহা দুইটি বিশেষ কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল যজ্ঞের পশু বলির প্রথা হইতে; এবং দ্বিতীয়তঃ উহা গড়িয়া উঠিয়াছিল মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসার প্রয়োজন হইতে। ঐ প্রাচীন যুগেও হিন্দুগণ মনুষ্য ও বিবিধ পশুর 'এ্যানাটমী' সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন ত করিয়াছিলেনই, এমন কি তুলনামূলক বা 'কম্‌প্যার‍্যাটিভ এ্যানাটমীর' আলোচনা করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা মানুষের সহিত প্রাণীর এবং এক জাতীয় প্রাণীর সহিত অপর আর এক জাতীয় প্রাণীর এ্যানাটমীর তুলনা করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তৈঃ সং ৪।৬।৯ শ্লোকে এবং উহার শঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, অশ্ব জীবের পার্শ্ব অস্থির সংখ্যা ৩১টি কিন্তু অন্যান্য পশুদের দেহে ২৬টি পার্শ্ব অস্থি আছে। অনুরূপভাবে গজায়ুর্বেদে বলা হইয়াছে যে, পরিশ্রান্ত হস্তী শুণ্ড দিয়া ঘর্ম নির্গত করে, কিন্তু অপরাপর পশু এই অবস্থায় দেহের অন্যাংশ হইতে অধিক ঘর্ম নির্গত করিয়া থাকে। কম্‌প্যারাটিভ্ এ্যানাটমীর আলোচনা তাঁহারা মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁহারা এই সম্পর্কে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া প্রাণিদিগের সহিত বৃক্ষের এ্যানাটমীরও তুলনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নের যজুর আরণ্যকে উক্ত (৮০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ) শরীরতত্ত্ব সম্পর্কীয় শ্লোকটি এই সম্পর্কে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :—

"যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা
তস্য লোমাণি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাদিকা বহিঃ।

ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাৎ তদাতৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ।
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপসাকৃতা।
যৎ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরং পুনঃ।”

উপরের শ্লোকে বৃক্ষের সহিত প্রাণীর দেহাবয়বের তুলনা করা হইয়াছে। শ্লোক রচয়িতা বৃক্ষের পর্ণের (পাতার) সহিত প্রাণীর লোমের, প্রাণীর ত্বকের সহিত বৃক্ষের উৎপাদিকা, প্রাণীর রক্তের সহিত বৃক্ষের রস, প্রাণীর মাংসের সহিত বৃক্ষের শকরা, জীবের অস্থির সহিত বৃক্ষের দারু এবং জীবের মজ্জার সহিত বৃক্ষের উপসাকৃতার যেরূপভাবে তুলনা করিয়াছেন—তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়াভূত হইতে হয়।

[এই যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে জীবের শিরা প্রশিরার নামাদিরও বিশেষ উল্লেখ আছে। উহাতে লিখিত আছে—'যঃ এষোহন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্। যদেকদন্তর্হৃদয়ে জালকমিব। অথৈনয়োরষা স্মৃতির সঞ্চরনী রৈষা। হৃদয়াদূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা।' 'ভিন্ন এবেত্যস্য হিতা নাম নাড্যোহন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ; ৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া অথর্ববেদীয় গর্ভ ও শারীরোপনিষদে শারীর-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে,—যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক ১ অধ্যায় ও ৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

প্রথমে কিরূপে যজ্ঞে প্রদত্ত পশুবলি হইতে প্রাচীন 'এনিম্যাল এ্যানাটমী' গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বিবৃত করিব। প্রয়োজন বিজ্ঞান মাত্রেরই স্রষ্টা। প্রাচীন প্রাণী-বিজ্ঞানও প্রয়োজনবোধে সৃষ্ট হইয়াছিল। যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করিতে গিয়া যেমন হিন্দুগণ জ্যামিতি ও

ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন, তেমনি যজ্ঞের পশুবলি হইতে তাঁহারা দেহ-বিজ্ঞানের পত্তন করেন। এই বিজ্ঞানকে ব্যবচ্ছেদিক বিজ্ঞান বা 'এ্যানাটমিক্যাল জুলজিও বলা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগে যজ্ঞের পশুদিগের এক একটি অঙ্গ ও উপাঙ্গ দ্বারা এক এক প্রকার আহুতির কার্য সমাধা হইত। এইজন্য পশুদিগের সম্পূর্ণ দেহটি সাবধানে ছেদন করিয়া উহার প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ পৃথক করা হইত। এই দেহাংশ সকল তাঁহাদের গন্থি (Joint) হইতে খুলিয়া উহাদের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হইত। কিরূপ সাবধানে জীবের অস্থি প্রভৃতি ও প্রত্যঙ্গগুলি অছিদ্র ও অভিন্ন অবস্থায় গৃহীত হইত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত (৮০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) শ্লোক ও উহার সায়নভাষ্য হইতে বুঝা যাইবে। এই সায়ন ঋষি খ্রীঃ নবম বা দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

"চতুস্ত্রিংশদ বাজীনো দেববন্ধোঃ
বক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।
অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোতি
পরুষ্পরুরণুঘুষ্যা বিশস্ত ক।"

তৈঃ সং ৪।৬।৯

সায়নভাষ্য

বংক্রীঃ বক্রানি পার্শ্বদ্বয়গতানি অস্থীনি,
একৈ কস্মিন্ পর্শ্বে সপ্তদশ ইত্যেবং—চতু-
স্ত্রিংশচৎ সংখ্যাকাঃ অনস্য ত পশোঃ
ষড়বিংশতিরেব। অতঃ সাবধানা
'স্বধিতিঃ' অশ্বং 'সমেতি' (সঙ্গচ্ছতাং), যথা
অস্থি লেশোঽপি হবিষি ন মিলতি তথা

বিযুনক্তি ইত্যর্থঃ। হে শমিতারঃ
'গাত্রা' (হৃদয়াদ্যঙ্গানি) অচ্ছিদ্রা বয়ুনা
(ছিদ্রবর্জ্জিতানি প্রজ্ঞাতানি) যথা ভবন্তি তথা
কৃণোব (কুরুত)। তত্র চায়মুপায়ঃ পরুস্পরু-
রণুত্য (তৎপর্ব্বানুক্রমেন) তৎ ঈদৃশমিতি
কথমাপি জ্ঞাত্বা। বিশস্তঃ (বিশথানং কুরুত)।"

উপরের শ্লোকে ও ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, অশ্বের এক এক পার্শ্বে সতেরোটি করিয়া বক্রাকার পার্শ্ব—অস্থি (ribs) আছে। সর্বশুদ্ধ উহাদের পার্শ্বাস্থির সংখ্যা ৩৪টি ; কিন্তু অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রে ছাব্বিশটি পার্শ্ব-অস্থি (পাঁজরা) আছে। এই অস্থি সকল সাবধানে গ্রন্থি হইতে এক একটি করিয়া বিযুক্ত করিবে যাহাতে হৃদয়াদি অন্যান্য অঙ্গে ছিদ্র বা উহা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই কারণে কোন দেহযন্ত্র দেহের কোথায় কোথায় আছে, তাহা পূর্বাহ্ণেই জানা থাকা প্রয়োজন। ঐ সকল অস্থির সহিত যেন মাংস একটুকও না উঠিয়া আসে।

কিরূপ সতর্কতার সহিত তাঁহারা জীবদিগের দেহাভ্যন্তরে যন্ত্রাদি পরিলক্ষ্য করিতেন তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদোক্ত (॥১॥১৬॥১) নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক ও ভাষ্য হইতে বুঝা যাইবে—

"স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ।
তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ।
অমৃতো হিরন্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে।
য এষস্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ।
যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ

শীর্ষ কপালে। ভূরিতগ্নৌ প্রতীতিষ্ঠিতি
ভূব ইতি বায়ৌ।"

শঙ্করভাষ্য

হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ
প্রাণায়স্তনোঽনেক নাড়ী সুষির, উজ্জ্বলা-
লোঽধোমুখঃ, বিশস্যমানে পশৌ
প্রসিদ্ধ উপলভ্যতে।..... হৃদয়াদুর্দ্ধং
প্রবৃত্তা সুষম্না নাম নাড়ী যোগশাস্ত্রেষু
প্রসিদ্ধা। সা চ অন্তরেণ তালুকে
মধ্যে তালুকযোর্গতা। যশ্চৈব তালুকয়ো-
র্মধ্যে। স্তন ইব অবলম্বতে মাংসখণ্ডঃ,
তস্য চান্তরেণে তেত্যৎ। যত্রচ
অসৌ কেশান্তঃ কেশনামান্তে মূলং কেশান্তঃ
বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে। মূর্দ্ধ প্রদেশ
ইত্যথ। তং দেশং প্রাপ্য ব্যপোহ বিভজ্য
বিভার্য্য শীর্ষ কপালে শিরঃ কপালে,
বিনির্গতা যা,......।

তাৎপর্য্যঃ—হৃদয় বহুতর নাড়ী ছিদ্রে পরিপূর্ণ, উহা ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ পদ্মসদৃশ মাংস খণ্ড; নিহত পশুর শরীরে যাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সুষুম্না নামে নাড়ী আছে, উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সুষুম্না নাড়ীটি উভয় তালুকার মধ্যগত। উক্ত তালুদ্বয়ের মধ্যে (গোবৎসের) স্তনের ন্যায়

এই যে মাংস খণ্ড লম্বমান আছে ; তাহারও মধ্যে এবং এই কেশান্ত অর্থাৎ (কেশানাং অন্ত মূলং) মস্তকের কপালদ্বয় বিদারণ (foramen) পূর্বক তাহা নির্গত হইয়াছে।

উপরোক্তরূপে বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এতদসম্পর্কীয় শ্লোক-সমূহ সঙ্কলিত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, বহু জীবজন্তুর দেহের অভ্যন্তরের ও বাহিরের অঙ্গাদির সমাবেশের বর্ণনা সহ একটি মূল্যবান পুস্তক রচিত হইয়াছে।

আমরা অশ্ব ও অন্যান্য জন্তুর পঞ্জরাস্থি হৃদযন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা সহ শ্লোক ইতিপূর্বেই উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। তৈঃ সংহিতা ১।১।২ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, অশ্ব-মুণ্ডের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (তৈঃ সং ৭।৫।২৫ ও বাঃ সং, ২৫) অন্যান্য প্রাচীন শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, অশ্বের নানা অঙ্গ বৎসরের নানা ভাগ এবং প্রকৃতির নানা বিষয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তৈঃ সং, ৫।৭।১৭, ৫।৭।২২ শ্লোকে অশ্বের অন্ত্র এবং পর্শুকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। বাঃ সঃ, ২৫।৩ ; তৈঃ সং ৫।৭।১৩ শ্লোকে অশ্বের ক্ষুর এবং বাঃ সঃ ১১।৬ শ্লোকে উহার চর্বণ দন্তের এবং তৈঃ সং, ৫।৭।১৭ শ্লোকে অশ্বের বৃহদন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। ঋকবেদ, ১।১০।৩ শ্লোকে জীবের 'কক্ষ্য' (girth), শঃ ব্রাঃ ৫।৪।৬ শ্লোকে ক্লোমন (ফুস্‌ফুস্‌) এবং বৃঃ আঃ ১।১ শ্লোকে গুদা (Rectum) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আমরা কয়েকটি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পাইয়া থাকি। যথা, girth অর্থে 'কক্ষ্য', 'পক্বাশয়' অর্থে 'স্টমাক্‌', গুদা অর্থে rectum, ক্লোমন অর্থে 'ফুস্‌ফুস্‌', বৃহদন্ত্র অর্থে colon, অন্ত্র অর্থে 'ইন্‌টেস্‌টাইন', হৃদয় অর্থে 'হার্ট', 'পর্শ্বব' অর্থে ribs, যকৃৎ অর্থে Liver, প্লীহা অর্থে spleen ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত জীবদেহকে পৃষ্ঠ,

উদর, পার্শ্ব, জঘন, অঙ্গসন্ধি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র ও অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থেও অশ্বের দেহের বিভিন্নাংশের বিভিন্ন রূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

তৈঃ উঃ॥১।১৮॥ শ্লোকে সাধারণভাবে চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্‌, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থিমজ্জা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। মহর্ষি পিপ্পলাদের গর্ভোপনিষদে (৮০০-৬০০ খ্রী পূঃ) জীবদেহের বিভিন্ন অংশের একটি সম্পূর্ণ তালিকাও সাধারণভাবে দেওয়া আছে। বাংলা তর্জমা সহ মূল শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"চতুষ্কপালং শিরঃ ষোড়শ পার্শ্বদন্ত পটলানি,
সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতং সশীতকং সন্ধিশতং সনবকং
স্নায়ুশতং সপ্তশিরাশতানি পঞ্চমজ্জাশতানি অস্থিনী
চ পু বৈ ত্রীনী শতানি ষষ্টিঃ সার্দ্ধচতস্রো রোমানি
কোট্যো হৃদয়ং পলান্যষ্টৌ-দ্বাদশ পলানি জিহ্বা
পিত্তপ্রস্থং। কফস্যচকং শুক্রং কুড়বং মেদ প্রস্থৌ
দ্বাবানি যতং মূত্র পুরীষমাহার পরিমানাৎ।

তাৎপর্য :—মস্তকে চারিখানি কপাল (প্রধান অস্থিময় অংশ), ষোড়শ পার্শ্ব, ষোড়শ দন্তস্থল, ষোড়শ পটল, একশত মর্মস্থান (Sub-brain and ganglion), একশত অশীতি (১৮০) সন্ধিস্থান, একশত স্নায়ু, সপ্তশত শিরা, পঞ্চশত পেশী, তিনশত ষষ্টি (৩৬০) অস্থি, সাড়ে চারকোটি রোম, অষ্টপল রস, দ্বাদশ পল জল, এক প্রস্থ পিত্ত, এক অস্তক কফ, এক কুড়ব শুক্র, দুই প্রস্থ মেদ ইত্যাদি আছে।

উপরের শ্লোকটিতে যে পশু বা শিশু পশু সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, [সম্ভবতঃ মনুষ্য সম্বন্ধে বলা হয় নাই।] তাহা উল্লিখিত

শ্লোকে বর্ণিত দন্ত, পার্শ্ব (ribs) প্রভৃতির সংখ্যা হইতে অনায়াসে বুঝা যায়। মনুষ্য বুঝাইলে দন্তের সংখ্যা ১৬টির বদলে ৩২টি বলা হইত। খুব সম্ভবতঃ যজ্ঞে 'বলিপ্রদত্ত' কোনও এক জীব সম্পর্কেই উপরোক্ত তথ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অশ্বজীব ব্যতীত আর যে সকল পশু বা জীব যজ্ঞের জন্য, প্রাচীন ভারতীয়েরা নিধন করিতেন তাহাদের কয়েকটির নাম নিম্নের তালিকাতে প্রদত্ত হইল :—

	প্রাণী	বাংলা নাম	প্রামাণ্য শ্লোক
(১)	ছাগ	ছাগল	ঋঃ বেঃ ১।১২৫
			বাঃ সঃ ২৫।২৬
(২)	অশ্ব	ঘোড়া	ঋঃ বেঃ ১।১৫২।১৬৩
(৩)	উদ্দালক	উড়িয়াল বা শ্বেতপদমেষ	অঃ বেঃ ৩।২৯
(৪)	উষ্ট্র	উট	তৈঃ সঃ ২৪।২৮
			„ „ ২৪।৩৯
(৫)	উদ্র	উদ্বিড়াল	চঃ সঃ ২৪।০৭
(৬)	ঋক্ষ	ভল্লুক	চঃ সঃ ২৬।৩৬
(৭)	ঋষ্য	নীল গাই	বাঃ সঃ ২৪।৩৭
(৮)	কর্কট	কাঁকড়া	তৈঃ সঃ ৫।৫।১৫
(৯)	কশ	মূষিক	তৈঃ সঃ ৫।৫।১৭,১৮
(১০)	কুলুঙ্গ	কুরঙ্গ মৃগ,	বাঃ সঃ, ২৪।৩০,৩৫
		কালসার বা	তৈঃ সঃ, ৫।৫।১১
		কৃষ্ণ হরিণ	„ „ ৫।৫।১৫,১৯
(১১)	ক্রোষ্ট	খেঁকশিয়াল	বাঃ সঃ ২৪।৩২

প্রাণী	বাংলা নাম	প্রামাণ্য শ্লোক
(১২) খড়্গ	গণ্ডার	বাঃ সঃ ২৪।৪০,৩০
		,, ,, ২৪।২৮
(১৩) গবয়	গোমৃগ	তৈঃ সঃ ৫।৬।১১
	গয়াল	১।৮।১৯
	গো	২।১।৮
(১৪) জতু	বাদুড়	বাঃ সঃ ২৮।২১, ৩৬
(১৫) তরক্ষ	চিতা	বাঃ সঃ ২৭।৪০

পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ তান্ত্রিক যুগে এইরূপ পশুবলি ব্যাপকরূপে প্রচলিত ছিল। এই সময় হিংস্র পশুদেরও বলি দেওয়া হইত। তন্ত্রোক্ত নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইব যে, মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, সজারু, শশক, গোসাপ, কূর্ম, গণ্ডার এবং আরও অন্যান্য জীব বলি দেওয়ার রীতি ছিল। এই অন্যান্য জীব সম্পর্কে প্রাচীন টীকাকার কুক্কুট, পারাবত, সিংহ, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর প্রভৃতির কথাও বলিয়াছেন। কথিত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। এই শ্লোকে খড়্গীরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষারও সন্ধান পাই। এইখানে গণ্ডার জীবকে খড়্গী বলা হইয়াছে।

> "সর্ব্বোপচারে সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ
> মৃগচ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপ শূকরস্তথা ॥
> শল্লকী, শশকো, গোধা, কূর্ম্ম খড়্গী দশস্মৃতাঃ
> অন্যানাপি পশুন দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতাঃ ॥"
>
> —১০৬-১০৭ ষষ্ঠোল্লাস, মহানির্বাণ তন্ত্র।

যজ্ঞের পশুবলি হইতে কিরূপে দেহ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা

বলা হইল। এইবার চিকিৎসাকার্যের তাগিদে উৎপন্ন দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বস্তুতঃপক্ষে, পশুবলি, দেহ-বিজ্ঞান সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিল। এই চিকিৎসা-বিদ্যা কেবল মনুষ্য চিকিৎসার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, উহা হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি বিবিধ পশুর চিকিৎসার কারণেও এদেশে গড়িয়া উঠে।

আয়ুর্বেদে (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) সর্বপ্রথম আমরা মনুষ্য চেরাই বা মনুষ্যদেহের ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ দেখি। এই সময়ে হিন্দুগণ জলের উপর মাচা বাঁধিয়া উহাতে মানুষের মৃতদেহ কুশ বা ঘাসের দ্বারা আবৃত করিয়া সাত দিন যাবৎ জলের মধ্যে রাখিয়া পচাইয়া লইতেন। ইহার পর কাঁচা বাঁশের তন্তুর দ্বারা নির্মিত 'বুরুশের' সাহায্যে ঐ দেহের উপরের চর্ম ও পরে উহার তন্তুর অপসরণ করিয়া শিরা, উপশিরা, শিরাজাল, রক্তধমনী, রসনলী, স্নায়ু ইত্যাদি বহির্গত করিয়া অবলোকন করা হইত।

চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে, মনুষ্যদেহের বিবিধ অস্থি, স্নায়ু, ধমনী, রসনলী এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি, উহাদের অবস্থান, উৎপত্তিস্থল, সংখ্যা ও কার্যকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যদেহ-বিজ্ঞানের আলোচনা এই স্থানে আমি অধিক করিব না। কারণ, এই সম্বন্ধে বহু ইংরাজি ও বাংলা পুস্তক ইতিমধ্যে রচিত হইয়াছে। এক্ষণে কেবলমাত্র বিবিধ পশুজীবের দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর্যঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব। এই সম্পর্কীয় বহুবিধ তথ্য গজায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

গজায়ুর্বেদ প্রণেতা 'পালকোপিয়' এবং অশ্বায়ুর্বেদ প্রণেতা 'নাগার্জুন' প্রাচীন ভারতে 'প্রাণী-বিদ্যা'র নিমিত্তেই প্রাণী-বিদ্যার আলোচনা করেন।

আমি অশ্বায়ুর্বেদের মূল সংস্কৃত নকল দেখিয়াছি। উহাতে গজের ন্যায় অশ্বেরও প্রাপ্তিস্থান, দেহ-বিজ্ঞান প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত গো-সম্পর্কীয় অনুরূপ গবায়ুর্বেদ নামক এক প্রাচীন পুস্তকও আমি দেখিয়াছি। উহা হইতে আমরা গো-জাতীয় জীবের দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারি। এক্ষণে আমি কেবলমাত্র গজায়ুর্বেদে উল্লিখিত হস্তী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গজায়ুর্বেদ গ্রন্থটি অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাত নরপতির প্রার্থনাক্রমে মহর্ষি পালকাপ্য আজ হইতে প্রায় সার্ধসহস্রাব্দী (৪৫০ খ্রীঃ অঃ) পূর্বে প্রণয়ন করেন। মহর্ষি পালকাপ্য মাতঙ্গদেহের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে মানবদেহের উপাদানের সাদৃশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি মাতঙ্গদিগকে ভদ্র, মন্দ, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ—এই চারিটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশজ অরণ্যজাত হস্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট, আকৃতি ও স্বভাবের সামান্য সামান্য প্রভেদ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণিদিগের প্রাচীন ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কীয় একটি পৃথক প্রবন্ধে আমি এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন হস্তীর বহিরঙ্গের বিবরণ এবং ভৌগোলিক বিস্তার-সহ উহাদের আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রাদির সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছে। এই সকল আলোচনার বিষয়বস্তু হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সময় তাহারা হস্তী-চিকিৎসা শিক্ষার জন্য মৃত ও জীবিত হস্তীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতেন। নিম্নে এই সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি বিবরণের মূল সংস্কৃতের বাংলা তর্জমা উদ্ধৃত করা হইল :—

"মুখে প্রথমতঃ কৃষ্ণান্তর (কৃষ্ণবর্ণ অভ্যান্তর) তাহার পরে তালু, তালুমধ্যে স্রোতোদ্বয়, নাসারন্ধ্রাদ্বয়, অতঃপর তালুবংশ, তাহার পরে জিহ্বা এবং তদভ্যান্তরে ভক্ষণার্থ দন্ত—উর্ধ্বপংক্তিতে ষোলটি এবং নিম্ন

পংক্তিতে ষোলটি। তন্মধ্যে চারটি দংষ্ট্রা। তৎপর ওষ্ঠ এবং প্রস্রাব এবং শুক্কাভ্যন্তরে বর্ত্মদ্বয়। ওষ্ঠদ্বারের উভয় পার্শ্বে ওষ্ঠ প্রস্রাব এবং তাহার নিম্নে ওষ্ঠবাহুদ্বয় বা ওষ্ঠ সন্ধিদ্বয়। তৎপর সৃক্কনীদ্বয়। ওষ্ঠের নিম্নে লোমকুর্চ। গ্রীবাতে গ্রীবাপৃষ্ঠ এবং তাহার নিম্নে গলয়। তৎপরে কণ্ঠদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি ধমনী। গলপার্শ্বে দুর্দুর এবং তাহার উপরিভাগে মন্যাদ্বয়। মন্যার উপরিভাগে গুহাদ্বয় এবং তন্নিম্নে সমুদ্গ্। তাহাদের পার্শ্বদ্বয়ে পিণ্ডিকাদ্বয়, তাহার উপরে গুহাভাগ। তৎপরে যতস্থান ও পাক্ষিঘাতদ্বয় এবং উপরিভাগে উৎসঙ্গদ্বয়। তদুপরি স্কন্ধ এবং স্কন্ধ মধ্যে পণবক প্রদেশ। বক্ষঃস্থলে গ্রীবাসন্ধি এবং তন্মধ্যে অন্তর্মণি। অন্তর্মণির নিম্নে উরোমণি। উরোমণির উভয়পার্শ্বে গাত্র সন্ধ্যাশ্রিত বিক্ষোভ। বিক্ষোভের মধ্যে আবর্তমণি এবং আবর্ত্তমণি হইতে হৃদয়। তৎপরে উরঃস্থল। তৎপরে উরঃসন্ধি এবং উরোগাত্র মধ্যে চতুরক্ষান্তর। হৃদয়ে স্তনদ্বয় এবং তাহার অগ্রভাগে চুচুকদ্বয়, মধ্যে ক্ষীরকা।"

গজায়ুর্বেদের কয়েকটি খণ্ডে উপরোক্ত রূপ প্রাচীন পরিভাষাসহ হস্তীর ঊর্ধ্ব, মধ্য ও অধঃপ্রদেশ প্রাণ বিবৃত করা হইয়াছে। উপরে মাত্র উহার ঊর্ধ্বপ্রদেশ প্রাণ সম্পর্কীয় তথ্য উদ্ধৃত করা হইল। হস্তী-জীবের ঊর্ধ্বদেশের ন্যায় এই গ্রন্থে উহাদের মধ্য ও অধঃদেশের বর্ণনা আছে। মূল হস্তীজীবের ব্যবচ্ছেদিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুগণ যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তর্জমা হইতে বুঝা যাইবে।

"বারণ দেহে সাত শত পেশী বর্তমান। ঐ পেশী সকল অস্থি আশ্রিত, স্নায়ুবদ্ধ এবং ত্বক দ্বারা আবৃত। উহা ফুসফুসের অধীন, তদ্ভিন্ন উহাদের হৃদযন্ত্র বক্ষস্থলের বামস্তনের নিম্নপ্রদেশে বর্তমান। যকৃৎ হৃদ্‌যন্ত্রের পার্শ্বে বিদ্যমান, ক্লোম বক্ষস্থলে অবস্থিত, প্লীহা যকৃতেরই

নিকটবর্ত্তী। স্থূল অন্ত্রও হৃদয়ের নিম্নপ্রদেশে এবং তাহার নিকটে পরস্পর সংলগ্ন আমাশয় ও পক্বাশয় বিদ্যমান। শিরা ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত, গোলাকৃতি, দীর্ঘ অপেক্ষাকৃত সবল। স্নায়ুসমূহ বন্ধাবনদ্ধ, ঘন, পৃথু ও কণ্ডুর। উহাদের মূত্রবস্তি ও মুষ্কদ্বয় জঘনদেশে অবস্থিত। মাংস অস্থি-আশ্রিত, রক্ত মাংসের অনুগত, মজ্জা অস্থির অভ্যন্তরে অবস্থিত, শুক্র মজ্জাশ্রিত, মেদ মাংসের আশ্রিত, শিরা মাংসেরই অধীন। লোমাবলী ত্বকের উপরিভাগে জন্মে এবং ত্বক মাংসাবৃত করিয়া বিদ্যমান থাকে। উহাদের বাত, পিত্ত, কফ, শুক্র, মেদ, রক্ত, মজ্জা, মাংস ও মলমূত্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।"

উপরে উল্লিখিত আখ্যান ভাগ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঐ সময় হিন্দুগণ জীবদিগের দেহের বিভিন্ন অংশ বুঝাইবার জন্য বিবিধ পরিভাষারও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জীবদিগের অস্থি-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান তাহাদের কিরূপ সুদূরপ্রসারী ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অপর আর এক সংস্কৃত আখ্যানের বাংলা তর্জমা হইতে বুঝা যাইবে।

"বারণগণের মস্তকে দুইখানি প্রধান অস্থি, কপালে ও গ্রীবাদেশে আটখানি অস্থি, সগদপ্রদেশে একখানি অস্থি এবং তাহার দক্ষিণে ও বামে দুইটি সন্ধি। স্কন্ধপ্রদেশে অস্থি দুইখানি এবং সন্ধি চারিটি। মুখবিবরের উর্দ্ধভাগে ও মধ্যভাগে ষোলটি ক্ষুদ্র দন্ত ও দুইটি প্রধান ও প্রহারকারী দন্ত। সর্বসমেত অষ্টাদশ দন্ত এবং তাহার অষ্টাদশটি সন্ধি আছে। গলনলী বলয়াকৃতি চতুষষ্ঠী অস্থি ও তাহার সপ্তষষ্ঠী সন্ধি বর্তমান আছে। তদ্ভিন্ন তলগ্রহে ও তলকর্ষে এক একখানি প্রতবাস্থি। চতুষ্পদে আটখানি প্রতবাস্থি এবং তাহার ষোলটি সন্ধি বিদ্যমান। পলিপাদ কর্ণদ্বয়, প্রোহদ্বয় ও প্রোহ—সন্ধিসমূহে বিংশতিখানি গুলি-

কাস্থি, চরণ চতুষ্টয়ে অশীতিখানি গুলিকাস্থি, বিংশতি নখ এবং শতাধিক সন্ধি বর্তমান আছে। উহাদের বাহুদ্বয়ে একখানি বিশেষ অস্থি ও দেহের পূর্বভাগে ছয়খানি বিংশ-অস্ত্র এবং তাহার ছয়টি সন্ধি বর্তমান। জঘনপ্রদেশের সর্বাংশ ব্যাপী একখানি মাত্র কপালাস্থি। তদ্ভিন্ন মাতঙ্গগণের বক্ষঃস্থলে চতুর্দশ অস্থি এবং তাহার পঞ্চদশ সন্ধি বর্তমান। উহাদের পৃষ্ঠদেশে বংশ-অস্থি ও একবিংশতি সন্ধি, উভয়পার্শ্বে চল্লিশ-খানি অস্থি এবং তাহার ৪২শটি সন্ধি বর্তমান। উর্ধ্বাস্থি একবিংশতি-খানি এবং তাহার সন্ধিও একবিংশতি উহাদের দেহে বর্তমান আছে। মাতঙ্গগণের লাঙ্গুল-বংশে ও লাঙ্গুলে বিংশতিখানি গুলিকাস্থি এবং ত্রিংশৎ সন্ধি বিদ্যমান। এইরূপে পূর্ণাবয়ব বারণের দেহে তিন শত বিশখানি অস্থি এবং ৩৬০টি সন্ধি বর্তমান আছে।"

নিম্নে গজায়ুর্বেদ হইতে মূল সংস্কৃতের অন্য আর একটি অনুরূপ বিবরণের বাংলা তর্জমা দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা শিরা তিন প্রকার বুঝিতেন—যথা, রসবাহী, রক্তবাহী এবং প্রকৃত শিরা বা স্নায়ু। প্রথম আখ্যানভাগে আমরা ধমনীর (রক্তবাহী) উল্লেখ দেখিয়াছি।

"হৃদয় দেশ হইতে জিহ্বা পর্যন্ত যে দশটি রসবহ সূক্ষ্ম শিরা বিদ্যমান আছে তদ্দ্বারা বারণগণ তিক্ত, মধুর প্রভৃতি রসগ্রহণ করিয়া থাকে। এবং পক্কাশয়ে নিবদ্ধ চতুর্দশটি শিরার দ্বারা 'আপন' বায়ুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। হস্তীদেহ শিরাজালে সমাবৃত। কিন্তু হস্তিনীদের প্রত্যেক স্তনে অধিক দশটি করিয়া ক্ষীর বহা শিরা বিদ্যমান।"

নিম্নে এইরূপ অপর একটি মূল সংস্কৃতের বাংলা ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইল। যতদূর বুঝা যায়, এই শিরাগুলি রক্তবাহী। কারণ ইহাতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, উহারা জলপ্রণালীর তুল্য।

বারণগণের বক্ষদেশে আটটি স্নায়ু বিদ্যমান, বালুপুষ্করে চারিটি, এক এক চরণে কুড়িটি করিয়া স্নায়ু, মুষ্কে, পুংচিহ্নে, উদরে ও মলদ্বারে অষ্টবিংশতি স্নায়ু বিদ্যমান। মাতঙ্গদেহে এতদ্ভিন্ন আরও পঞ্চদশটি মহাস্নায়ু বা প্রধান স্নায়ু আছে—তন্মধ্যে ৭টি দেহের উর্ধ্বভাগে, ৬টি অধোভাগে এবং দুইটি পার্শ্বদেশে তির্যকভাবে প্রসারিত। ভূতল যেমন জল প্রণালীর দ্বারা আস্তৃত, বারণদেহ তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা ব্যাপ্ত।"

"মাতঙ্গদেহের স্রোতসমূহও বা শিরাবিশেষও জ্ঞাতব্য। উহাদের শুণ্ডে একটি ও তালুদেশে ২টি শিরা, মুখমণ্ডলে দুইটি, নেত্রদ্বয়ে ২টি, কটিদ্বয়ে ২টি, কর্ণদ্বয়ে ২টি, স্তনদ্বয়ে ২টি, মূত্রদ্বারে ১টি ও মলদ্বারে ১টি —এই সর্বসমেত পঞ্চাশটি স্রোত বারণদেহে বর্তমান।"

উপরোক্ত 'ভেইন' ও 'আর্টারি' প্রভৃতি রক্তধমনী ব্যতীত, গজায়ুর্বেদে প্রকৃত শিরা বা স্নায়ু সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। মূল সংস্কৃতের কতকাংশের স্নায়ু সম্পর্কীয় বাংলা তর্জমা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"হে অঙ্গনাথ—উহাদের শরীর ব্যাখ্যা করিতেছি। ৪০শটি শিরার ক্রিয়ার দ্বারা বারণদেহে প্রসারণ ও সঙ্কোচন কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ চল্লিশটি শিরার দ্বারা উহাদের উত্থান ও উপবেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ছয়শত শিরার দ্বারা উহার গতি, চল্লিশটি শিরার দ্বারা জম্ভ্ৃন (হাই তোলা), দশটির দ্বারা শুণ্ডের সাহায্যে আহার গ্রাস গ্রহণ, দশটি শিরার দ্বারা স্কন্ধপ্রদেশ সঞ্চালন, দশটির দ্বারা ভক্ষণ, এবং দশ দশটির দ্বারা পক্কভুক্ত দ্রব্য নিগীরণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন হয়। তদ্ভিন্ন মস্তক ধারণে বিংশতিটি শিরা ক্রিয়া করে, এবং গ্রীবার পার্শ্বদেশে তিনটি করিয়া শিরা লক্ষিত হয়, ফলতঃ স্কন্ধদেশে দশটি শিরাই উহাদের শিরশ্চালনে সাহায্য করে। সেইরূপ দশ দশটি শিরার ক্রিয়ার দ্বারা উহাদের পানীয় গ্রহণ ও পরিত্যাগ, নিমেষ, উন্মেষ, শ্রবণ,

দর্শন, গন্ধ গ্রহণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকল নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ছত্রিশটি শিরার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন উহাদের গণ্ডদ্বয়ে যে-দশটি করিয়া শিরা আছে উহা বারণগণের মদস্রাব ক্রিয়ার সাহায্য করে। দশ দশটির দ্বারা উহারা কর্ণদ্বয় সঞ্চালন করে। ত্রিশটির দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ, দশটির দ্বারা বৃংহণ, দশটির দ্বারা পুচ্ছ সঞ্চালন, দশটির দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন নির্বাহ হয়। বারণগণ একশত ছত্রিশটি শিরার দ্বারা বমন ও স্বেদ নিঃসারণ করে। সেইরূপ হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্যন্ত একশত দশটি শিরাসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহার দ্বারা মল ধারণ ও মূত্রত্যাগ প্রভৃতি অন্ত্রসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-সমূহ সম্পন্ন হয় ও দশটির দ্বারা মলত্যাগ সম্পন্ন হয়। পক্কাশয়গত চতুর্দশটি শিরার দ্বারা বাতবহন, গ্রহনীদীপন প্রভৃতি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন দশ দশটির দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষের সঞ্চার এবং অঙ্গসন্ধিসমূহে নিবদ্ধ। উল্লিখিত শিরাসমূহ চতুর্বিংশতি সংখ্যক দৃষ্ট হয়।"

উপরোক্ত তথ্য ব্যতীত হস্তী সম্পর্কীয় ভ্রূণ বিদ্যা সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ জীবের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধেও বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে, আরও বলা হইয়াছে যে, উহাদের নেত্রদ্বয়ের পক্ষ্মরাজি, মস্তকস্থ কেশ, দেহস্থ লোমাবলী এবং পুচ্ছের লোমসমূহ অসংখ্য।

উপরোক্ত তথ্য হইতে বুঝা যায় যে,ভারতবর্ষে 'এ্যানিম্যাল এ্যানাটমী' ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ কালে আরম্ভ হয় এবং উহার চর্চা অবলীলাক্রমে ৪৫০ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত চলিতে থাকে। মনুষ্য 'এ্যানাটমী' সম্বন্ধে দেখা যায় যে, উহা ভারতবর্ষে ১০০-২০০ খ্রীঃ অঃর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

ইউরোপে এ্যারিষ্টলের সময় (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) প্রাণী-বিজ্ঞানের

চর্চা আরম্ভ হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেহ-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছিল এরূপ বলা যায় না। কারণ, এ্যারিষ্টলের মতে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য এবং Artery (রক্তধমনী) বায়ুপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে Galen (১৩০ খ্রীঃ অঃ) সর্বপ্রথম স্তন্যপায়ী জীবদিগের 'এ্যানাটমী' বিবৃত করেন। 'গ্যালেনের' পর ষোড়শ শতাব্দীতে Vasalius মনুষ্যদেহ এবং Cyter Bellanus, Soverino (১৬৪৫ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনুষ্যেতর জীবদেহের 'এ্যানাটমী' তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইউরোপে প্রকৃতপক্ষে ১৩০ খ্রীঃ অঃ প্রাণিদিগের 'এ্যানাটমী'র সৃষ্টি হয় এবং ঐ দেশে তুলনা-মূলক এ্যানাটমী সৃষ্ট হয় ১৬৪৫ খ্রীঃ অঃ বরাবর। ঐ সময় বরাবর ঐ দেশে মনুষ্যদেহেব বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদও আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ ববাবর কালে 'এ্যানিম্যাল এ্যানাটমী' সৃষ্টি হইতে থাকে। ঐ সময় বরাবর বিবিধ জীব-দেহের তুলনামূলক আলোচনাও করা হইত। ভারতবর্ষে মনুষ্যদেহের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ ১০০-২০০ খ্রীঃ অঃর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, এবং ৪৫০ খ্রীঃ অঃ ববাবর গজায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতাগণ মনুষ্যদেহেব অনুকবণে হস্তী প্রভৃতি জীবদেহের 'এ্যানা-টমী'র বর্ণনা করিতে থাকেন।

শরীর-বিজ্ঞান

'এ্যানিম্যাল এ্যানাটমী' বা ব্যবচ্ছেদিক বিজ্ঞানের ন্যায় শরীর-বিজ্ঞান বা 'এ্যানিম্যাল, ফিজিওলজি'ও প্রয়োজনের তাগিদে এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দেশে যজ্ঞের এবং চিকিৎসার জন্য 'এ্যানাটমী' গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনুরূপভাবে 'এ্যানিম্যাল ফিজিওলজি' এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল চিকিৎসা বিদ্যা এবং যোগাভ্যাসের কারণে।

যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রেব প্রচার হইতে এই বিদ্যার উদ্ভব হয়। এক শ্রেণীর হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে, যোগবলে মানুষ অনাহারে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া বহুকাল অবস্থান করিতে পারে। পরবর্তীকালে এই যোগশাস্ত্র প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসে এবং তখন ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। এই সময়ে হিন্দুগণ লক্ষ্য করে যে, ভল্লুক, ব্যাঙ, সাপ, কূর্ম প্রভৃতি জীব শীতকালে অনাহারে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া গর্তের মধ্যে জীবন যাপন করে। কিরূপ দৈহিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাহারা ঐরূপভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারে তাহা জানিবার জন্য ঐ সময় কেহ কেহ ঐ জীবগুলির দেহ ব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে হিন্দুগণ জীবদিগের শ্বাস ক্রিয়া, রক্ত চলাচল প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু তথ্য জানিতে পারেন। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রামাণ্য শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য :—

"পিঙ্গলা কুবর সর্প সারঙ্গষেব কোবনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ বড়েতে গুরবো মম॥"

বিভূতিপাদ, পাতঞ্জল দর্শনম্।

উপরের শ্লোকটিতে যোগীগণকে কবরপক্ষী ও অজগর সর্পের নিকট

হইতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যোগ-বিদ্যা শিক্ষার্থে জীবদিগের জীবনপদ্ধতি ও উহাদের শ্বাসক্রিয়া পর্যালোচনের প্রয়োজন হইত। "আনারম্ভোপি সুখী সর্পবৎ"—কপিল প্রণীত সাংখ্যের একটি প্রধান উপদেশ। যোগশাস্ত্র যে এই কূর্ম, ভল্লুক, সর্প ও ভেকাদির শ্বাসক্রিয়া ও জীবনপদ্ধতি নিরূপণের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যাইবে :—

"সম্প্রাতি দর্দুরা শীতে ফণিনঃ পবনশনাঃ
কূর্মাশ্চিবাঙ্গ গোপ্তাবা দৃষ্টস্তা যোগীনোমতাঃ ॥

সমাধিপদ, পাতঞ্জল।

তাৎপর্য :—শীতকালে কূর্ম, সর্প ও ভেকগণ অনাহারে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিরূপে উহা তাহাদের মধ্যে সম্ভব হয়, যোগীগণকে তাহাদের জীবন-পদ্ধতি হইতে তাহা জানিতে চেষ্টা করা উচিত।

যোগশিক্ষার্থীগণের কেহ কেহ তাহাদের অন্ধ-বিশ্বাসের কারণে সর্পাদির অনুকরণে তাঁহাদের স্ব স্ব জিহ্বার নিম্নত্বক ছিন্ন করিয়া উহা সর্পাদির ন্যায় দীর্ঘ ও পাতলা করিবার জন্য উহাতে নবনীত মাখাইয়া লৌহ আঙ্কোড়নীর দ্বারা উহা আকর্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শীতনিদ্রার সময় সর্পাদি যেমন তাহাদের জিহ্বা উৎকর্ষণপূর্বক কণ্ঠকূপে প্রবিষ্টকরতঃ সুখে ও নিরাশনে কাল যাপন করে, যোগীরাও সেইরূপ তাহাদের লম্বিত জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপ-জিহ্বাকে চাপিয়া শ্বাস-ছিদ্রের অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধকরতঃ কুম্ভকাবিষ্ট হইতেন। এই কার্যে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন তাঁহাদিগকে খেচরী-সিদ্ধ বলা হইত।

যোগশাস্ত্রের ইহা একটি প্রাথমিক শিক্ষা। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি প্রামাণ্য শ্লোক প্রদত্ত হইল :—

"ছেদন-চালন-দোহৈ জিহ্বাং সংবর্জয়েত্তাবৎ।
যাবদিয়ং ভ্রূমধ্যং স্পৃশতি ভবতি তদা খেচরীসিদ্ধ॥"

পাতঞ্জল-দর্শনম্ (মহাভাষ্য)।

এতদ্ব্যতীত যোগীগণ শ্বাসনিয়ন্ত্রণকারী প্রাণায়ামও বিবিধ প্রাণিদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে, কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে-সকল প্রাণীর শ্বাস সংখ্যা অল্প ও অল্পায়াত, সেই সকল প্রাণীরাই দীর্ঘজীবী হয়, এবং যাহাদের শ্বাস-সংখ্যা কিছু অধিক এবং দীর্ঘ তাহারা অল্পায়ু হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন মনুষ্যগণও যদি আপনাদের শ্বাসপ্রশ্বাস অল্পায়তঃ ও অল্প সংখ্যক করিতে পারে তাহা হইলে তাহারাও আপন আপন নির্দিষ্ট জীবনকাল অপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারিবে। জীব শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস-আয়তনের স্বল্পতা প্রযুক্তই যে দীর্ঘজীবী হয়,"স্বরোদয় যোগে" তাহার কার্যকরণ বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে। নিম্নে তদনুযায়ী একটি ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রাণী	প্রতি মিনিটে	প্রায়িক শ্বাসসংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু
শশ	"	৩৮।৩৯	৮ বৎসর
কপোত	"	৩৬।৩৭	৮।৯ "
বানর	"	৩১।৩২	২০।২১ "
কুক্কুর	"	২৮।২৯	১৩।১৪ "
ছাগল	"	২৩।২৪	১২।১৩ "
বিড়াল	"	২৪।২৫	১২।১৩ "

প্রাণী	প্রতি মিনিটে	প্রায়িক শ্বাসসংখ্যা*	প্রায়িক পরমায়ু
ঘোড়া	„	১৮।১৯	৪৮।৫০ বৎসর
মনুষ্য	„	১২।১৩	১০০ „
হস্তী	„	১১।১২	১০০ „
সর্প	„	৭।৮	১২০।১২২ „
কচ্ছপ	„	৪।৫	১৫০।১৫৫ „

প্রাণিদিগের উপরোক্তরূপ শ্বাস ও আয়তনের পর্যবেক্ষণের জন্য যোগীদিগের নিশ্চয়ই জীবদিগের শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক দেহ-যন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে হইত। সর্পাদির অনুকরণে যাঁহারা নিজেদের জিহ্বা পরিবর্তনের প্রয়াস পাইতেন তাঁহারা এই কারণে জীবাদির দেহ কর্তনকরতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির সমাবেশ পরীক্ষা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! তবে আমি মনে করি যে, এই সকল কার্য তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসের জন্যই সমাধা করিতে প্রয়াস করিতেন।

মহাবৈদ্য চরক ও সুশ্রুতের কালে মনুষ্যদেহের স-সাবধান ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। শিরা, উপশিরা, ধমনী প্রভৃতির অবস্থান সম্বন্ধে সুন্দররূপে তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উক্ত ঋষিদ্বয় জীবদিগের প্রাণসত্তার (Consciousness) কেন্দ্রস্থল বা অবস্থান হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। * এত বড় একটি ভুল

* "শিরো ভবতি-চাঙ্গস্য পূর্বাধিবত্যাহ শৌনকঃ।
শিরস্যবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়ানি যৎ॥
হৃদয়ং জায়তে পূর্বং কৃতবীযোহবদন্মুনিঃ।
বুদ্ধেশ্চ মনসাস্থানি যতস্তৎ স্থানমীবিতম্॥
পারাশর্যা ইতি প্রাহ পূর্বং নাভিসমুদ্ভবঃ।
প্রাণোযত্র স্থিতো দেহং বর্জয়ুত্যমসংযুতঃ॥
আয়ুর্বেদ—শরীর প্রকরণম্।

তাঁহারা কেন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপে এ্যারিষ্টলও তাঁহার প্রাণী সম্পর্কীয় বিবরণে এই একইরূপ ভুল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু Galen ঠিক ভারতীয় যোগীদের ন্যায় অভ্রান্তরূপে মস্তিষ্ককেই প্রাণসত্তার (Consciousness) কেন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন। আমি এইবার দেখাইব যে, ভারতীয় যোগীগণ এরূপ ভুল আদৌ করেন নাই। ভাগবত ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহারা প্রাণ-সত্তার স্থান নির্ভুলরূপে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুদণ্ডে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। যোগীগণ চিকিৎসক না হইয়াও যে ভুল করেন নাই, কিন্তু চিকিৎসক হইয়াও চরক ও সুশ্রুতের সেই ভুল কেন হইল? সেই সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করিব। বৈদ্যগণ দেখিয়াছিলেন যে, হৃদয় অপসারণের পর জীবদিগের মৃত্যু হয়। রক্তপাতজনিত মৃত্যু দেখিয়া তাঁহাদের এই ভুল ধারণা হয়। এইরূপ ভুল ধারণা পোষণের অপর এক কারণ এই যে, তাঁহারা কেবলমাত্র মৃত মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতেন। অন্যদিকে যোগীগণ জীবিত ভেক, ভল্লুক ও সর্প প্রভৃতি জীবকে পর্যুদস্ত করিয়া তাহাদের ছেদনকরতঃ জ্ঞান অর্জন করিতেন। ভেকের হৃৎপিণ্ড অপসারিত করিলেও ভেক বহুক্ষণ বাঁচিয়া থাকে ও হস্তপদাদি সঞ্চালন করে। এমন কি মস্তিষ্ক অপসারণের পরও তাহাদের হস্তপদাদির সঞ্চালন মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ুপিণ্ড দ্বারা চালিত হয়। এই কারণে যোগীগণ মস্তিষ্কের সহিত প্রাণসত্তার (consciousness) স্থান হিসাবে স্নায়ুদণ্ডকেও প্রাধান্য দিয়াছেন। ভেকাদি জীবের ছেদন দ্বারাই যে তাঁহারা এই জ্ঞান অর্জন করিতেন, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মস্তিষ্কের স্থান বিশেষ (Foramen of Morno ও middle comissureএর উপরে) ব্রহ্মরন্ধ্র নামক স্থানে এবং ব্রহ্মদণ্ড বা মেরুদণ্ড অভ্যন্তরস্থ সুষুম্না বা স্নায়ু দণ্ডে এই প্রাণসত্তার স্থিতি বলিয়া যোগীগণ নির্দেশ দিয়াছেন। ভেকের ন্যায় ক্ষুদ্র

ও বিশিষ্ট জীবের জীবন্ত দেহ ছেদন দ্বারা সম্ভবতঃ যোগীগণ এইরূপ নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

যোগশাস্ত্রের সহিত কিরূপে শরীর-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলা হইল। এইবার চিকিৎসা-শিক্ষার সহিত সৃষ্ট শরীর বিজ্ঞান বা ফিজিওলজি সম্বন্ধে বলিব। চরক ও সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) এবং ভাগবত (৫০০-৬০০ খ্রীঃ অঃ) শরীর-বিজ্ঞান বা 'ফিজিওলজি' সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত 'মেটাবলিজ্‌ম্' (Metabolism) সম্পর্কীয় তথ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়কর। ক্ষিতি অর্থে তাঁহারা খাদ্যের 'নাইট্রোজেনাস্' অংশ বুঝিতেন, তেজ অর্থে 'হাইড্রোকারবন্' বা উত্তাপ,—বায়ু অর্থে 'ডাইয়নেমিক' বা 'কারবোহাইড্রেট্' এবং অপ অর্থে খাদ্যের জলীয় ভাগকে বুঝিতেন। তাঁহাদের মতে প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া খাদ্য gullet-এর মধ্য দিয়া 'স্টম্যাক্' বা 'আমাশয়ে' আসিয়া ফেণীভূত কফ (gelatinous mucus) এর সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার পর উহা 'গ্যাস্ট্রিক্' রসের (বিদাহাদম্লতাং গত) সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার পর উহা 'সমান' বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া 'গ্রহণী' নাড়ীর সাহায্যে প্রথমে পিত্তাশয়ে বা 'বাইল্ রিসেপ্টিক্যালে' (duodenum) এবং পরে আমাশয়ে, পক্কাশয়ে বা 'ইন্‌টেস্টাইনে' উপনীত হয়। ইহার পর পিত্তরসের দ্বারা ঐ খাদ্য তিক্তস্বাদযুক্ত 'রস'এ (chyle) পরিণত হয়। এই chyle বা রসের সূক্ষ্মাংশ (সূক্ষ্ম ভাগ) 'ইন্‌টেস্টাইন্' হইতে প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ধমনীর (thoracic duct) দ্বারা প্রথমে হৃৎপিণ্ড ও পরে হৃৎপিণ্ড হইতে যকৃৎ প্রভৃতিতে (liver and spleen) উপনীত হয়। এই যকৃত বা liver এই রসকে রক্তিম বর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত করে। কিন্তু রসের স্থূলভাগ 'ব্যান' বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া ধমনীর সাহায্যে সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে।

রক্ত সৃষ্টি হইবার পর উহার সারাংশ ‘মাংসাগ্নি’ মাংস প্রভৃতি সৃষ্টি বা পোষণ করে। ইহার পর উহা হইতে মেদাগ্নি সৃষ্টি হইয়া মেদ সৃষ্টির সহায়ক হয়।

উপরোক্ত রূপে দেহ-পোষণ সম্পর্কীয় বহু তথ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হইয়াছে। আয়ুর্বেদ ও ভাগবতে রক্ত পরিক্রম (blood circulation) সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। চরকের মতে মনুষ্যদেহ ৭০০ শত শিরা বা vein এবং ২০০ শত ধমনী বা artery আছে। আয়ুর্বেদের মতে এই শিরা ও ধমনী প্রভৃতির সাহায্যে রক্ত পরিক্রমণ করে। চরকের মতে শিরা ও ধমনীর মূল ভ্রূণের নাভিতে, কিন্তু ভাগবতের মতে উহাদের মূল ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডে। এই সকল শিরা ও ধমনীর পরিশেষে ‘প্রতান’ বা Capillaryতে পর্যবসিত হইয়া পরিশুদ্ধ রক্ত সারাদেহে ব্যাপ্ত রাখে। চরকের মতে liver বা যকৃত হইতে পরিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হইয়া হৃৎপিণ্ডে গমন করে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে উহা সারা দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ১০০ খ্রীঃ অঃর মধ্যে এদেশে রক্ত পরিক্রমণ বিষয়ে (blood circulation) ভারতীয়েরা অবহিত ছিলেন। তবে চরক ফুস্‌ফুসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও উহার ক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই, কিন্তু যেটুকু তাঁহারা বলিয়াছেন, তাহাতে জীবদেহের রক্তপরিক্রমণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মোটামুটি ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ‘ফিজিওলজি’ বা শরীর-বিজ্ঞান এবং রক্ত-পরিক্রমণ বা blood circulation সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এই দেশে ১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে William Harvey (১৫৭৮-১৬৬৭ খ্রীঃ অঃ) প্রকৃতপক্ষে ‘ফিজিও-লজি’ বা শরীর-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি ভারতীয় যোগী-

গণের ন্যায় (১৬২৮ খ্রীঃ) ভেক এবং কুকুরের দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া রক্ত-পরিক্রমণ প্রণালী অবলোকন করিয়াছিলেন।

ভ্রূণ-শাস্ত্র

ভ্রূণশাস্ত্রকে ইংরাজিতে বলা হয় 'এম্‌ব্রিওলজি'। এই ভ্রূণশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুগণের প্রাথমিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী ও পুং বীজের মিলিত বীজ একবার, দুইবার, তিনবার, পাঁচ-বার, সাতবার, নয়বার ভাগ হইয়া পরে উহা একাদশ, একশত, দশসহস্র এবং সহস্রবিংশতি ভাগে বিভক্ত হইয়া যে জীব-দেহ সৃষ্টি করে তাহা নিম্নের ভাগবতোক্ত (৫০০-৬০০ খ্রীঃ অঃ) জীব সৃষ্টি সম্পর্কীয় শ্লোক (৭ম অঃ ৮৩৯) হইতে বুঝা যায়। পর পৃষ্ঠার চিত্রটি হইতেও বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে।

> য একধা ভবতিঃ ত্রিধভবতি, পঞ্চধা,
> সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকদশঃ স্মৃতঃ
> শতঞ্চ দশচিকশ্চ সহস্রাণি বিংশতি।

পুং ও স্ত্রী বীজ মিশ্রিত বহুধাবিভক্ত বীজপিণ্ড ইহার পর কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন রূপ আকৃতিলাভ করে তাহা আমরা নিম্নের প্রাচীন শ্লোক হইতে বুঝিতে পারিব। এই শ্লোকটি গর্ভোপনিষদে (১৫০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ) হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আয়ুর্বেদোক্ত ভ্রূণ সম্পর্কীয় তথ্য মনুষ্য সম্বন্ধীয়, কিন্তু গর্ভোপনিষদে বর্ণিত তথ্যসমূহ পশু সম্বন্ধীয় বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি পিপ্পলাদ এই সকল তথ্যের সহিত কঙ্কাল সম্বন্ধীয় তথ্যও গর্ভোপনিষদে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল অস্থি কঙ্কালের প্রদত্ত সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, উহা মনুষ্যেতর কোনও জীব সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই উভয়বিধ জ্ঞান একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা প্রতীত
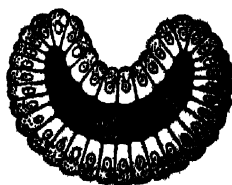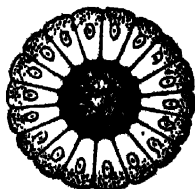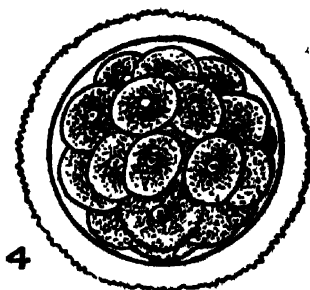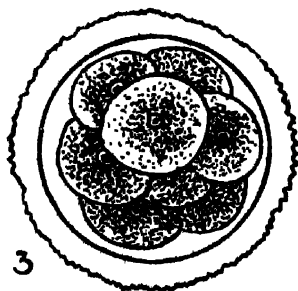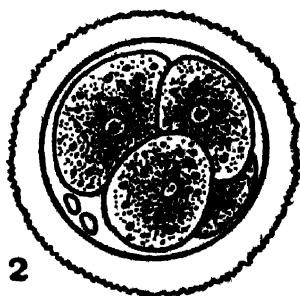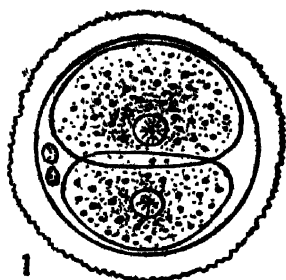
জীব-কোষের পুনঃ পুনঃ বিভক্তি দ্বারা জীবদিগের ভ্রূণের বৃদ্ধি

হইবে যে, এই ভ্রূণ সম্পর্কীয় আখ্যানও তিনি পশুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মহর্ষি পিপ্পলাদ (১৫০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ) পৃথিবীর প্রথম ভ্রূণশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"ঋতুকালে সম্প্রয়োগাদেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং অর্ধমাসাভ্যন্তরে পিণ্ডং মাসাভ্যন্তরং কঠিনং মাসদ্বয়েন শিরঃ, মাসত্রয়েন পাদদেশঃ চতুর্থে গুল্ফ জঠর কটি প্রদেশাঃ পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশ ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষি শ্রোত্রানি, সপ্তমে জীবনেন সংযুক্ত, অষ্টমে সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ, পিতুরেতোহাতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতৃরেতোহাতি রেকাৎস্ত্রী, উভয়োর্বীজ-তুল্যত্বান্নপুংসকং ব্যাকুলিত মনসোহন্ধাঃ, খঞ্জা, কুব্জা, বামনা ভবন্তি।"

তাৎপর্য ঃ—ঋতুকালে পুংবীজ স্ত্রীধাতুর পোষণ করে। [illegible] কারণে স্ত্রী পুরুষেব সংযোগে স্ত্রীর তেজের আধিক্য হইয়া থাকে। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্কবশতঃ শুক্র ও শোণিত একত্রিত হইয়া এক রাত্রিতে ঈষৎ গাঢ় আকারে পরিণত হয়। তৎপর সপ্তরাত্রে উহা বর্তুলাকার হয়। অর্ধ মাসের মধ্যে ইহা পিণ্ডকার হয়, মাস সম্পূর্ণ হইলে ঐ পিণ্ড কঠিন হয়, এবং দুই মাসে শির, তিন মাসে পদপ্রদেশ, চতুর্থ মাসে গুল্ফ, উদর ও কটিদেশ, পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠ-বংশ (শিরদাঁড়া), ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা ও চক্ষু এবং সপ্তম মাসে জীবনের সহিত অর্থাৎ জীবোৎপত্তির পরিচায়ক চলনাদি জন্মে, এবং অষ্টম মাসে গর্ভ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। স্ত্রী পুরুষ সংযোগ সময়ে যদি পুরুষের শুক্রাধিক্য হয়, তবে পুরুষ, আর স্ত্রীর শুক্রাধিক্য ঘটিলে স্ত্রী হয়, এবং স্ত্রীপুরুষের বীজের সমতা হইলে নপুংসক, ব্যাকুলিত চিত্ত, অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ ও বামনের উৎপত্তি হয়। স্ত্রী-পুরুষের শুক্র-শোণিত বায়ুর দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া দ্বিধাভাবে পরিচালিত হইলে, যমজ সন্তান সৃষ্টি হয়।

[উপরের আখ্যান ভাগ হইতে আমরা ভ্রূণের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক নামও পাইয়া থাকি। যথা, কলন, বুদ্‌বুদ, পিণ্ডক ইত্যাদি এতদ্ব্যতীত সুশ্রুত গ্রন্থে আমরা আবর্তবহ ধমনীরও (ovaryduct) উল্লেখ দেখি। ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, আবর্ত (ova)-সমূহ এই আবর্তবহ ধমনীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া আসে। ভারতীয় ভ্রূণ শাস্ত্র সৃষ্ট হইতে যে বিবিধ পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সুশ্রুতের শরীরস্থানে উল্লেখিত নিম্নোক্ত বঙ্গানুবাদ হইতে বুঝা যায়।

"শৌনিক বলেন, সম্ভবতঃ প্রথমে গর্ভের মস্তক উৎপন্ন হয়। কৃতবীর্য বলেন, হৃদয় প্রথমে উৎপন্ন হয়। পরাশরতনয় বলেন, নাভি প্রথমে উৎপন্ন হয়। মার্কণ্ডেয় বলেন, অগ্রে হস্তপদ জন্মে, সুভূতি গৌতম বলেন, প্রথমে মহাশরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুশ্রুতের মতে এইসব যুক্তিসঙ্গত নয়। এই সম্পর্কে তিনি ধন্বন্তরির মতে মত দিয়া বলিয়াছেন যে, গর্ভের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহার মতে অতিসূক্ষ্মত্বহেতু বংশাঙ্কুর ও চূতফল যেমন উপলব্ধ হয় না, তেমনি গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলও অতি সূক্ষ্ম থাকে বলিয়া তাহাদের প্রারম্ভে উপলব্ধি করা যায় না। কালপ্রকর্ষে তৎসমুদয় প্রব্যক্ত হইলে উহাদের পৃথক পৃথক রূপ চর্মচক্ষে ধরা পড়ে।"

উপরোক্ত আখ্যানভাগ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ১০০-২০০ খ্রীঃ ও তৎপূর্বকালে ভারতবর্ষে ভ্রূণশাস্ত্র সম্পর্কে মূলতঃ দুইটি মত প্রচলিত ছিল। একদল মনে করিতেন যে, ভ্রূণে দেহাঙ্গসমূহ পর পর জাত হইয়া থাকে এবং অপরদল মনে করিতেন যে, উহাতে জীবের প্রতিটি অঙ্গ অতি সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) ভাবে যুগপৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপেও অনুরূপভাবে দুইটি মত প্রচলিত ছিল। প্রথম মতাবলম্বীদের বলা হইত 'ইভোলিউসনিস্ট' এবং দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের বলা হইত 'এপিজেনিটিসিস্টস্'। প্রথমোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে,

জীবদিগের বীজ ফুলের কুঁড়ির মত হইয়া থাকে এবং পাপড়ির ন্যায় উহাদের বিকাশ হয় মাত্র। ডিম্বের মধ্যে জীবের সমুদয় অঙ্গপ্রতঙ্গ সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মভাবে শুরু হইতেই সন্নিবেশিত থাকে। কিন্তু উহারা অতীব ঘনীভূত (pressed) অবস্থায় থাকে বলিয়া প্রথম অবস্থায় উহাদের বিভিন্নতা চক্ষে ধরা পড়ে না। এই সম্পর্কে য়ুরোপে দ্বিতীয়োক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে, জীবের ডিম্বের মধ্যে একপ্রস্ত মাত্র (uniform) পেশী একীভূত অবস্থায় থাকে এবং উহা হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পর পর উদ্ভূত (impressed) হইতে থাকে।]

ভ্রূণশাস্ত্র সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান প্রাচীন আর্যগণ কিরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে এইবার বিবৃত করিব। আর্যগণ অরণ্যাশ্রমে ও তপোবনে বাস করিতেন। তৎকালীন অসভ্য মানুষরা স্ত্রী-পশু হননের পর উহাদের গর্ভস্থ পিণ্ডাকার বিভিন্ন অবস্থার ভ্রূণ মাংসাদির সহিত আশ্রমে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। অরণ্যে পশুদিগের দুর্ঘটনাজনিত গর্ভপাত দেখিবারও তাহাদের সুযোগ ছিল। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞকালীন পশুবলিও এই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করিয়াছে। আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধি তৈয়ারির জন্য বিভিন্ন প্রকার স্ত্রী-পশুই বিশেষ করিয়া ছেদিত হইয়াছে। এইরূপ ছেদন দ্বারা বিভিন্ন আয়তনের ভ্রূণও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

"স্ত্রিয়াশ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংস্ বিহগেষু চ
জাঙ্গালানাং বয়স্থানাং চর্মরোমনখাদিকম্।
হিত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং অস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম।

পক্তব্য মাজমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপিদাপয়েৎ।
বলিনঞ্চ বয়স্থঞ্চ সুবীর্যাক্ষ সুদেহিনাম্।
ন বৃদ্ধঞ্চ ন বালাঞ্চ অবীর্যং স্রাবশোণিতম্।
শৃগালোবর্হিনোঃ পাকে পুমাংসং তত্রদাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্যহীনা স্বভাবতঃ।
কাশীরাজমতেনৈব ছাগমেব নপুংসকম্॥
অভাবাদ প্রতীক্ষত্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ।
বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং করেৎ।
স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং নতু পুংসা বিধীয়তে
পিণ্ডাত্মিকা স্ত্রিয়োঃ যস্মাৎ সৌমাস্ত্ত পুরুষামতা
ক্ষীর মূত্রপুরীষানি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ॥

পরিভাষা প্রদীপ (আয়ুর্বেদ), ১ম খণ্ড।

উপরের শ্লোকটি হইতে কিরূপে চতুষ্পদ জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতি এবং পক্ষীর মধ্যে পুংজাতির বয়ঃপ্রাপ্ত জীবকে বাছিয়া লইয়া উহাদের চর্ম, রোম ও নখ ত্যাগ করিয়া উহাদের খণ্ডীকৃত মাংস অস্থির সহিত গ্রহণ করা হইত—তাহাও বলা হইয়াছে। এইরূপে ভ্রূণশাস্ত্রের সহিত শল্যতন্ত্র ও দেহ-বিজ্ঞানও উন্নতি লাভ করে। আর্যগণ অস্থিক প্রাণিদের ন্যায় নিরস্থিক প্রাণিদিগেরও ভ্রূণ ও জন্ম সম্পর্কে বহু তথ্য সেই প্রাচীন যুগেও আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। নিম্নের উদ্ধৃত মহাভারতোক্ত শ্লোক হইতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাইবে। কর্কটিগণ যে গর্ভধারণের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা পর্যন্ত আর্যঋষিগণ প্রাচীন যুগেও পরিলক্ষ্য করিয়াছিলেন।

"যথা কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধং মতমামন্যে বাসনা ত স্বচিস্মিতে॥"

মহাভারত, বিরাটপর্ব।

তাৎপর্য :—কর্কটী (কাঁকড়া ?) গর্ভধারণের পর যেমন নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করে, তেমনি তোমাকে আশ্রয় দেওয়া বা মৃত্যুবরণ করা, আমার পক্ষে একই কথা।

এই কর্কটী শব্দটির দ্বারা মহাভারতকার (C ৪০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৪০০ খ্রীঃ অঃ) কোন জীবকে বুঝিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। Peripatus নামক এই পর্বের এক প্রকার একটি জীববংশ প্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিল। এখনও ইহাদের কতিপয় অবশিষ্ট বংশধরদের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া শুনা গিয়াছে। ইহাদের শাবক মাতার উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং ইহার ফলে উহার মাতার মৃত্যু ঘটে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে (১০০-২০০ খ্রীঃ পূঃ) দেখা যায় যে, ঐ সময়ে ভারতীয়গণ মনুষ্য সম্পর্কীয় ভ্রূণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, উৎকৃষ্টতম যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহারা ভ্রূণ (foetus) আহরণের উপায়ও (obsteric surgery) অবগত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গজায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ ও গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে গো, অশ্ব ও হস্তীর ভ্রূণ ও উহাদের বৃদ্ধির বিবিধ বিবরণ লিখিত আছে। এই সম্পর্কে গজায়ুর্বেদ (C. ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে হস্তীর ভ্রূণ সম্পর্কীয় একটি বিশেষ তথ্য উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

"হস্তী জীবের পুং জাতি বহুল শুক্র মোচন করিয়া থাকে ও স্ত্রী-জাতির আর্তব (ova) অদৃশ্যরূপে ও হর্ষসম্মতভাবে বাহির হয় এবং এই উভয়ের মিলনে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। ইহার পর জরায়ুর মধ্যে সপ্তরাত্রি পর্যন্ত উহা বর্ধিত হইলে উহা 'কলন' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং

দশাহ পরে উহাকে 'অর্বুদ' বলে। এক মাস পরে মাংসপেশীর উৎপত্তি হয় এবং তন্মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। কেহ বলেন, হৃদয়ের পূর্বে মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়, কেহ বলেন উভয়েরই উৎপত্তি যুগপৎ সম্পন্ন হয়। অনন্তর ক্লোম্, পরে যকৃৎ ও বৃক্কের সৃষ্টি ও তৎপর তীর্যক, ঊর্ধ্ব ও অধোগামিনী শিরাসমুদয় জন্মে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে শিরাসহ স্থূল, অন্ত্র, পৃষ্ঠ-বংশ, জঘনদেশ, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ, উদর, সর্বাঙ্গ, কেশর, রোম, নখ প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। এইরূপভাবে বর্ধিত হইয়া দশম মাস হইতে দ্বাদশ মাস মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া স্তন্যপান করে। ইহাদের অঙ্গাদি মাতৃজ ও পিতৃজও বটে।"

[সুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদ (১০০—২০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং গজায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে (৪০০ খ্রীঃ অঃ) ইহাও জানা যায় যে, স্ত্রী-বীজ (Ova) বা আবর্ত, শুক্রকোষ বা Sperm দ্বারা নিকেষিত হওয়ার পর তাপদ্বারা পর পর কয়েকটি কোষস্তর বা তন্তু ঠিক বৃক্ষের কোষস্তর ও তন্তুর ন্যায় সৃষ্ট হয়। প্রথমে (সপ্তঞ্চ) সপ্তকোষস্তরের (epithilia and dermal) সৃষ্টি করে এবং পরে উহা হইতে বহু কলা (Tissue) বা পেশীর সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সকল কলা হইতে একে একে মজ্জা, মেদ, ধমনী, রসপিণ্ড, রসনলী এবং বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মাসে মনুষ্য ভ্রূণের আকৃতি দেখিয়া উহা স্ত্রী বা পুং তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। গজায়ুর্বেদ ও অশ্বায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায় যে, পুং ও স্ত্রী বীজ যথাক্রমে আবর্তক (ovary) ও অণ্ডকোষে (testis) জাত হইয়া থাকে।]

উপরোক্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৬০০ খ্রীঃ অঃর মধ্যে ভ্রূণ শাস্ত্রের উৎপত্তি ত হইয়াছিলই এমন

কি ঐ সময় কালের মধ্যে পুং বীজ বা Sperm এবং স্ত্রী-বীজের (Ova) অবস্থিতিও তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, এই পুং ও স্ত্রী বীজকে গজায়ুর্বেদ-প্রণেতা পালকপীয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম (অদৃশ্য) রূপে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিশেষ স্ত্রী-বীজ ও পুং-বীজ যে আবর্তক (ovary) এবং অণ্ডকোষে (testis) জাত হইয়া থাকে তাহাও তাঁহারা ঐ সময় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত জীব মাত্রেরই জন্ম যে বীজ ব্যতিরেকে হয় না—তাহাও তাঁহারা সেই সুদূর প্রাচীন যুগেও বিদিত ছিলেন। ইউরোপে উপরোক্ত জ্ঞানসমূহ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয়গণ অর্জন করিতে আরম্ভ করেন। বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল যে, অজীব হইতেও জীবের উৎপত্তি হইতে পারে। মাত্র ১৬৫৭ খ্রীঃ অঃ Harvey সাহেব এই মতবাদে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জীবের জন্ম উভয় প্রকারেই হইতে পারে। ১৬৭৭ খ্রীঃ অঃ Redi সাহেব প্রমাণ করেন যে, একমাত্র বীজ হইতেই জীবের জন্ম হইতে পারে। এই সময়ে ইউরোপীয়গণের ধারণা ছিল যে, একমাত্র স্ত্রী-বীজ বা Ova হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়। এই মতকে বলা হইত 'স্ত্রী বীজিয় মত' এবং ঐ মতাবলম্বীদের বলা হইত 'স্ত্রী-মতা'। ইহার পর ১৬৭৭ খ্রীঃ অঃ Louis de Hamen সাহেব প্রথম পুং বীজ বা Sperm আবিষ্কার করেন। এই সময়ে কেহ কেহ ধারণা করেন যে, এই পুং-জীব বা Sperm একটি শিশু-জীব এবং উহা ডিম্বের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া থাকে। এই মতকে বলা হইত 'পুং-বীজিয়' মত এবং এই মতাবলম্বীদের বলা হইত 'পুং-মতা'। ইঁহাদের মতে পুং-বীজ বা Sperm হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়।

১৮২৭ খ্রীঃ অঃ Von Beer স্তন্যপায়ী জীবদের Ova বা স্ত্রী-বীজ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত পুং-বীজিয় এবং স্ত্রী-বীজিয়

মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ বিখ্যাত পণ্ডিত Tohauanes Muller পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে পুং-বীজ বা Sperm জীব-উৎপাদনকারী এক প্রাণবান বস্তু, উহা পৃথক কোন বীজাণু বা জীবাণু নহে। ১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ ইউরোপে Martin Barry সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, পুং-বীজ বা Sperm এবং Ova বা স্ত্রী-বীজের মিশ্রণ দ্বারা জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইভাবে স্ত্রী-বীজিয় ও পুং-বীজিয় মতাবলম্বীদের বিরোধের চিরতরে অবসান ঘটে এবং সভ্য সমাজ নিকেষণ বা fertilisation সম্পর্কীয় সত্য স্বীকার করিয়া লয়, এবং ইহারও তিন বৎসর পর Kollikar প্রমাণ করেন যে, পুং-বীজ অণ্ডকোষে সৃষ্ট হইয়া থাকে।

জীবের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্ণাত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বেই জীবের বর্ধন রীতি সম্পর্কীয় ভ্রূণ-শাস্ত্র ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইউরোপে Harvey সাহেবকে (১৬৬৭ খ্রীঃ অঃ) ইহার প্রথম উদ্যোক্তা বলা যাইতে পারে। ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ Schleiden সাহেব উদ্ভিদ সম্পর্কে এবং Schwanu সাহেব প্রাণী সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন যে, কোষ বা cell দ্বারা নির্মিত কলা বা পেশী (tissue) দ্বারা জীবদেহ গঠিত। ১৮২৭ খ্রী অঃ K. E. Vonbaer অস্থিক জীবের ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া Ectoderm, Mesoderm এবং Endoderm নামক প্রাথমিক germ layer বা বীজস্তর আবিষ্কার করেন এবং ভ্রূণে নিহিত বীজকোষসকল সমষ্টিগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা একত্রিত হইয়া পেশীসমূহের সৃষ্টি হইবার পর উহা হইতে জীবদেহের বিবিধ অংশসমূহ কিরূপে সৃষ্টি হয় তাহাও তিনি দেখান।

[হিন্দুগণ এই ত্রিবিধ বীজস্তরের মূল তথ্য সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন তাহা মনুষ্যায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি

পাঠে অবগত হওয়া যায়। তবে এই ত্রিবিধ বীজস্তরকে হিন্দুগণ সাতটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের সপ্তকলা নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। অতো প্রাচীনকালে জ্রূণশাস্ত্রের স্থায় দুরূহ বিষয় সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জন সম্ভবও ছিল না। গজায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে অনুরূপ-ভাবে আমরা জীবদেহে তিনটি ছবির (Lager) উল্লেখ দেখিয়া থাকি। এই সকল গ্রন্থে ঐ ছবিত্রয়ের পারস্পরিক ঘনত্বের পরিমাণের কথাও বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল গ্রন্থে ইহাও উল্লেখিত আছে যে, শুক্রকীট (Sperm) অণ্ডকোষে জাত ও বর্ধিত হইয়া থাকে।]

উপরোক্ত তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, জীবদিগের বীজ-বিজ্ঞান বা সাইটোলজী বিবিধ প্রকার জনন-প্রথা এবং জ্রূণ শাস্ত্র বা এ্যামব্রিয়োলজীর মূল সূত্রসমূহ ভারতবর্ষে ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ কালের মধ্যে অনুমিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে ১৬০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইতে এই উভয় বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রকৃত আলোচনা সুরু হয় এবং উহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ বরাবর পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বীজ-বিজ্ঞান ও বংশানুক্রম

ইংরাজিতে বীজ-বিজ্ঞানকে বলা হয় Cytology। এই বীজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর্য ঋষিগণের সম্যকরূপ ধারণা ছিল। এই বিদ্যা কোনও রূপ চাক্ষুষ পরীক্ষা দ্বারা কিংবা উহা নিছক অনুমান দ্বারা আর্যগণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বড় শক্ত। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান ইউরোপীয়গণও বাস্তব আবিষ্কারের বহু পূর্বে 'এ্যাটমিক এনারজি' সম্পর্কীয় পরিজ্ঞান 'থিওরেটিক্যালি' অর্জন করিয়াছিলেন এবং উহার বহু পরে এই বিদ্যা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। বেদান্ত-দর্শন ও উহার ভাষ্যসমূহে দেহ-অনু নামক শব্দ বারে বারে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা জীবদেহ যে দেহ-অণুর দ্বারা গঠিত তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ভাগবত (৫০০-৬০০ খ্রীঃ অঃ) পাঠে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি ভাগবতোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল :—

"অনুপ্রাণান্তিযং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্বজন্তষু
আপনগুমপনান্তি নর দেহমি বানগা ॥"

তাৎপর্য :—অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ জীবদেহবর্তী ব্যষ্টিপ্রাণসমূহ মুখ্যপ্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য-প্রাণ নিশ্চেষ্ট হইলে উহারাও চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

প্রত্যেক জীবের দেহ যে লক্ষ লক্ষ এককোষ দ্বারা সৃষ্ট, তাহা প্রাচীন ঋষিগণ অবগত ছিলেন। উপরের প্রাচীন শ্লোকটি ইহা প্রমাণ

করিবে। এই সকল পৃথক এককোষ এক একটি পৃথক জীবের ন্যায় হইলেও সমষ্টিগতভাবে ইহারা সকলে একটি অখণ্ড মুখ্য জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে এই মুখ্য জীবের মৃত্যু ঘটিলে উহাদেরও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। জীব-দেহের যে কোনও এক অংশ অনুবীক্ষণের তলে রাখিলে দেখা যাইবে যে, উহা বহু অণুরূপ এককোষ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল এক-কোষকেই ইংরাজিতে বলা হয় cell বা কোষ।

কনাদ ঋষি ও তাঁহার শিষ্যরা পরমাণুবাদ সম্বন্ধে আলোচনাকালে সুস্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন যে, জড় পদার্থসমূহ যেমন অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট তেমনি ইন্দ্রিয় যুক্ত জীব দেহ [শরীরং সেন্দ্রীয়ামিত্যেবং সর্বমিদং জগদনুভ্য সম্ভবতি] বহু দেহাণু দ্বারা সৃষ্ট। ভাগবতের ন্যায় কনাদ ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবদেহ মাত্রই লক্ষ লক্ষ সর্বশেষ বিভাজ্যরূপ দেহাণুর দ্বারা সৃষ্ট।

[কনাদ ঋষির পরমাণুবাদ সম্পর্কে বেদান্তদর্শন ও উহার ভাষ্যসমূহে প্রাচীন হিন্দুগণ উৎপদ্যমান উৎপাদনকারী ? দ্ব্যনুক নামক একটি বাক্যও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (দ্ব্যনুকমুৎপদ্যমান)। তাঁহার মতে বিশেষ এক প্রকার দেহাণুর (পুং ও স্ত্রী বীজ ?) দুইটি একত্রিত হইয়া এই উৎপাদনকারী দ্ব্যনুকের সৃষ্টি করে। এই দ্ব্যনুক শব্দের অর্থে ইংরাজী zigote বুঝা যায় কিনা তাহা বিবেচ্য।]

বীজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র সম্পর্কীয় প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, এইবার তাঁহাদের বংশানুক্রম সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জীবগণের দেহে দুই প্রকার কোষ আছে—যথা, দেহ কোষ বা Somatic cell এবং gamatic cell বা জনন-কোষ। দেহ-কোষ দ্বারা জীবগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত হয়, কিন্তু বীজ-কোষ দেহাভ্যন্তরে পরবর্তী

বংশীয়দের জন্মের জন্য পৃথক বীজধারে রক্ষিত থাকে। জনন বা বীজ-কোষ সম্বন্ধে আর্যগণের সম্যক ধারণা তো ছিলই, এমন কি বংশানুক্রম বা 'হেরিডিটি' সম্বন্ধেও তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বীজ-বিজ্ঞানের সহিত বংশানুক্রমের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। এইজন্য আর্য মনীষিগণ বীজ-বিজ্ঞানের সহিত বংশানুক্রম সম্পর্কেও প্রভূত জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল তাহা চরক, সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ অঃ) ও ব্রাহ্মণে (৮০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) বিশেষ-রূপে উক্ত হইয়াছে। নিম্নোক্ত প্রাচীন আখ্যান ভাগ হইতে ইহা সম্যক-রূপে বুঝা যাইবে—

> "গর্ভস্য হি সম্ভবতঃ···সর্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গানি
> যুগপৎ সম্ভবান্তি ইত্যাহ ধন্বন্তরি। গর্ভস্য
> সূক্ষ্মত্বাৎ নোপলভ্যন্তে বংশাঙ্কুরবৎ, চুতফবচ্চ
> তদ্ যথা চুতফলে পরিপক্কে কেশর
> মাংসাস্থি মজ্জানি পৃথক দৃশ্যন্তে কাল প্রকর্ষাৎ।
> অন্তেব তরুণে নোপলভ্যন্তে সূক্ষ্মত্বাৎ। তেষাং
> কেশাবাদীনাং কাল প্রব্যক্ততাং করোতি
> এতেনৈক বংশাস্ফুরোঽপি ব্যাখ্যাত। এবং
> গর্ভস্য তারুণ্যে সর্বেষু অঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু সংসুসৌথ্যাৎ
> অনুপলব্ধিঃ অন্যৈর্ষকাল প্রকর্ষাৎ প্রব্যক্তানি
> ভবন্তি।" সুশ্রুত—শরীর-স্থান অঃ ৩ঃ

গো-শিশু, গো, অশ্বশিশু অশ্ব হয় কেন? কিংবা শিশুমাত্রেরই আকৃতি ও স্বভাব তাহাদের স্ব স্ব পিতামাতার স্বভাব ও আকৃতি অনুযায়ী হয় কেন? উপরের এবং নিম্নের আখ্যান ভাগে তাহা বিবৃত করা

হইয়াছে। এই আখ্যান ভাগ হইতে আমরা জানিতে পারি যে জনন-বীজের মধ্যে পিতামাতার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও গুণাগুণ সকল সূক্ষ্ম-ভাবে নিহিত আছে। বীজ-কোষের বৃদ্ধির সহিত যথাযথভাবে ও যথাক্রমে উহাদের বিকাশ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আখ্যানভাগে আম্র-পুষ্প ও বংশাঙ্কুরের কথা বলা হইয়াছে। এই আম্রপুষ্পের মধ্যে সূক্ষ্ম-ভাবে আম্রের আঁটি, শাঁস, ছাল প্রভৃতি যেমন নিহিত থাকে, তেমনি বংশাঙ্কুরের মধ্যে সমুদয় বংশদণ্ডই সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে; যথাক্রমে উহাদের পর পর বিকাশ হয় মাত্র। আসলে জীবদিগের প্রত্যেক দেহাংশই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে তাহাদের জনন-কোষে নিহিত থাকে; কিন্তু অতিশয় সূক্ষ্মতার জন্যে বিকাশের পূর্বে উহা প্রতীত হয় না।

চরকের ন্যায় ঋষি ধন্বন্তরিও উক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্করও তাঁহার বৃহদারণ্যক্ গ্রন্থে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আত্রেয় ঋষি এই বংশানুক্রম বা heredity সম্বন্ধে বিশেষরূপ চর্চা করেন। চরক তাঁহার গ্রন্থে বংশানুক্রম সম্পর্কে আত্রেয় ঋষির মত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চরক কর্তৃক উদ্ধৃত আত্রেয় ঋষি এবং তৎসহ চরকের স্বকীয় মতামতের প্রকৃত তাৎপর্য নিম্নোক্ত আখ্যান-ভাগ হইতে বুঝা যাইবে—

"এবময়ং নানাবিধাণাং এষাং গর্ভকারণাং
ভাবণাং সমুদায়াদভিণি বর্ততে গর্ভঃ।
যন্ত্বয়মেষাং নানাবিধাণাং গর্ভ কারণাং ভাবাণাং
সমুদয়াৎ অভিনিবর্ততে গর্ভ কথময়ং
সন্ধীয়তে। যদি চাপি সন্ধীয়তে কস্মাৎ
সমুদয় প্রভবঃ সন্ গর্ভো মনুষ্য বিগ্রহেন
জায়তে মনুষ্যশ্চ মনুষ্য প্রভব উচ্যতে।

…তত্রচেৎ ইষ্টমেতদ্ যস্মাৎ মনুষ্যো
মনুষ্য প্রভবঃ তস্মাদেব মনুষ্য বিগ্রহেন জায়তে—
"যথা গৌঃ গোপ্রভবঃ যথাচাশ্বঃ অশ্বপ্রভবঃ
ইত্যেবং যদুক্তং অগ্রে সমুদায়াত্মক ইতি
তদযুক্তং। যদি চ মনুষ্যো মনুষ্য প্রভবঃ
কস্মাৎ জড়ান্ধকুব্জমূক বামনমিন্নথব্যঙ্গোন্মত্ত
কুষ্ঠকিলাসেভ্যো জাতাঃ পিতৃ সদৃশ ন ভবন্তি
ইত্যাদি, যচ্চোক্তং যদি চ মনুষ্যো মনুষ্যপ্রভবঃ
কস্মান্ন জড়াদিভ্যো জাতা পিতৃসদৃশরূপান
ভবন্তীতি। তত্রোচ্যতে যস্য যস্য হি
অঙ্গাবয়বস্য বীজে বীজভাব উপতপ্তো ভবতি
তস্য তস্য অঙ্গাবয়বস্য বিকৃতিঃ উপজায়তে।
নোপজায়তে চ অনুপতাপাৎ তস্মাৎ
উভয়োপপত্তিরপ্যত্র সর্ব্বস্য চ আত্মজানীন্দ্রিয়ানী
তেষাং ভাবা ভাব হেতু দৈবং। তস্মাৎ
নৈকান্ততো জড়াদিভ্যো জাতা পিতৃসদৃশ
রূপা ভবন্তি—(চরক—শরীর-স্থান তৃয় পঃ)
দম্পত্যো কুষ্ঠবাহুল্যাং দুষ্ট শোণিত—
শুক্রয়োঃ। যদ্যপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং
তদাপি কুষ্ঠিতং॥"—

উপরোক্ত দুইটি আখ্যানভাগ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আর্য ঋষিগণের মতে জীবদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিভূ বা সার স্বরূপ সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে এক একটি অতি ক্ষুদ্র দ্রব্যাণুবিশেষ আহৃত হইয়া সেই জীববিশেষ বা যোনির

(Species) জনন-কোষ মধ্যে নিহিত হয় ; এক কথায় জীবদিগের প্রতি অঙ্গ-নিচয় ও অপাঙ্গ সকল ও ইহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সূক্ষ্মভাবে তাহাদের বীজকোষে স্থান পায়। পুং ও স্ত্রী বীজের সংমিশ্রণ বা নিকেষণের দ্বারা এই বীজ-কোষের সৃষ্টি। সেইজন্য পিতামাতা বা দম্পতির গুণাগুণ ও আকৃতি, কম বেশী, তাহাদের সম্মিলিত বীজে স্থান পায়, এবং এই কারণে শিশুগণ তাহাদের পিতামাতার আকৃতি ও স্বভাবের ভাগী হইয়া থাকে।

এই আখ্যানভাগে উপরোক্ত তথ্য বিবৃত করিয়া চরক নিজেই উহাতে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—তাহাই যদি সত্য হয় তবে অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, মূক, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির সন্তান-সন্ততি যথাক্রমে অন্ধ, রুগ্ন, মূক, উন্মাদ ও কুষ্ঠরোগী হয় না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে চরক নিজেই তাঁহার গ্রন্থে আত্রেয় ঋষির মতের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, জীবদেহের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ বা পেশীর প্রতিভূ বা সার স্বরূপ এই সকল দ্রব্যাম্নু (?) জীবদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠনের সহায়ক হয় এবং ঐ গঠন কার্য একটি বিশেষ ধারায় উহারা সমাধা করে। প্রাপ্তবয়স্ক জীবদিগের দ্বারা আহৃত 'কোনও বৈশিষ্ট্যের' সহিত উহাদের সাধারণভাবে কোনও সম্পর্ক নাই। এইজন্য জীবদ্দশায় অভ্যাস দ্বারা আহৃত বা দৈবজনিত প্রাপ্ত কোনও বৈশিষ্ট্য (রূপ) জীবদিগের বীজকোষে স্থান পায় না, এবং এই কারণে ঐরূপ কোনও সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য 'ঐ জনন-কোষ-জাত শিশুর' মধ্যেও দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ঐ জনন-কোষ নিহিত কোনও একটি দ্রব্যাম্নু যদি কোনও কারণে বা দৈবক্রমে উপতপ্ত (influenced) হয় তবে উহাদের অনুক্রমিক (corresponding) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিলেও ঘটিতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোনও একটি বিশেষ অঙ্গের প্রতিভূস্বরূপ (বীজকোষস্থিত) একটি দ্রব্যাম্নু যদি কোনও কারণে সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত

না হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গটিরও বর্ধন সম্পূর্ণ হইবে না এবং সেই জীবটি বিকলাঙ্গ হইয়া বর্ধিত হইবে। জীবদ্দশায় আহৃত কোনও রোগ যদি সন্ততিদের মধ্যে সংক্রামিত হইতে দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ রোগ জনন-কোষে নিহিত বীজসার বা দ্রব্যাণুবিশেষকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আত্রেয় ঋষি বংশানুক্রম সম্পর্কে এইরূপ মতামতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুষ্ঠরোগীর কথা বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগীর পুত্র কুষ্ঠরোগী হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কোনও ক্রমে ঐ রোগ বীজসারে সংক্রামিত হইয়াছে। আত্রেয় ঋষির মতে জীব-দম্পতির প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও স্বভাবের সার বা প্রতিভূ স্বরূপ এক একটি দ্রব্যাণু বা বীজসার সেই জীব-দম্পতি দ্বারা সৃষ্ট বীজকোষে নিহিত থাকে। গর্ভের বৃদ্ধির সময় এই সকল দ্রব্যাণু বা প্রতিভূসমূহের কয়েকটি তৎ তৎ নিহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্বভাবের প্রাথমিক বিকাশের সময় আলাদা হইয়া পৃথক্ বীজাধারে সমাহিত হয়। অর্থাৎ ইহাদের কতকগুলি দেহাবয়ব সৃষ্টির জন্য দেহকোষে এবং উহাদের কতকগুলি ভবিষ্যৎ বংশ সৃষ্টির কারণে বীজকোষে পরিণত হয়। দেহ-কোষগুলি যথাক্রমে সমবেত হইয়া জীবদেহের সৃষ্টি করে এবং উহাদের বীজ-কোষসমূহ ঐ জীবের আকৃতি, গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের সার লইয়া অনুরূপ নূতন জীবের সৃষ্টির জন্য পৃথক হইয়া যায়। এই কারণে জীবদিগের স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত কোনও বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তনের সহিত জনন বা বীজ-কোষের কোনও সম্পর্ক থাকে না। ইহার ফলে স্বকীয় জীবনে অর্জিত দেহাকৃতি অপত্যগণ সাধারণতঃ প্রাপ্ত হয় না। [শরীরধাত্মামা শুক্রভূতঃ অঙ্গামঙ্গাত্ সম্ভবতি।—সুশ্রুত—শরীর স্থান, চার অধ্যায়] কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে দম্পতি কর্তৃক স্বকীয় জীবনে অর্জিত

স্বভাব বা রোগ অনেক সময় বীজসারকে প্রভাবান্বিত করে। দৈব-ক্রমে ইহা সম্ভব হইলে দম্পতির স্বভাব ও রোগাদি অপত্যগণ লাভ করে। এতদ্ব্যতীত আত্রেয় ঋষির মতে এই বীজসার দেহকোষের প্রতিভূ হইলেও বীজসার হইতে যেমন দেহকোষ সৃষ্ট হয়, তেমনি দেহকোষ হইতেও বীজসার বা বীজকোষের সৃষ্টি হয়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সিদ্ধান্তে ডারউইন সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মাত্র ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ (Darwin's Gemmule and Spencer's 'Ids') উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা চরকাদি ঋষিগণ আজ হইতে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহাদের 'দ্রব্যাত্ম' সম্পর্কীয় অভিমতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যে বীজসার মত 'ভাইস্‌ম্যান্' সাহেব (Weisman's germ plasm theory) মাত্র ১৮৯২ খ্রীঃ অঃ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মূল সূত্র আত্রেয় ঋষি খ্রীঃ পূঃ কালে জ্ঞাত ছিলেন।

ডারউইন সাহেবের গ্রেমিউল (Gemmule) ও ভাইস্‌ম্যানের জার্মপ্লাসম থিওরীর সহিত আত্রেয় ঋষির জার্মপ্লাসম (বীজসার) থিওরীর তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আত্রেয় ঋষির এই সম্পর্কীয় মতবাদটি একটি দিক হইতে অধিকতর উন্নত। ডারউইন সাহেবের মতে জননকোষ সকল সারা অঙ্গে ছড়াইয়া থাকে এবং পরে উহারা কোনও না কোনও এক পথে সরিয়া আসিয়া পৃথক বীজাধারে আসিয়া জমা হয়। ভাইস্‌ম্যান সাহেব ডারউইন সাহেবের এই ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া বলেন যে, বর্ধনের সময় কতকগুলি কোষ জননকোষ রূপে পূর্বাহ্নেই পৃথকীকৃত হইয়া পৃথক বীজাধারে রক্ষিত হয় এবং বাকিগুলি দেহকোষের সৃষ্টি করিয়া উহার দ্বারা জীবের অবয়বের সৃষ্টি করে। এইজন্য পরবর্তীকালে জননকোষের সহিত

দেহকোষের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। আত্রেয় ঋষি ভাইস্ম্যানের জার্মপ্লাসম থিওরীরই অনুরূপ মত প্রকাশ করিলেও তিনি অপর আর একটি কথাও বলিয়াছেন। আত্রেয় ঋষির মতে জননকোষ হইতে যেমন দেহকোষের সৃষ্টি হয়, তেমন দেহকোষ হইতেও জননকোষের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ভাইসম্যান আত্রেয় ঋষির এই মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে ভাইসম্যান সাহেব কিংবা আত্রেয় ঋষি এই উভয় মনীষীর মধ্যে কাহার মত সত্য তাহা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যাইতে পারে। একথা অবশ্য নিশ্চয়ই সত্য যে স্বল্পায়ু ক্ষুদ্রতম জীবসহ বহু জীবের মধ্যে বর্ধনের প্রারম্ভেই জননকোষসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই উভয়প্রকার কোষের নিউক্লিয়াস বা জৈবমণির মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নি। উহাদের যাহা কিছু পরিবর্তন তাহা উহাদের প্রটোপ্লাসম বা জীবসার-সমূহের মধ্যে দেখা গিয়াছে; উহাদের জননকোষের জীবসারসমূহের উত্তমাংশ (Nourishment) উহাদের দেহকোষের ঐরূপ পদার্থ অপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে মাত্র। আবার এমন বহু জীবও আছে যাহাদের বর্ধনারম্ভের বহু পরে জননকোষসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত (মনুষ্যসহ) অস্থিক জীবদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে এক অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহাদের বর্ধনের প্রারম্ভেই জননকোষসমূহ জাত হইয়া ধাপে ধাপে পরিপক্ক হইলেও পরে উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তীকালে উহাদের দেহের গহ্বরের (Body Cavity) আবরণের (Peritoneum) দেহকোষ হইতে প্রয়োজনীয় জনকোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এডিনবারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ ক্রু (CREW) অপর আর এক অদ্ভুত ব্যাপার

পরিলক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত একটি ডিম্ব প্রসবিনী মুরগীর দেহে হঠাৎ মোরগের ন্যায় নিদর্শন দেখা যাইতে থাকে। পরে উহা পুরাপুরি মোরগ হইয়া উঠিয়া মুরগীদের নিষেকিত করিতেও সমর্থ হইতে থাকে। পরীক্ষার জন্য ঐ পূর্বতন মুরগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায় যে, উহার স্ত্রীবীজ উৎপাদনকারী ওভারী রোগগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে 'পুংবীজ উৎপাদনকারী টেস্‌টিস্' দেহ গহ্বরের অভ্যন্তরের আবরণ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

[এতদ্ব্যতীত নিম্নতম দুই একটি প্রাণীর দেহের সামান্য একটি অংশ পর্যন্ত হইতে ঐরূপ একটি পুরা জীবেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপরদিকে বৃক্ষাদির ডাল প্রভৃতি (দেহাংশ) হইতেও অনুরূপ পুরা বৃক্ষের জন্ম হইতে দেখা গিয়াছে।]

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, আত্রেয় ঋষি প্রবর্তিত বীজসার (Germ Plasm) মত কয়েকটি বিষয়ে ডারউইন ও ভাইস্‌ম্যান সাহেবের ঐ সম্পর্কীয় মত অপেক্ষা অধিকতর উন্নত।

চরক হইতে এ সম্পর্কে অপর একটি আখ্যানভাগ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যথাহি বীজং অনুপতপ্তং উপ্তং সাং স্বাং
প্রকৃতিং অনুবিধায়তে ব্রীহীর্ব্বা ব্রীহিত্বং
যবো বা যবত্বং তথা স্ত্রীপুরুষৌ অপি
যথোক্তং হেতুবিভাগং অনুবিধীয়তে।
তস্মাৎ আপন্নগর্ভাঃস্ত্রিয়ং অভিসমীক্ষ।
প্রাক্ ব্যক্তিভাবাৎ গর্ভস্য পুংসবনমৌষধং
তস্যৈ দদাৎ—স্থানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষু
অহঃসু সংগমেতাং পুত্রকামৌ তৌ অযুগ্মেষু

দুহিতৃকামৌ।...উপচারেচ্চ মধুরৌষধ—
সংস্কৃতাভ্যাং ঘৃতক্ষীরাভ্যাং পুরুষং স্ত্রিয়ার্ত্ত
তৈলমাষাভ্যাং। সাচেৎ এবং আশাসিত
বৃহন্তমবদাতাং হর্য্যক্ষং ওজাস্বিনং শুচিং
সত্ত্বসম্পনাং পুত্রামিচ্ছেয়ামিতি।
"শুদ্ধস্নানাৎ প্রভৃতি অসৌ মধুসর্পিভ্যাং
সংস্কৃজ্য শ্বেতায়া :—গো স্বরূপ বৎসায়াঃ
পয়সা আলভ্য রাজতে কাংস্যে বা পাত্রে
কালে কালে সপ্তাহং সততং প্রযচ্ছেৎ
পানায়।...যা যেষাং জানপদানাং মনুষ্যানাং
অনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা তেষাং জনপদনাং
আহার বিহারোপচার পরিচ্ছদান্ অনুবিধোয়স্য
ইতি বাচ্যাস্যাৎ। ন খলু কেবলমেতদেব
কর্ম্ম বর্ণনাং বৈশেষ্যকরং অপিতু
তেজোধাতুরপি উদকান্তরীক্ষ ধাতু প্রায়ঃ
অবদাত বর্ণকরো ভবতি। পৃথিবী বায়ুধাতু
প্রায়ঃ কৃষ্ণ বর্ণকর। সমসর্ব্বধাতুঃ প্রায়ঃ
শ্যামবর্ণ করঃ আধিক্যে রেতসপুত্র।
কন্যা স্যাত্ আর্ত্তবেহাধিকে।"

চরকের মতে অতি আহার বা স্বল্পাহার প্রভৃতিও বীজসারকে প্রভাবান্বিত করে। ইহার ফলে আহার্যের প্রাচুর্য বা স্বল্পতা অনুযায়ী জীব-বংশ ক্ষুদ্রাকার বা বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া জলবায়ু ও আহার্যের প্রকার ভেদে জীবদিগের গাত্রবর্ণও বিভিন্ন রূপের হইয়া থাকে।

একদেশীয় হস্তী, অশ্ব ও কুকুর প্রভৃতি জীব অন্য এক দেশে পুরুষানুক্রমে বাস করায় ক্ষুদ্রাকৃতি লাভ করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Shetland এর ক্ষুদ্র Ponies ; এবং মাল্টা ও সাইপ্রাস দ্বীপের বামনাকার হস্তীর কথা বলা যাইতে পারে। বীজসার (পুরুষানুক্রমে) স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত হইলে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে কোনও কোনও হিন্দুমনীষীর মতে জীবের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ও দৈহিক উচ্চতা আদি—এই আহারাদির উপর কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। তাঁহাদের মতে প্রথম গর্ভসঞ্চারের কিছু পরে জীবগণ স্ত্রী-পুরুষে বিভক্ত হয়। গর্ভসঞ্চার ও স্ত্রীপুরুষ ভেদের মধ্যভাগে ঔষধ সেবন দ্বারা স্ত্রী বা পুং সন্তান লাভ করা যায়। চরকের মতে এই সময় দম্পতির মানসিক অবস্থা ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী তাহাদের অপত্যদেরও মনোবৃত্তি গড়িয়া ওঠে। এতদ্ব্যতীত চরকের মতে মিলনকালে পুং তেজের আধিক্য হইলে জীব পুরুষ ও স্ত্রী তেজের আধিক্য হইলে জীব স্ত্রী হয়।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বীজবিজ্ঞান বা Cytology ভারতবর্ষে খ্রীঃ জন্মের ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুমিত বা সৃষ্ট হয়। কিন্তু ইউরোপে কেবলমাত্র ১৮৩৮-৩৯ খ্রীঃ অঃ Schleiden এবং Schwann সাহেব সর্বপ্রথম জীবদেহের মধ্যে cell বা কোষ আবিষ্কার করেন। এতদ্ব্যতীত আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, আধুনিক বংশানুক্রম সম্পর্কীয় জ্ঞান ইউরোপে ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ আবিষ্কৃত হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের মূল সূত্র ভারতবাসিগণ খ্রীঃ পূঃ কালেই অনুমান দ্বাঁরা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

বর্তমান কালে 'ক্রোমসম্' সম্পর্কীয় আবিষ্কার জীবদিগের বংশানুক্রম সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সুদূর অতীতকালে হিন্দুগণ উহা

আবিষ্কার করিতে না পারিলেও ঐরূপ বিষয়-বস্তুসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ চরক সুস্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবের ভ্রূণ সর্বসমেত ষোলটি দ্রব্যাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উহাদের মধ্যে চারিটি শুক্র (Sperm) হইতে এবং উহাদের চারিটি স্ত্রী-বীজ (ova) হইতে আগত হয় এবং পরে উহার বর্ধন-কালে আরও আটটি উহাতে সংযুক্ত হইয়া উহাদের সংখ্যা ষোলটিতে পরিণত করে। এতদসম্পর্কে চরকের শরীরস্থান ২য় ও ৭ম অধ্যায় এবং গঙ্গাধর রচিত জলকল্পতরু দ্রষ্টব্য। বৈদ্যপ্রাণ গঙ্গাধর এই দ্রব্যাণুদের 'তেজস্বরূপং' রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন কলিকাতায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জলকল্পতরু গ্রন্থে এই সকল দ্রব্যাণু যে পিতামাতার গুণাগুণ ও দৈহিক আকৃতি বহন করে তাহা অনুমান দ্বারা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

[বৈশিখ বৈদ্য প্রশস্তপদ মুনিও বীজসার বা Germ Plasm সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ঐ সময় বীজসার (Germ Plasm) কে কলল আখ্যায় ভূষিত করা হইত। তবে প্রশস্তপদ এই দ্রব্যাণু (Chromosome ?) সম্পর্কীয় মতবাদ জড় পদার্থের অণু ও পরমাণুর অনুকরণে যে মাত্র কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে সুষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।]

এই সম্পর্কীয় প্রামাণ্য শ্লোকসমূহের কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। এই সকল শ্লোকে 'অণু বা Cellএর অন্তর্বর্তী পরমাণুসমূহ' দ্বারা 'ক্রোমসম' বুঝান হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সকল তথ্য তাঁহারা অনুমান (কল্পনা) দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছেন।

"সমুৎপন্নপাকজৈঃ কললারম্ভক পরমাণুভিঃ অদৃষ্টবশাত্ উপজাতক্রিয়ৈঃ

আহার পরমাণুভিঃ সহ সমভূয় শরীরান্তরমারভ্যতে ইত্যে কল্পনা। পিতু শুক্রং মাতুঃ শোণিতং তয়োঃ সন্নিপাতানন্তরং জঠরানল সম্বন্ধাৎ শুক্র শোণিতারম্ভকেষু পরমাণুষু পূর্ব রূপাদি বিনাশে সতি সমান গুণান্তরোত্পত্তৌ দ্ব্যণুকাদি প্রক্রমেন কলল শরীরোতপত্তিঃ····· নত্র মাতুরাহাররসঃ মাত্রয়া সংক্রমতি অদৃষ্টবশাত্ তত্র পুনর্জঠরানল সম্বন্ধাৎ কললারম্ভক পরমাণুষু ক্রিয়া বিভাগাদিন্যায়েন কলল শরীরে নষ্টে সমুৎপন্নপাকজৈঃ কললারম্ভক পরমাণুভিঃ অদৃষ্টবশাৎ উপজাতক্রীয়ঃ আহার পরমাণুভিঃ সহ সম্ভূয় শরীরান্তরমারভ্যতে ইত্যেষা কল্পনা—শ্রীধর, কণ্যালী, পৃথিবী নিরূপনম্।

বক্তব্য বিষয়টি বুঝিতে হইলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে উহা বুঝিতে হইবে। এই জন্য বর্তমান নিবন্ধে বীজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আমাদের জনন-কোষ এবং দেহকোষ-সমূহের আকার ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র নিম্নতম প্রাণীর দেহের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কোষসমূহ প্রোটোপ্লাসম বা জীব-সার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। উহার মধ্য স্থলে জৈব-মণি বা নিউক্লিয়াস নামক একটি পদার্থ আছে। ঐ সকল কোষের উপর রঙ্ নিক্ষেপ করিলে উহাদের এই নিউক্লিয়াস-টিকে বহুক্ষণ পর্যন্ত রঞ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। এই নিউক্লিয়াসটি হইতেছে জীবকোষ (cell) সমূহের প্রাণকেন্দ্র, কারণ উহা অপসারিত হইলে কোষসমূহ নূতন বীজসার বা প্রটোপ্লাসাম সৃষ্টি করিতে বা উহা ডাইজেষ্ট করিতে অক্ষম হয়, এবং ইহার ফলে উহাদের (কোষস্থিত) সঞ্চিত পদার্থ নিঃশেষিত হওয়া মাত্র উহাদের মৃত্যুবরণ করিতে হয়। অধুনাকালে অবশ্য এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে 'নিউক্লিওলাস' নামক একটি ক্ষুদ্রতর মণি-বিন্দু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নিউক্লিওলাসটিই প্রকৃত পক্ষে জীবদেহের প্রাণাধাররূপে সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল

কোষ বিভক্ত হওয়ার সময় এই নিউক্লিয়াসটিই সর্বপ্রথমে বিভক্ত হইয়া থাকে।

কতকগুলি জীবের বীজ-বিন্দু পতিত হওয়া মাত্র উহারা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া অনুরূপ অপর একটি জীবের সৃষ্টি করে। কিন্তু উচ্চতম জীবসমূহের জনন বীজসমূহ স্ত্রী-বীজ ও পুং-বীজে বিভক্ত। পুং-বীজ-সমূহ কেবলমাত্র একটি পাতলা কেশ সদৃশ লেজযুক্ত নিউক্লিয়াস বা জৈব-মণির দ্বারা সৃষ্ট। স্ত্রী-বীজ নিকেষিত করার জন্য ঐ লেজের সাহায্যে তাহারা অগ্রসর হয়; কিন্তু স্ত্রী-বীজ বা ডিম্বে প্রবেশ করা মাত্র উহারা ঐ ক্ষীণ লেজটি বাহিরে পরিত্যাগ করে। বলাবাহুল্য যে স্ত্রী-বীজের মধ্যেও অনুরূপ নিউক্লিয়াস বিদ্যমান আছে; অধিকন্তু অপত্যের বর্ধনের জন্য উহার মধ্যে যথেষ্ট খাদ্যও সঞ্চিত থাকে। এইজন্য উহারা পুং-বীজ অপেক্ষা বৃহদাকৃতি হইয়া থাকে। যতদূর বুঝা যায় উচ্চতম জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের একমাত্র কারণ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চয়। সম্ভবতঃ প্রথম অবস্থায় একটি জনন-কোষের অপ্রাচুর্যতা অপর এক জনন-কোষের প্রাচুর্যতা দ্বারা পূরণ করিয়া লওয়ার জন্যই দুইটি অনুরূপ বীজের মিলনের প্রয়োজন হইত। এইজন্য যে সকল জীব আজও পর্যন্ত 'যৌনজ ও অযৌনজ, এই উভয় প্রথা দ্বারা জনন-কার্য সমাধা করে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতিকূল পরিবেশে (draught, winter etc.) তাহারা অযৌনজ উপায়ে এবং অনুকূল পরিবেশে তাহারা যৌনজ উপায়ে জনন-কার্য সমাধা করিয়া থাকে। নিম্ন উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদিগের ক্ষেত্রে একই প্রকারের ও আকারের দুইটি জনন-বীজ একত্রিত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু উচ্চ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে দুই প্রকার বীজ দেখা যায়, যথা গতিশীল ক্ষুদ্রাকার পুং-বীজ এবং গতিহীন বৃহদাকার স্ত্রী-বীজ। নিক্ষেপণের কারণে পুং-বীজটিকেই স্ত্রী-বীজকে
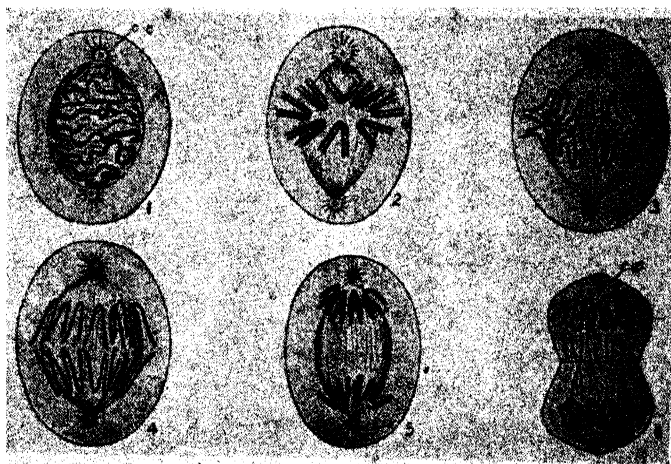
ক্রোমসম সহ বীজকোষের বিভক্তি

ক্রোমসমের মধ্যে বিভিন্নভাবে জিনসের বিনিময়
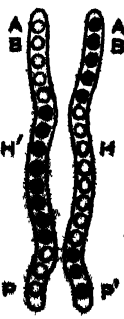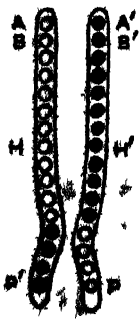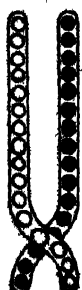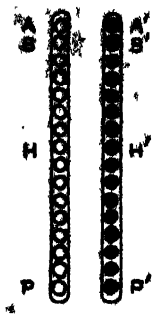
খুঁজিয়া-বাহির করিয়া উহার সহিত তাহার সম্মিলিত হইতে হয়। কয়েকটি নিম্ন প্রাণিদিগের দেহে পুং ও স্ত্রী, এই উভয়বিধ বীজই ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চতম জীবদিগের স্ত্রীগণ মাত্র স্ত্রী-বীজ এবং উহাদের পুংগণ কেবলমাত্র পুং-বীজ ধারণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল স্ত্রী বা পুং-বীজের নিউক্লিয়াসসমূহ রঙ্ দ্বারা রঞ্জনের পর উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক অংশ সমানরূপে রঞ্জিত হয় নি। উহাদের মধ্যে কয়েকটি রড্ বা বাস্ আছে যাহারা বিভক্ত হওয়াকালীন অধিকতররূপে রঞ্জিত হইয়াছে। এই বাস্ বা রড্রূপ পদার্থ নিচয়কে বলা হয় ক্রোমসম বা দ্রব্যাণু। জীবের কোষসমূহ প্রতিবার বিভক্ত হওয়াকালীন উহাদের নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরের ক্রোমসম-সমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়া পড়ে। এই ক্রোমসমসমূহের মধ্যে আবার সূক্ষ্মতর কয়েকটি করিয়া পদার্থ আছে, যাহাদের বলা হয় জিন্স। এই প্রতিটি জিন্ জীবের এক একটি দৈহিক বা মানসিক গুণাগুণের বাহক হইয়া থাকে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমসম থাকিলেও জীবভেদে উহাদের সংখ্যা কম বা বেশী হইয়া থাকে। জীবদিগের জননকোষসমূহ উহাদের পরিপক্ক এবং অপরিপক্ক, এই উভয় অবস্থাতেই বারে বারে বিভক্ত হইয়া আরও বহু অনুরূপ কোষের সৃষ্টি করে। অপরিপক্ক অবস্থায় বিভক্ত হওয়াকালীন উহাদের ক্রোমসমসমূহও লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার পর ঐ বিভক্ত ক্রোমসম-সমূহের দুইটি অংশ যথাক্রমে দুইটি অনুরূপ নবজাত কোষে সন্নিবেশিত হয় (Mitosis)। এইভাবে নবজাত অপক্ক জনন-কোষসমূহেও উহাদের ক্রোমসমের পূর্বতন সংখ্যাই বজায় থাকে। ইহার পর পুং জনন-কোষসমূহের পরিপক্ক হওয়ার পথে এক সময় উহাদের ক্রোমসমসমূহ আর বিভক্ত না হইয়া উহাদের অর্ধেক একটি কোষে এবং উহাদের অপরার্ধেক অপর একটি

কোষে সন্নিবেশিত হয় (Micosis)। অপরদিকে স্ত্রী-কোষসমূহও উহাদের পরিপক্কতার পথে এক সময় উহাদের একটি অংশকে উহাদের অর্ধেক ক্রোমসমসহ 'পোলার বডি'রূপে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এইভাবে জীবদিগের পরিপক্ক স্ত্রী ও পুং-বীজে উহাদের পূর্বতন ক্রোমসমের অর্ধেক সংখ্যা মাত্র দেখা গিয়া থাকে। এইজন্য নিষেকিত হওয়ার জন্য একটি পুং ও একটি স্ত্রী-বীজ একত্রিত হইলে উহাদের মিলনপ্রসূত যে বীজ-কোষ সৃষ্ট হয় তাহার ক্রোমসম সংখ্যা পূর্বানুরূপই হইয়া উঠে। এই ভাবে জীবের যোনিবিশেষের নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমসমই উহাদের অপত্য-গণের বীজকোষে আমরা দেখিয়া থাকি। তবে অপত্যের ক্ষেত্রে উহাদের অর্ধেক ক্রোমসম মাতৃজ এবং অপর অর্ধেক ক্রোমসম পিতৃজ হইয়া থাকে। এইভাবে অপত্যগণ পিতা ও মাতা এই উভয় ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গুণাগুণের অধিকারী তো হয়ই, এমন কি উহাদের মধ্যে তাহাদের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষদেরও অনুরূপ গুণা-গুণও বিবিধ হারে সন্নিবেশিত হইয়া পড়ে। এই সকল গুণাগুণের সবকয়কটিই যে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পায় তাহা নয়; উহাদের কতকগুলি সুপ্ত অবস্থায় বীজকোষের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে, এবং উহা যে কোনও এক অধস্তন পুরুষের মধ্যে জাগ্রত হইয়া পুনরায় পরিস্ফুট হইয়া পড়িতে পারে। সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে যে, জীবদেহে ঐ সকল গুণাগুণের আবির্ভাব পার্শ্বে চিত্রে প্রদর্শিত 'মেনডেল ল' নামক একটি বিশেষ নিয়মের অনুবর্তী হইয়া থাকে। কখন কোন গুণটি কোন পুরুষে সুপ্ত বা জাগ্রত থাকিতে পারে তাহা ঐ বংশানুক্রম সম্পর্কীয় তালিকাটি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে।

এই পুং ও স্ত্রী বীজের মিশ্রণের পর একটি বীজের ক্রোমসম অপর বীজের অনুক্রোমিক ক্রোমসমের সহিত যুক্ত হইয়া পুনরায় পৃথক হওয়া-

বংশানুক্রম বা হেরিডিটি
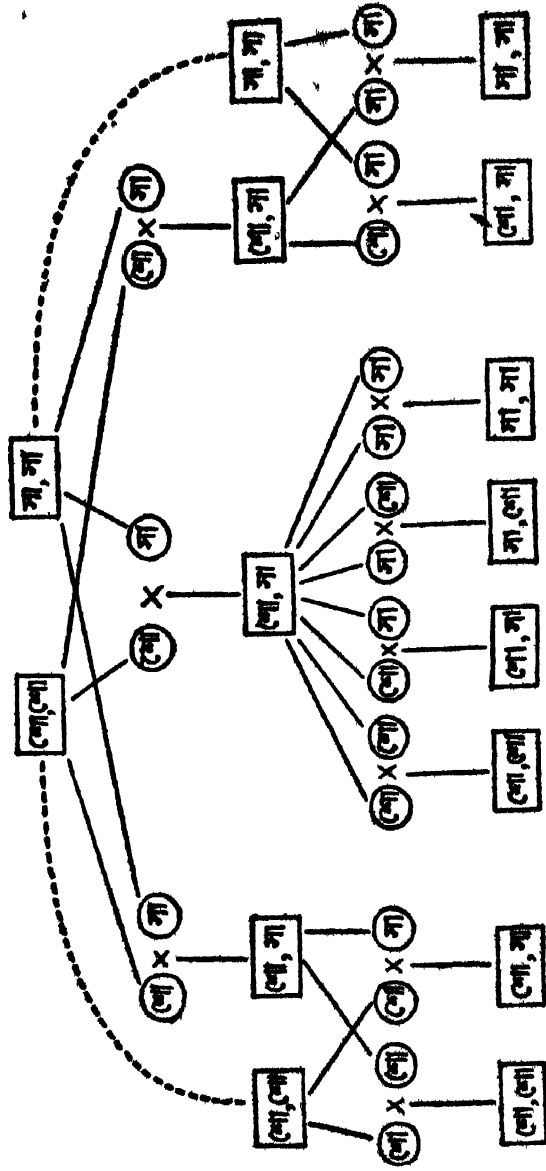
শো = শ্বেতবর্ণ। সা শো = কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ। সা = কৃষ্ণবর্ণ।
[কোনটি সুপ্ত, কোনটি বা জাগ্রতরূপে অবস্থিত]

কালীন উহাদের অভ্যন্তরস্থ জেনিসসমূহেরও এই উভয় ক্রোমসমের মধ্যে বিভিন্ন হারে বিনিময় হইতে পারে। এইভাবে বংশানুক্রম সম্পর্কীয় বিষয় জটিল হইতে জটিলতর হইয়া বহু মধ্যম প্রকার গুণাগুণেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ জীবদিগের বিবিধ গুণের বাহক (গুণান্তরোত-পত্তৌ) এই ক্রোমসমের (পরমাণু) সহিত বাকট্রিয়া জীবের তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। বহু বর্তমান পণ্ডিতদের মতে উহারা জীব-কোষেরই এক একটি পরিবর্তিত অংশ। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুভাষ্যকারগণ মাত্র অনুমান দ্বারা উহাদের জন্মের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনুজীবগণের (এককোষজীব) কয়েকটি অধঃপাতিত হইয়া পরমাণুজীব বা বাকট্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে কতিপয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বাকট্রিয়া জীব পরগাছা (Parasite) রূপে ঐ সকল পূর্বতন অণুজীবের দেহে প্রবেশ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই উভয় জীব একীভূত হইয়া যায়। তাঁহাদের মতে ক্রোমসমের উৎপত্তির মূল কারণ হইতেছে ইহাই।

প্রাচীন হিন্দুগণ এই সকল ক্রোমসমের অবস্থিতি সম্বন্ধে তো অনুমান করিয়া ছিলেনই, এমন কি জীবের প্রাণকেন্দ্র নিউক্লিওলাস সম্পর্কেও তাঁহারা তাঁহাদের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি দ্বারা কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।* পাদটীকায় উদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকটি এই সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য ঐ শ্লোকে (১২০০ খ্রীঃ পূঃ) বলা হইয়াছে যে—‘কেশের অগ্রভাগকে

---

* বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেত, ৫।৯)

শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ। কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও উহা গুণে অনন্ত হইতে পারে।'

[এই সম্পর্কে অপর আর একটি তথ্যের উল্লেখ এই স্থলে করা উচিত হইবে। ক্ষুদ্রাণু এককোষ (দেহাণু) জীবের সমষ্টি দ্বারা যে উন্নত জীব-দিগের দেহ সৃষ্ট তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই সত্যটির সূত্র ধরিয়া প্রাচীন ভারতে একটি তর্কের সৃষ্ট হইয়াছিল যাহা কদাপি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে স্থান পায়নি। ঐ সময়কার পণ্ডিতদের একদল বলিতেন জীবের অণুত্ব (একক প্রাণ) স্বীকার্য এবং উহাদের অপরদল বলিতেন জীবের বিভূত্ব (সমষ্টিগত তথা ব্যাপ্ত প্রাণ) স্বীকার্য। (শ্বেত, ৫।৯, মুণ্ডক, ৩।১।৯ বৃহ ৪।৪।২, ৬।৪।২, ৪।৪।১১, ৪।৪।৬) প্রথমোক্ত পণ্ডিত-গণকে বলা হইত অণুবাদি (পরমাণু রেবায়ং জীবো ন বিভুঃ) এবং শেষোক্ত পণ্ডিতদের বলা হইত বিভুবাদী।]

বাহির্বিবরণ—প্রাণী সম্বর্কে

আর্যঋষিগণ পশুপক্ষীদের সহিত অরণ্যে ও তপোবনে বাস করিতেন। এই কারণে জীবদিগের বহির্বিবরণ ও তাহাদের স্বভাব সম্পর্কে বিবৃতি দিতে তাঁহারা সক্ষম ছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে ও দর্শনে উপমাস্থলে জীবদিগের বহু বিবরণ আমরা পাইয়া থাকি। ক্রৌঞ্চনিধন-জনিত দুঃখই হিন্দুদের প্রথম কাব্য-উন্মেষের সহায়ক হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে জীবদিগের নামকরণ পর্যন্ত তাহাদের আকৃতি ও স্বভাবের উপর নির্ভর করিত। [এই সকল নামবাচক শব্দ অমরকোষ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন অভিধানে লিপিবদ্ধ আছে]। যেমন কুম্ভীরকে নক্র বলা হইত; নক্র=ন—ক্রম্×ড কর্তৃ, অর্থাৎ যে জীব স্বভাবতঃ দূরদূরান্তরে গমন করে না। স্ত্রী-কূর্মগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া চলে, এই কারণে তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল—ডুলি; ডুলি—কি কর্তৃ।

ভেক সম্বন্ধে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাহারা ক্ষুদ্র জলাশয়ে বাস করে ও বর্ষাকালে জন্মায়। তাহারা লাফাইয়া চলে ও মুখ দিয়া শব্দ নির্গমন করে; তাহাদের জিহ্বা নাই ও তাহারা স্বভাবতঃ ভীরু। এই কারণে তাঁহারা যথাক্রমে ভেকের নামকরণ করিয়াছিলেন—যথা, মণ্ডূক=মণ্ডি+উক+কর্তৃ, অজিহ্বা, বর্ষাভূ=বর্ষা—ভূ×ক্বিপ্ কর্তৃ। প্লব=প্লু+অচ+কর্তৃ, শালুর=শদ্+উরণ+কর্তৃ, ভেক=ভী+ক+কর্তৃ।

সর্পজীব সম্পর্কে আর্যঋষিগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাহারা

বক্ষ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া চলে এবং ইহাদের গতি বক্র হইয়া থাকে। ইহাদের বিষ দাঁত এবং চক্র ও ফণা আছে। ইহাদের পৃষ্ঠ দীর্ঘ ও উহাতে বলয়াকৃত বেষ্টন আছে। ইহাদের কাহারও কাহারও পৃষ্ঠে রেখা দেখা যায় এবং ইহাদের জিহ্বা দ্বিধা বিভক্ত। এই কারণে আর্যগণ পর পর তাহাদের নাম করিয়াছিলেন, যথা সর্প=সৃপ্+অচ্, ভূজঙ্গ=ভূজ—গম—খ, আশীবিষ, দ্বিজিহ্বা, চক্রিন=চক্র+ইন্, ফণিন, দীর্ঘপৃষ্ঠ, কণ্ডলীন=কুণ্ডল+ইন্, বাজীন ইত্যাদি।

অরণ্যে ও তপোবনে বাস করায় আর্যঋষিগণ জীব-স্বভাবও উত্তমরূপে পরিলক্ষ্য করিতে সক্ষম ছিলেন। জীবদিগের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অসীম। নিম্নে এই সম্পর্কে মাত্র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। এই শ্লোকটিতে বলা হইয়াছে যে যদি পিপীলিকা ডিম্ব মুখে করিয়া গর্ত হইতে উদ্গত হইতে থাকে, সর্পগণ ব্যবয়াসক্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করে, এবং গো সকল মাঠে উলম্ফন করিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বৃষ্টি আসন্ন। উল্লিখিত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"বিনোপঘাতেন পিপীলিকানামন্ডোপ
সংক্রান্তি বাহিব্যবয় ক্রমাধিরোহশ্চ
ভূজঙ্গমানাং বৃষ্টেনির্মিত্তানি গবাং প্লুতঞ্চ।"

বৃহৎ-সংহিতা।

এতদ্ব্যতীত পিপীলিকা সকল বৃষ্টিপাত যে আসন্ন তাহা কিরূপে জানিতে পারে সেই সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে যে উষ্মার প্রাদুর্ভাবের কারণে মেঘ বাষ্পে তরলীকৃত হইয়া বৃষ্টিপাত করে সেই উষ্মা জাত হইতে আরম্ভ

হওয়া মাত্র পিপীলিকারা উহাদের অতিন্দ্রিয় দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। [Tatparyyatika II সূত্র ৩৭]

ন চ পিপীলিকাণ্ড সঞ্চরণং বর্ষস্য কারণমনুপলব্ধ-সামর্থাৎ। অসত্যাপি তস্মিন্ বর্ষস্যোৎপত্তেঃ বর্ষমূল-কারণস্য তু মহাভূতক্ষোভস্য পিপীলিকাণ্ড সঞ্চরণং পূর্ব কার্যম্ কথ্যমানা খলু পিপীলিকা ভৌমেনোষ্মণ্য স্বানি অণ্ডানি-ভূমিষ্ঠানি উপরিষ্টাত ন যন্তি।

ইতি—বাচস্পতি প্রমুখ

কালক্রমে প্রাণী সম্পর্কীয় উপমা দেওয়া একটি ব্যাপক প্রথা এবং স্থলবিশেষে রচনাকৌশল দেখাইবার প্রবৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু কাব্য ও দর্শন কেন, বিজ্ঞানের মধ্যেও এই রীতির প্রচলন হইয়া উঠে। আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থের বহু তথ্য এই উপমার সাহায্যে ছাত্রদের বুঝানো হইয়াছে। এমন কি মানুষের নাড়ীর বিভিন্ন গতি পর্যন্ত সর্প, ভেক, ময়ূর, হংস, পারাবত, কুক্কুর, ভ্রমর, কাঠঠুকরা, জোঁক প্রভৃতি জীবদিগের গতির সহিত তুলনা করা হইত। নিম্নে এই সম্পর্কে আয়ুর্বেদ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল :—

"সর্পজলৌকাদি গতিং বদন্তি বিধুরাঃ প্রভঞ্জনেনী নাড়ীম্।
পিত্তে কাকলাবক ভেকাদি গতিং বিদুঃ সুধীয়ঃ"
রাজহংস ময়ূরাণাংপারাবত কপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদের্গতিং ধত্তে ধমনী কফ-সঙ্গীনী।

*　　*　　*　　*

মুহুঃ সর্পগতি নাড়ী মুহুর্ভেক গতিস্তথা।

*　　*　　*　　*

কাষ্ঠকুট্টো যথা কাষ্ঠং কুটুতে চাতিবেগতঃ।"

আয়ুর্বেদ নাড়ী প্রদীপ।

"গতিং ভ্রমরকস্তেব বহেদেকদিনেন তু।"

রোগ পরীক্ষা প্রকরণম্।

উপরের আখ্যান ভাগ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে আর্য মনীষিগণ জীব-স্বভাব ও উহার ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিতেন। ইতিপূর্বে ভাগবতোক্ত (৫০০-৬০০ খ্রীঃ অঃ) জীবদিগের মানসিক বিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে আর্যগণ অতি সুন্দরভাবে উহাদের বিবিধ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর রূপে জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। আজ হইতে বহু শতাব্দী পূর্বে এই জ্ঞান প্রাচীন হিন্দুগণ অর্জন করিতে সক্ষম হইলেও, পাশ্চাত্য দেশে মাত্র ১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ বরাবর Jening সাহেব এবং Romanes, Georgs Tohu ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে জীব-স্বভাব ও তাহাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত জীবদিগের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও প্রাচীন হিন্দুগণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বহু আখ্যান ভাগে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে হস্তী, হরিণ প্রভৃতি নেতার অধীনে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির দম্পতি এককভাবে বনের এক এক অংশে পৃথক পৃথক ভাবে গুহা প্রভৃতিতে বাস করে। ইহা ছাড়া এক শ্রেণীর জীব অপর এক শ্রেণীর জীবের বহুবিধ উপকারও করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েক প্রকার পক্ষী আছে যাহারা গবয়, কুম্ভীর প্রভৃতি জীবদিগের দেহ হইতে ঠুকরাইয়া খাইবার জন্য পোকা বাছিয়া নিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র জীব

যে বৃহৎ জীবের দেহের অভ্যন্তরে পরগাছার ন্যায় বাস করিয়া থাকে তাহাও প্রাচীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই সম্পর্কে বহু লুপ্ত জ্ঞান এই দেশের পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে আজও পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৎস্য জীবদের শ্বাসক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে। ভারতের পল্লীবাসিগণ পুরুষানুক্রমে অবগত আছে যে, বহু মৎস্যকে শ্বাসক্রিয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে জলের উপরিভাগে উঠিয়া বুজকুড়ি কাটিতে হয়। এইজন্য মৎস্য ধৃত করণার্থে বহু স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় চোররা রাত্রে জলে নামিয়া একত্রে সারা পুষ্করিণীর জলে ঘাই দিতে থাকে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, মৎস্যগণ অক্সিজনের অভাবে আধমরা হইয়া জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষ সত্যটির পরীক্ষা আমি একটি মামুলী যন্ত্রের সাহায্যে সমাধা করিয়াছি। একটি গোল কাঁচের জারের ভিতর কৈ মাছ রাখিয়া উপর হইতে দুইটি লৌহদণ্ডযুক্ত একটি সূক্ষ্ম তারের গোল ছাঁকুনী জলের মধ্যে মাত্র কিয়দ্দূর নামাইয়া দিই। এইরূপ অবস্থায় অক্সিজেন গ্রহণের জন্য উপরে উঠিতে না পারায় কিছুক্ষণ বাদেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে।

এই পরীক্ষাটি সর্বপ্রথম করেন এই দেশের একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ য়ুরোপীয় জেলা হাকিম মিঃ ডে (Day) I.C.S. ইনি তাঁহার শাসনাধীন এলাকায় পুলিসের রিপোর্টে এইরূপ মৎস্য চুরি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া এই পরীক্ষা করেন। জুলোজিক্যাল সার্ভেতে আসিয়া তিনি ভারতীয় 'ফনা' সম্বন্ধে একটি বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

প্রশীল-বিজ্ঞান

প্রশীল (Fossil) বিজ্ঞানকে ইংরাজীতে 'পেলিয়নটলজি' বলা হয়। এই বিদ্যা প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে আলোচিত হইত কিনা তাহা এক্ষণে সঠিকভাবে বলা শক্ত। আমার অনুমান যে প্রাচীন হিন্দুগণ হয়তো এই বিদ্যাকে 'অশ্মীন' বিদ্যা বলিতেন। সেই যুগে পাহাড় ও মৃত্তিকা কাটিয়া সুগভীর জলাশয় এবং কূপাদি খননের ব্যাপক প্রথা ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল। এই সময় সম্ভবতঃ অধুনালুপ্ত বা ক্রমলুপ্ত জীবদিগের বহু প্রশীল কঙ্কাল (প্রস্তরীভূত Fossil) তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবে। 'প্রত্যক্ষ' এবং 'অনুমান' দ্বারা এই সম্বন্ধে তাঁহারা হয়তো আলোচনাও করিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধেও তাঁহাদের ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মূলতঃ পৃথিবীর চারিটি যুগ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, 'পেলিওজোয়িক' বা প্রথম যুগ, 'মেজোজোয়িক' বা দ্বিতীয় যুগ, 'কেইনোজোয়িক' বা তৃতীয় যুগ এবং 'কোয়াটার-নারিক' বা চতুর্থ যুগ।

[এক একটি জীব-বংশ এক একটি যুগে সৃষ্ট হইয়াছিল। পৃথিবীর মাটি খুঁড়িয়া উহার বিভিন্ন যুগীয় স্তরে এই সকল বিভিন্ন জীবের প্রশীল-কঙ্কাল এবং চিহ্ন ও দাগ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে যাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের বলা হয় অধুনালুপ্ত জীব এবং যাহাদের দেহ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের বলা হয় ক্রমলুপ্ত জীব]।

অনুরূপভাবে প্রাচীন হিন্দুগণও পৃথিবীর চারিটি যুগ কল্পনা

করিয়াছিলেন। যথা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই সকল বিভাগের মধ্যে কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল কি'না তাহা আমি জানিতে পারি নাই। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যদি একান্তই থাকিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পৃথিবীর Recent বা অধুনা যুগকে তাঁহারা এইরূপ চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই অধুনা যুগের পূর্বেরও কয়েকটি যুগ সম্বন্ধীয় ধারণা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সেই সকল যুগে বিচরণশীল জীবাদির কঙ্কাল সম্ভবতঃ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ঐতরেয় (C: ৮০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ব্রাহ্মণে (৭।১৫) আমরা একটি শ্লোক পাই। যথা, কৃতঃ সম্পদ্যতে চরন",—ইহার অর্থ—"কৃতযুগে ইহারা বিচরণশীল ছিল।" 'বিচরণশীল' বাক্যটি মনুষ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, উহা জীব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। শ্লোকোক্ত জীবটি ঐ শ্লোকের রচনাকালে যে জীবিত ছিল না, তাহাও উহা হইতে বুঝা যায়। কেহ কেহ 'কৃতযুগকে' সত্যযুগের নামান্তর মনে করেন। কিন্তু এইরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। বাজ সেনিয় (১৫০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ) সংহিতায় (২৪।৩৯) 'ঘৃনিবান্' নামক এক প্রাচীন জীবের উল্লেখ আছে। প্রাচীন টীকাকার ইহাকে "দীর্ঘগ্রীবী তেজস্বী" প্রাচীনকালীন জীব মনে করেন। [তুষার যুগে ইহার কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে] খুব সম্ভবতঃ 'ডাইনোসরাস' জাতীয় জীবের প্রশীল কঙ্কাল দেখিয়া আর্যঋষিগণ উহার নাম দিয়াছিলেন 'ঘৃনিবান।' ইহাকে 'জিরাফ' বা 'উষ্ট্র' মনে করিবার কোন হেতু নাই ; কারণ ইহাদের তেজস্বী বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত উষ্ট্র প্রভৃতি সাধারণ জন্তুর বর্ণনা তাঁহারা সাধারণভাবেই করিয়াছেন। বেদগ্রন্থে সিংহ হননকারী 'শরভ' নামক এক জীবের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ কোনও জীবের কথা ঐতিহাসিক কালের মধ্যে শুনা যায় নাই।

এই 'শরভ' জীব প্রকৃত পক্ষে কোন জীব ছিল তাহা বলা একরূপ দুরূহ। এই 'শরভ' জীব একটি প্রাচীন-যুগীয় সরীসৃপ জীব বলিয়া মনে হয়। এই জীব সম্পর্কীয় প্রামাণ্য শ্লোকটি ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইবার, প্রাচীন-জীবের প্রশীল-কঙ্কাল হিন্দুদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিনা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সম্পর্কে নিম্নে মহাভারতোক্ত (বনপর্ব) (C: ৪০০ খ্রীঃ পূঃ-৪০০ খ্রীঃ পর) শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য—

—যক্ষ উবাচ—

"কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে॥"

—যুধিষ্ঠির উবাচ—

"মৎস্য সুপ্তো ন নিমিষত্যন্তং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদীবেগেন বর্দ্ধতে॥

উপরের শ্লোক হইতে আমরা অবগত হই যে, মৎস্য ঘুমায় না এবং অশ্মন (জীবের ?) হৃদয় নাই। 'অশ্মন' শব্দের অর্থ প্রস্তর বা প্রস্তরাকার। পাথরের হৃদয় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। হৃদয় শব্দ কেবলমাত্র জীব সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সম্ভবতঃ মৃত্তিকা খননকালীন প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত জীব-কঙ্কালসমূহকে তাঁহারা 'অশ্মন' বলিতেন। ঐ সময় খুব সম্ভবতঃ দীর্ঘিকা ও কূপ খননকালে এইরূপ বহু প্রাচীন জীবের প্রশীল-কঙ্কাল প্রভূত সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ এতৎসম্পর্কে বলিতে পারেন যে 'সিলেণ্ট্রাটা' জাতীয় জীবকে লক্ষ্য করিয়া 'অশ্মন' বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেহনির্গত রস দ্বারা এই জীব পাথরের মত একটি আবরণ তৈয়ারী করে এবং ইহারা দেখিতে পাথরের মত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে

হয় যে 'অশ্মন' শব্দ অর্থে যদি তাঁহারা কোনও জীব বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ শব্দ দ্বারা 'প্রশীল'-জীবকেই বুঝিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে প্রস্তরাদির বর্ধন (?) আছে বলিয়া তাঁহারা উহাদেরও জীব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমরা ভাগবতোক্ত একটি শ্লোকে দেখিয়াছি যে প্রস্তরকে 'অ-জীব' (অজীবনাং) রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। এইজন্য, 'অশ্মন' শব্দের দ্বারা তাঁহারা সাধারণ প্রস্তরকে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ইউরোপে 'প্রশীল-বিদ্যা' বা 'পেলিয়ন্টলজি' একটি অতি আধুনিক বিদ্যা। মহামতি Nicholas steno (১৬৩৮—১৬৮৬ খ্রীঃ অঃ) ইহার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ করেন। বর্তমান 'ইভলিউসন' থিওরি বা ক্রমবিকাশ মতবাদ এই প্রশীল-বিজ্ঞানের উপর মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্যগণ প্রাচীনকালে এই ক্রমবিকাশ মতবাদ প্রশীল-বিদ্যা সম্পর্কীয় সমধিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সুস্পষ্ট রূপেই বলিয়া গিয়াছেন—প্রথমে অজীব এবং তাহার পর 'জীব' এবং জীবদিগের মধ্যে নিরস্থিক হইতে অস্থিক জীব, তাহার পর যথাক্রমে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী এবং পরে বানর ও মনুষ্য জীবের আবির্ভাব হয়। এই নির্ভুল মতবাদ প্রশীল-বিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে কিরূপে তাঁহারা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। এমন কি প্রাচীন মনীষিগণ একটি জীব হইতে অপর একটি জীবের সৃষ্টি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় লাগিয়াছে তাহারও হিসাব তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি তাঁহাদের নির্ভুল অনুমান শক্তি না অন্য কিছু—তাহা আজ কে বলিয়া দিবে?

এতদ্ব্যতীত কোনও কোনও প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ পৃথিবীতে

প্রবাহিত মহাকালকে কয়েকটি বিশেষ যুগ বা কালে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, উহাদের যথাক্রমে স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও কর্ম সম্পর্কীয় কাল বা যুগ বলা যাইতে পারে। জীবদিগের বিবিধ ইন্দ্রিয়াদির ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য এই সকল যুগের কল্পনা তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবী যথাক্রমে স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও কর্ম জ্ঞানের উপযুক্ত হইলে তবে জীবদেহে পর পর এই সকল জ্ঞানের উদ্ভব হইতে পারিয়াছিল।

উপরোক্ত তথ্যটি আমি জীবদিগের মানসিক ও জনন বিভাগ সম্পর্কীয় নিবন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি। ঐ সকল তথ্য হইতে ইহা প্রতীত হইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ভূস্তর সম্পর্কীয় জ্ঞান অপেক্ষা এ্যাসট্রোনমি বা গণিত-জ্যোতিষ এবং তৎসহ ভ্রূণ শাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের উপর অধিক প্রাধান্য দিতে পারিয়াছিলেন। কারণ ঐ সময় প্রশীল-বিদ্যা রূপ কোনও বিশেষ বিদ্যা এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নি বলিয়াই আমি মনে করি। এই সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা আমি সৃষ্টিক্রমের প্রমাণ সম্পর্কীয় প্রবন্ধে করিব।

[এই প্রশীল বা অশ্মীন বিদ্যা ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় অন্যতম প্রমাণ। মানুষ মাটি খুঁড়িয়া ইহা বাহির করিয়াছে। এই বিদ্যাকে ইংরাজীতে বলা হয় পেলিয়নটজিলজী। কোনও জীবদেহ মাটির তলায় চাপা পড়িয়া কোনও পাথরের সংস্পর্শে আসিলে, উহার কঙ্কালের প্রতিটি কণা একে একে বিচ্যুত হয় এবং ঐ প্রস্তরের প্রতিটি কণা কঙ্কালের অস্থিকণাসমূহের পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করিয়া উহাদের ধীরে ধীরে পাথরে পরিণত করিয়া দেয়। ইহার ফলে আমরা হুবহু অনুরূপ একটি পাথরের কঙ্কাল মাটির তলায় পাইয়া থাকি। এই জীব সকলের

এইরূপ ভূতল সমাধি সাধারণতঃ জলের সাহায্যেই হইয়া থাকে। জল প্রবাহের কারণে প্রস্তর ধ্বসিয়া বা গুঁড়া হইয়া নিম্নের ভূমি আবৃত করে। কখনও কখনও নদীর দুই কূল ছাপাইয়া বন্যা আনিয়া বৎসরের পর বৎসর বহু জীবের সলিল সমাধি ঘটাইয়াছে। ইহা ছাড়া পলি পড়িয়া পড়িয়া ভূমিসমূহ ক্রমশঃ উঁচুও হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে পদ্ধতিতে কঙ্কালসমূহ প্রশীলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই পদ্ধতিসমূহ প্রাচীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন কি না? তবে তাঁহারা বহুস্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, কালক্রমে (রণরূপত্বং প্রাপ্তা কালান্তরেন) একটি জাতীয় দ্রব্য অপর এক জাতীয় দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত একস্থানে এমন কথাও তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে মৃত জীবের অস্থিসমূহও প্রস্তরীভূত (শীলা মৃতকপালাদয়) হইতে পারে। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য আখ্যানভাগসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"পার্থিবা : সুবর্ণরজতমণিমুক্তামনঃ শিলা মৃত কপালাদয়ঃ, ইত্যাদি ; ইতি দলভ্য [Dalvna on Susruta loc-cit] কেচিত ভূবঃ স্বভাবাত্ বৈচিত্রং প্রাহারূপলানাম, ইতি বরাহমিহির। রণরূপত্বং প্রাপ্তাঃ কালান্তরেন, ইতি উৎপল।"

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রশীল-বিদ্যা সম্পর্কীয় মূল সূত্র সম্বন্ধে প্রাচীনকালীন হিন্দুগণ সাধারণ ভাবে অবগত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। কারণ এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট রূপ প্রমাণ আজও আমরা উদ্ধার করিতে পারি নি।

ভৌগোলিক বিস্তার

প্রাণিদিগের ভৌগোলিক বিস্তার বা 'জিওগ্রাফিক্যাল ডিষ্ট্রিবিউশন্' প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই সম্বন্ধে যা কিছু অনুসন্ধান য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে আরম্ভ করা হয়। প্রাচীন আর্যঋষিগণও বিবিধ প্রাণীর বাসস্থান কোথায় আছে এবং তাহাদের মধ্যে কাহাদের কাহাদের কোন্ কোন্ দেশ বা প্রদেশে পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে বিশেষরূপে অভিহিত ছিলেন। এই সকল জ্ঞান ভারতবর্ষে ১০০ হইতে ৪৫০ খ্রীঃ এবং তৎপূর্বকাল হইতেই সংগৃহীত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই নিবন্ধে হস্তীর ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে গজায়ুর্বেদ (৪৫০ খ্রীঃ) হইতে কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করা হইল। এই তথ্য হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশের নাম এবং তৎসহ ভারতবর্ষের বাহিরের কয়েকটি দেশের নামও জ্ঞাত হওয়া যায়।

উত্তম গজাকর প্রদেশ; যথা 'তবন্নাল'' সরবাহ, প্রজ্ঞাপয়োর, যবন, সুগুল্লাস সুত্তখণ্ড, শাম্বল, সৌলুক, অহিবল, সুসহ্বক, চিক্কুল, বাহর, গুর্জর, কেরল, দর্শান, বাহ্লীক, সৌবীর, বিদর্ভ, অবন্তী, নেপাল, হুন্, সুন্দ, বঙ্গ, পুলিন্দ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), পৌণ্ড্র, সিন্ধু, যুগন্ধর, কোশল, পাঞ্চাল ও জাঙ্গল। এই সকল দেশ ও প্রদেশ প্রাপ্ত গজগণ সর্বোত্তম হইয়া থাকে।

'মধ্যম গজাকর প্রদেশ; যথা, তাহার, বাহুক, গীর্বান, মরাল, অঙ্গ, বনায়ুজ, সিন্ধু, লাটবর, কম্বোজ এবং অনুপ। এই সকল দেশে ও প্রদেশে প্রাপ্ত গজগণ মধ্যমরূপে উত্তম।

'অধম গজাকর প্রদেশ ; যথা, গান্ধার, ভোজ, করহাট, মৎস্যরাষ্ট্র, নীরবাল, মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু। এই সকল দেশে ও প্রদেশে প্রাপ্ত গজগণ অত্যন্ত সাধারণ এবং নিম্নস্তরের।

'শঙ্কর গজাকর প্রদেশ! যথা, অশ্মন্ত, মালব, ত্রিগর্ত, বর্বর, মৎস্য, কাশ্মীর, যবন্ত, বৎস, কলিঙ্গ, ঘুর্নিক, সৌরাষ্ট্র, আবট্ট, শণ্ডমল্ল, সুরসেন, চৌর্য, বঙ্গ, বিদেহ, সুদেষ্ণ, কোঙ্কন, সামুদ্র, সৌরজীব, গৌরব, আপুক, কেকয়, ক্ষার, যবকল, বিকুন্ত, পাণ্ড্র, পাশ্চাত্য, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মলয়গল, তৌলব, কণ্টক, সগর, মগধ ও চেকিতান। এই সকল দেশে ও প্রদেশে প্রাপ্ত শঙ্কর শ্রেণীর হস্তি প্রসিদ্ধ।

কেরল প্রদেশের প্রান্তদেশে যে সকল মাতঙ্গ জন্মে, তাহাদের মুখমণ্ডল ও কর্ণযুগল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর দ্বারা অলঙ্কৃত, নেত্রদ্বয় তাম্রাভ অথচ স্নিগ্ধ, দর্শনাবলী ক্ষীণ ও শ্বেতবর্ণ এবং উহাদের আকৃতি প্রিয়দর্শন।"

উপরোক্ত প্রদেশ ও দেশসমূহের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বাহ্লিক প্রদেশ, কম্বোজ বা কাম্বোডিয়া (শ্যাম রাজ্য ও চীনের নিকট অবস্থিত) দেশের কথাও বলা হইয়াছে। যবন বলিতে যে একটি বিদেশী রাজ্যকে (ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে) বুঝানো হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত হুন জাতি অধ্যুষিত (Huns) হুন দেশের নামও আমরা ইহাতে উল্লেখিত হইতে দেখি। ঐ সময় সৌরাষ্ট্র বলিতে বর্তমান সুরাট, মৎস্য বলিতে আগ্রা ও সম্বর নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, বর্বর বলিতে সিন্ধু প্রদেশের পূর্বাংশ, ত্রিগর্ত বলিতে পাতিয়ালা, সৌবির বলিতে গুজরাট, দর্শান বলিতে ভূপাল, করহাটক বলিতে বোম্বাইয়ের করাচি, সুরশন বলিতে মথুরা, কুক্কুর বলিতে যোধপুর দেশকে বুঝানো হইত।

হস্তীদিগের ন্যায় গরু এবং অশ্বের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে যথাক্রমে

গবায়ুর্বেদ ও অশ্বায়ুর্বেদে বলা হইয়াছে। হিন্দুদের ধারণা ছিল যে অশ্বের জন্মস্থান এশিয়া মহাদেশে। এইজন্য এশিয়া মহাদেশকে সংস্কৃততে 'আশ্বেয়' বলা হইয়া থাকে। এই 'আশ্বেয়' শব্দ হইতে এশিয়া মহাদেশের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল অস্থিক জীব ব্যতীত নিরস্থিক জীবের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কেও আর্য ঋষিগণ বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জলৌকা বা জোঁক জীবের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। নিম্নে সুশ্রুত (২০০ খ্রীঃ) হইতে একটি আখ্যানভাগ এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হইল :—

"যবন বা তুরস্ক দেশ, পাণ্ড্য (কম্বোজের দক্ষিণভাগে অবস্থিত দেশ,) ইন্দ্রপ্রস্থ বা পুরাতন দিল্লীর নিকটে, নর্মদা নদীর তীরবর্তী সহ্য দেশে ও পৌতান বা মথুরা দেশে, দীর্ঘকায় হৃষ্টপুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী নির্বিষ জলৌকা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।"

বিবিধ সংস্কৃত সাহিত্য ও আয়ুর্বেদগ্রন্থাদিতে এবং মৃগপক্ষী ও শৌনিক শাস্ত্রে, মৎস্য, পক্ষী এবং বিবিধ অস্থিক জীবের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে আরও বহু তথ্য পাওয়া গিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে হিন্দু প্রাণিবিদ্ পণ্ডিতগণ জীবদিগের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কেও বহু তথ্য সংগ্রহ করিতেন।

প্রাণী-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে জীবসমূহের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এইজন্য এই সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা এই প্রবন্ধে আমি করিতে চাই। সাধারণতঃ বৃহৎ জীবসমূহ আহারের সন্ধানে কিংবা ভ্রাম্যমাণ জীবরূপে এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন করে। পুরাকালে একটি মহাদেশ হইতে অপর মহাদেশের মধ্যবর্তী যোগসমূহ অতিক্রম করিয়া বিবিধ জীবগণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে এইরূপ সংযোগ স্থলভাগ বিনষ্ট

হইয়া যাইলে উহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রহিত হইয়া পৃথকভাবে বর্ধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমুচ্চ পর্বত, দুস্তর মরুদেশ বা সাগর প্রভৃতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াও একই জীবগোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক ধারায় বর্ধিত হইতে হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিমালয় পর্বত রূপ বাঁধার (Barrer) কথা বলা যাইতে পারে। এই দুস্তর পর্বতের অবস্থিতির জন্য চীনজাতি ও ভারতীয়দের মধ্যে নির্বিকার মিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই ; এই জন্য এই বিশাল পর্বতের উভয় প্রান্তে আমরা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের জাতি দেখিতে পাই। বহু পণ্ডিতদের মতে যুগে যুগে নৈসগিক বিপ্লবের কারণে এইরূপ বহু বাধার সৃষ্টি করিয়া বারে বারে একই প্রকারের বহু জীবগোষ্ঠীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাদের বিভিন্ন ধারায় বধিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। তবে পক্ষী প্রভৃতি জীবরা বহুদূর পর্যন্ত উড়িয়া যাইয়া বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম। ঐ সকল পক্ষীর পদে ও পক্ষে বহু নিরস্থিক জীবের ডিম্বও সংলগ্ন থাকিয়া দূর দূরান্তরে নীত হইতে পারে। বহুক্ষেত্রে কাষ্ঠ প্রভৃতির সহিত জলে ভাসিতে ভাসিতে বহু জীব বা উহাদের ডিম্ব এক দেশ হইতে অপর দেশে নীত হইয়া থাকে। জল ও বায়ুও বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ডিম্বসমূহকে দূর দূর স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের ও তলদেশে জলের চাপ অনুযায়ী বিভিন্ন জলজ জীব বিভিন্ন প্রকারের হইয়া সাগর জলের বিভিন্ন স্তরে পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা সম্বন্ধে আমি সৃষ্টিক্রম শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বীক্ষণাগার—প্রাণী সম্পর্কীয়

সেই প্রাচীনকালে কোনও সুগঠিত বীক্ষণাগার বা Laboratory নিশ্চয়ই ছিল না। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রও সেই সময় সৃষ্ট হয় নাই। তত্রাচ প্রাণী সম্পর্কীয় বিবিধ দুরূহ বিষয়ের সমাধান হিন্দুগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমার মতে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি না হইলেও কাঁচ ও মণি নির্মিত শক্তিশালী লেনসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সুশ্রুত (১০০-২০০ খ্রীঃ পূঃ) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ যুগে দেহ-ব্যবচ্ছেদ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বহু যন্ত্রপাতির প্রচলন ছিল এবং ঐ সকল যন্ত্রপাতি লৌহ, ফটিক, কাচ, বংশখণ্ড প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ যুগে ভারতীয় কাচ শিল্প বিশেষরূপে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। Pliny সাহেবের মতে প্রাচীন ভারতেই সর্বশ্রেষ্ঠ কাচ নির্মিত হইত। ঐ যুগে নির্মিত বৃত্ত (Spherical) এবং বর্তুল (oval) কাচের বিবরণও আমরা পাইয়া থাকি।* আমি একজন বৃদ্ধ বৈদ্যশাস্ত্রবিদের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রাচীন যুগে স্বল্পায়তন ফাঁপা বাঁশের দুই মুখে কাচ বা মণি রাখিয়া একপ্রকার দর্শনযন্ত্র সৃষ্ট করা হইত। এই দর্শন যন্ত্রটির সহিত আলোক প্রতিফলিত করিবার জন্য পৃথকভাবে একটি মুকুরও ব্যবহার করা হইত। এই যন্ত্র মামুলি হইলেও ইহার দ্বারা বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পরিদৃষ্ট হইত বলিয়া মনে হয়।

---

* See Positive Science of the Hindus by Dr. Brajendra Nath Seal.

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে মণি ও কাঁচ দ্বারা লেনস্ সৃষ্ট হইত তাহার প্রমাণ স্বরূপ দিনকরীর সিদ্ধান্ত মুকুটবলী সম্পর্কীয় ভাষ্য হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। এই আখ্যান ভাগ হইতে ইহাও জানা যায় যে, ঐ লেনস্ এত শক্তিশালী হইত যে উহার সাহায্যে আলোকরশ্মি ঘনীভূত করিয়া শুষ্ক তৃণ ও অন্যান্য দাহ্য বস্তুসমূহ অতি সহজে বিদগ্ধ করা সম্ভব হইত। এই সকল লেনস্ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত হওয়া যে খুবই সম্ভব ছিল তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

"কেচিত্তু বহ্নিং প্রতি তৃণফুৎকার সংযোগাদীণাং তৃণফুৎকার-সংযোগ-ত্বাদিরূপেণ কারণতয়া ব্যভিচারেণ অসম্ভবাৎ অতিরিক্ত শক্তিসিদ্ধিঃ। ন চ তৃণফুৎকারয়োঃ অরণিনির্মন্থো মণি-তরণি-কিরণয়োশ্চ সম্বন্ধস্য জন্যতা-বচ্ছেদকং বহ্নিবৃত্তি বৈজাত্যত্রয়ং কল্প্যমিতি ন ব্যভিচার ইতি বাচ্যম্। তজ্জন্যতাবচ্ছেদকবৈজাত্যত্রয় কল্পনামপেক্ষ্য তত্তত্ সম্বন্ধাণাং একশক্তি-মাবেন কারণত্বকল্পনায়া এব লঘুত্বেন ন্যায্যত্বাত্ ইত্যাহুঃ, তত্র…অন্যতম-ত্বেন কারণতাসম্ভবাত্…পরে তু তৃণাদি সম্বন্ধকালীন বায়ুসংযোগাদীণাং একশক্তিমত্বেন কারণতা সম্ভবাৎ…পরে তু তৃণাদি সম্বন্ধোকালীন বায়ু-সংযোগাদীণাং একশক্তিমত্বেন হেতুতামাদায় বিনিগমনাবিরহাৎ ন শক্তি-সিদ্ধিঃ ইত্যাহুঃ,শ্লোক c/f also তৃণারণিমণ্যন্যতমত্বং কারণস্য বিনিগমকম্।"

"কথং তর্হি তৃণারণি মণিভ্যো ভবন্নাশুশুক্ষিরেকজাতীয়ঃ একশক্তি-মত্বাত্ ইতি চেত্ ন। যদি হি বিজাতীয়েষু অপি একজাতীয় কার্যকারণ-শক্তিঃ সমবেয়াত্, ন কার্যাৎ কারণ বিশেষ ক্বচিত্ অনুমীয়েত। কারণ ব্যাবৃত্ত্যা চ ন তজ্জাতীয়স্যৈব কার্যস্য ব্যবৃত্তির বসীয়েত—এতেন সুক্ষ্ম-জাতীয়মিতি নিরস্তম্। তবহ্নেরপি তত্ সৌক্ষ্ম্যাত্ ধুমোত্পত্ত্যাপত্তেঃ।
—উদয়ন, কুসুমঞ্জলি স্তবক।

[অধুনাকালে গবেষণা দ্বারা আরও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, প্রাচীন ইজিপ্ট এবং প্রাচ্যের প্রাচীন দেশসমূহ জুয়েলারগণ ওয়াটার ফ্লাস্ক্ (Water Flask) ক্ষুদ্র দ্রব্যকে বৃহদ্রূপে দেখিবার জন্য ব্যবহার করিতেন।]

উপরোক্ত রূপ কোন যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও, শল্য-যন্ত্র সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সুচারুরূপে জীবদেহ কর্তনের রীতি প্রাচীন হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। প্রাচীন যুগীয় শব-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

এই সম্পর্কে আয়ুর্বেদোক্ত, সূত্রস্থান, ৩৭-সুশ্রুত সংহিতার (১০০-২০০ খ্রীঃ) একটি শ্লোকের তর্জমা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

তাৎপর্য্য ঃ—"উৎকর্তন (উর্ধ্বকর্তন) ও পরিকর্তন (অধ-চ্ছেদ) উপদেশ দিবে। দৃতি (চর্মপুটক) মৃতপশুর বস্তি (মূত্রাশয়) প্রবেশক (চর্মথল্লকূট) প্রভৃতিতে জল ও পঙ্ক পুরিয়া তাহাতে শস্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা ভেদন কর্ম অভ্যাস করাইবে। রোমযুক্ত বিস্তৃত চর্মে লেখ্য কর্ম শিখাইবে। মৃত পশুর শিরা ও উৎপল নালে বেধ্য কর্ম শিখাইবে। মৃত পশুর দন্তে আহরণ কর্ম শিখাইবে।"

উপরোক্ত তর্জমা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন যুগে জীবদেহ কর্তন করিয়া 'এ্যানাটমি' এবং 'সার্জারি' শিক্ষার রীতি ছিল। শল্যবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রগণ জীবদেহ কর্তন করিয়া লাভ করিত। অধুনাকালেও মেডিক্যাল কলেজসমূহে অনুরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্তিত আছে। উপরের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত 'উৎকর্তন' শব্দটির ইংরাজি অর্থ 'অপার ইন্‌সিশন্' এবং 'পরিকর্তন' শব্দটির ইংরাজি অর্থ 'লোয়ার ইন্‌সিশন্'। ইহা ছাড়া লেখ্য, বেধ্য প্রভৃতি শল্যতন্ত্র সম্পর্কীয় পরিভাষাও আমরা পাইয়া থাকি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শল্যকার্যের জন্য বংশপাত,

লৌহ, ইস্পাত, কাঁচ, ফটিক প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত অস্ত্র ও যন্ত্রের বর্ণনা আছে। আধুনিক যন্ত্র ও অস্ত্রের ন্যায়ই উহা কার্যকরী ও উপযোগী ছিল। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে ছুরি, কাঁচি, 'ফর্‌সেপ্‌,' 'রেঞ্জ', নিড্‌ল্‌ প্রভৃতি যন্ত্র বিদ্যমান। এই সকল যন্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহাদের কাহারও খিল আছে, কাহারও মুখের একদিকে দাঁত, কাহারও বা মুখের উভয়দিকে দাঁত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সকল যন্ত্রের কয়েকটি বিবিধ জন্তুর মুখদংশ ও বিবিধ পক্ষীর চঞ্চুর অনুকরণে নির্মিত হইত। বর্তমান পুস্তকের পরিশেষে এই সকল যন্ত্রের নামসহ আকৃতি চিত্রে দেখানো হইবে।

এই সম্পর্কে গজায়ুর্বেদ (৪৫০ খ্রীঃ পূঃ) পুস্তক হইতে হস্তীর দেহচ্ছেদ সম্পর্কীয় একটি আখ্যান ভাগ উদ্ধৃত করা হইল। ইহা ঐ যুগের পশু শল্যতন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

"শল্য নিঃসারনোপযোগী নানাবিধ অস্ত্র যথা, সিংহমুখ যন্ত্র, যষ্টি-যন্ত্র, কর্কটক যন্ত্র, দাত্যূহযন্ত্র, গোধমুখযন্ত্র, উভয়পার্শ্বে দন্তবিশিষ্ট মকরক যন্ত্র, শঙ্কু যন্ত্র, একদন্ত যন্ত্র, মুষ্টিযন্ত্র এবং শার্দুল যন্ত্র ইত্যাদি। বিজ্ঞ চিকিৎসক ত্র্যস্রযন্ত্র (ত্রিশির), একদংষ্ট্র, মুষ্টি, শার্দুল, নন্দিমুখ, শঙ্কপার্শ্ব এবং সিংহমুখ (Lion faced) প্রভৃতি যন্ত্র বারণগণের শল্যউদ্ধার কার্যে ব্যবহার করিবেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় অঙ্গুলি কিংবা এষণী (forcep) যন্ত্রের সাহায্যে, শল্য আহরণ করিয়া পরে 'বৃদ্ধিপত্র' (Bigger Knife) নামক শস্ত্র দ্বারা ছেদনপূর্বক নন্দিমুখ প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা শল্য উদ্ধৃত করিবেন। হে পৃথিবীশ্বর! কঙ্কমুখ যন্ত্র দ্বারা প্রায় সকল প্রকার শল্য স্বল্পায়াসে উদ্ধার করা যায়। সিংহমুখ যন্ত্রদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ শল্য উদ্ধার করিবেন। নারাচ ও অর্ধনারাচ এবং সিংহদংষ্ট্রা যন্ত্রদ্বারা এবং মুকুলাগ্র শল্য, মণ্ডুকবক্ত্র

(frog-faced) যন্ত্রদ্বারা উদ্ধার করা বিধেয়। বারণগণের বিশিষ্ট মর্মপ্রদেশে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা নিঃসারিত করিতে যত্ন না করাই বিধেয় ; কারণ তাদৃশ স্থান হইতে শল্য নিঃসারণের ফলে বারণগণের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং যুক্তিবশতঃ প্রসিদ্ধ অভ্যঙ্গ ঔষধ লেপন, ব্রণশোধন প্রভৃতির দ্বারা তাদৃশ শল্য যাপ্য হওয়া আবশ্যক। গ্রীবাসন্ধি, শিরস্নায়ু, ও পার্শ্বদ্বয়ে শল্য বিদ্ধ হইলে, মর্মসমূহ রক্ষা করিয়া তাদৃশ শল্য নিঃসরণ করিবে। ক্ষৌমসূত্রের দ্বারা তাদৃশ ব্রণ (Wound) সীবন (সেলাই) করিয়া পরে ক্ষতরোপনের ঔষধ প্রয়োগ করিবে।"

"হে মহারাজ! অগ্রেই মাতঙ্গগণের ষড়বিধ ছবির (Skin lair) উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথমা ছবি অর্ধযব পরিমিত, দ্বিতীয়া ছবি দ্বি-যব পরিমিত এবং অবশিষ্ট সকল ছবি দ্বি-যব পরিমিত। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 'ব্রীহিমুখ' শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ স্থিরভাবে প্রথমা ছবি ভেদ করিবেন। অনন্তর 'কুশপত্র' বা উৎপলপত্র' নামক শস্ত্র দ্বারা স্থিরভাবে ত্রি-অঙ্গুলি পরিমিত নির্ণয়-পথ করিবেন।"

[উপরের একস্থানে বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে জীব দেহ হইতে শল্য বাহির না করাই ভাল। আশ্চর্যের বিষয় আধুনিক শল্যতন্ত্রিগণও এই একই রূপ মত আজকাল প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে এইরূপ অবস্থায় ঐ শল্যের চতুর্দিকের কোষসমূহ শক্ত হইয়া একটি (cyst) সিষ্ট ফর্ম করিয়া উহাকে একস্থানে রক্ষা করে এবং কালক্রমে ঐ শল্যাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যায়। আধুনিক বৈদ্যগণের মতে ইহাতে জীবদিগের কোনও ক্ষতিই হয় না।]

য়ুরোপে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীকালের মধ্যে এথেনস, মহানগরী এবং আলেকজানড্রিয়াতে সর্বপ্রথম কৌতূহল নিবারণের জন্য

বিবিধ পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ (Vivi-section) করা হইতে থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যবচ্ছেদ কখনও বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাবধানতার সহিত করা হয়নি। ভারতবর্ষে (২০০০—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) যজ্ঞের আহুতির কারণে বিশেষ সাবধানতার সহিত কিরূপে উহাদের প্রতিটি অঙ্গ অভগ্ন ও অছিদ্র অবস্থায় ছেদিত হইত তাহা ইতিপূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম এ্যানিম্যাল এনাটমীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সকল প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ব্যতীত ভূতশাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের জন্য অপ্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ যুগের পূর্বে হিন্দু-মনীষীদিগের বীক্ষাণাগার হিসাবে কোনও এক পৃথক কক্ষ ছিল না, পরন্তু সমুদয় অরণ্যই ছিল অরণ্যাচারী ঋষিদের বীক্ষাণাগার। আরণ্য আশ্রমই ছিল তাহাদের জ্ঞানার্জনের মূল কেন্দ্র। কিন্তু কোনও এক তথ্য তাঁহারা প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনও গ্রহণ করেন নাই। এই সকল প্রমাণ তাঁহারা কিরূপে সংগ্রহ করিতেন তাহা নিম্নের শ্লোক (১৫০ খ্রীঃ পূঃ) হইতে বুঝা যাইবে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণি

—সমাধিপদ,"—সাংখ্য ৭ম অধ্যায়।

উপরোক্ত শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনটি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করিত ; যথা, (১) প্রত্যক্ষ (২) আগম (৩) অনুমান। বিজ্ঞান এবং দর্শন, এই উভয় জ্ঞানই এইরূপ প্রমাণের দ্বারা আর্যগণ অর্জন করিতেন। প্রথমে, 'প্রত্যক্ষপ্রমাণ' কাহাকে বলিত, সেই সম্পর্কে বলিব। ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগের ফলে মনোমধ্যে

তদ্‌বস্তুর যে বোধ জন্মে, তাহাকে বলা হয় 'প্রত্যক্ষপ্রমাণ'। চক্ষু, শ্রোত্রের, স্পর্শ, গন্ধ দ্বারা যাহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারি তাহাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ। শল্য তন্ত্রী ও চিকিৎসকগণ এবং যজ্ঞাদির ঋত্বিকগণ পশুদিগের দেহ ব্যবচ্ছেদের দ্বারা দর্শন-জনিত যে জ্ঞান অর্জন করিতেন তাহাকে 'প্রত্যক্ষপ্রমাণ' বলা হইত। 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ সম্বন্ধে বলিবার পর, এইবার 'আগম' সম্বন্ধে বলিব। বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিবার পর তদ্বাক্য-বোধ্য-পদার্থের দ্বারা কোনও জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে বলা হয় আগম। অর্থাৎ, বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, অরণ্যাচারী ঋষিগণ, বিদ্বান পর্যটকগণ, সমুদ্রগামী নাবিকগণ, এবং তীর্থভ্রমণকারী মনীষী এবং পর্বতাচারী সাধুগণ দূরদূরান্তর হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রাণিদিগের রীতিনীতি সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় যে বিবৃতি দিতেন, তাহা প্রাণিবিদ্যার আলোচকগণ সত্য (আগম) বলিয়া মানিয়া লইতেন। এই 'আগম' ও 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণ, হিন্দুমনীষিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতেন। কারণ এই বিষয়ে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল। এই ভুল ত্রুটিকে তাঁহারা বলিতেন বিপর্যয়। নিম্নের শ্লোকটি পাঠ করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠাম"।
সাংখ্য, সমাধিপদ, ৭ম অধ্যায়।

এই বিপর্যয় নামক ভ্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত, মরু-মরীচিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই বিপর্যয় বা বিকল্প দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা অন্তর্বিকল্প (হ্যালুসিনেসন্) এবং বহির্বিকল্প (ইলিউসন)।

'প্রত্যক্ষ' (প্রমাণ) এবং আগম সম্বন্ধে বলার পর, এইবার

'অনুমান' সম্বন্ধে বলিব। এই 'অনুমানের' উপর নির্ভর করিয়া আর্যগণ বহু দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। ত্রিকালদর্শী ঋষিদের অনুমান শক্তি ছিল অসীম। একটি বা দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর অন্য এক অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি জন্মিলে উহাকে 'অনুমান' বলা হয়। যেমন পর্বতের উপর ধূম নির্গত হইতে দেখিলে নির্ভুল-রূপে বলা যায় যে, ঐখানে আগুন আছে—কারণ, আমরা আগুন হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহা দেখিয়াছি। প্রত্যক্ষরূপে আগুন না দেখা গেলেও ধূম হইতে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান সহজেই করা যায়। ধরা যাউক, কোনও একটি জীবের মধ্যে চারিটি রূপ বা গুণ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে উহার তিনটি মাত্র গুণ দেখা বা জানা গেল; উহার চতুর্থ গুণটি অপ্রত্যক্ষ বিধায় দেখা গেল না। এখানে উহার এই তিনটি গুণের স্বরূপ হইতে উহার চতুর্থ গুণটি কি হইতে পারে তাহা অনুমান দ্বারা জানা যাইতে পারে। *

আর্য ঋষিগণ মৎস্যজীবকে রসবেদী জীব বলিতেন, কিন্তু কিরূপে ইহা তাঁহারা বুঝিলেন? অবলোকন দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন যে, মৎস্যদেহ আঁশ (শল্ক) আবৃত থাকায় স্পর্শ বোধ ইহাদের কম জন্মায়। জলের মধ্যে দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও শ্রোত্রের কার্যকারিতা অত্যল্প। এইবার তাঁহারা অনুমান করিলেন, রসবোধ দ্বারা মৎস্য জীবনযাপন করে। রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ জ্ঞানের স্বল্পতা বা অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া স্বভাবতঃ তাঁহাদের

* ঐরূপ অনুমান দ্বারা যদি একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, দুইটি বা ততোধিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া যায় তাহা হইলে ঐরূপ এক সিদ্ধান্তকে বলা হয় অকাট্য প্রমাণ। অধুনাকালে এইরূপ প্রমাণকে বলা হয় পরিবৈশিক প্রমাণ।

মনে প্রশ্ন জাগিল তাহা হইলে মৎস্য বাঁচে কেমন করিয়া? অনুমান দ্বারা তাঁহারা মৎস্যদেহে রসবোধের প্রাচুর্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। অবশ্য এইরূপও হইতে পারে যে, স্বল্পপরিসর জলে মৎস্য জীবের গতিবিধি ও কার্যকরণ দিনের পর দিন অনুধাবন করিয়া এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উপায়ে গবেষণা করার জন্য প্রাচীন হিন্দুগণ তৎসম্পর্কীয় কয়েকটি পরিভাষাও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহাদের যথাক্রমে বলা হইত, প্রমাণ, সিদ্ধান্ত, তত্ত্ব নির্ণয়, উপপত্তি, কল্পনা (Hypothesis) নির্ণিত (Verified) দৃষ্ট-সিদ্ধি, সম্ভাবনা, লক্ষণম্, ভ্রম, অভ্যাস, আরোপ সংস্কার, সম্প্রয়োগ প্রতিজ্ঞা, হেতু, নিগমন, আগম, প্রত্যক্ষ, উপনয়, উদাহরণ, নির্দেশ, গুরুত্ব, বিলক্ষণ, প্রত্যক্ষ, স্বভাব, ব্যাপ্তি, উৎপত্তি, ইত্যাদি।

হিন্দু সৃষ্টিক্রম—ইভোলিউসন

পৃথিবীর মানুষদের দিনের পর দিন বুঝানো হইয়াছে যে, সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় যা কিছু মতবাদ তাহা য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক য়ুরোপেই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমি তুলনামূলক আলোচনান্তে প্রমাণ করিব যে, ইহা আদপেই সত্য নহে।

প্রথমে এই ইভোলিউসন শব্দটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে সর্বপ্রথম ফরাসী বৈজ্ঞানিক জীন লামার্ক ইহাকে ট্রানসফরমিসম্ (Transformism) নামে অবহিত করিতেন। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চার্চ লায়েল সাহেব সর্বপ্রথম ইভোলিউসন শব্দটির সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে জীবদিগের বিকাশধারা বুঝাইবার জন্য অন্যান্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যাপকভাবে এই ইভোলিয়সন শব্দটি ব্যবহার করিতে থাকেন। অনুরূপভাবে পাতঞ্জল প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণও এই ইভোলিউসন বা ট্রানসফরমিসম্ শব্দটির সম অর্থে 'পরিণাম' শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করিতেন। ('পরিণাম ক্রমনিয়মাৎ' ইত্যাদি, ইতি ব্যাসভাষ্য সূত্র ১৯ পদ-২) পরবর্তীকালীন হিন্দু-পণ্ডিতগণ ইহাকে সৃষ্টিক্রম নামে অবহিত করিতে থাকেন। আধুনিক হিন্দু-পণ্ডিতগণকে এই পরিণাম বা সৃষ্টিক্রম শব্দ দুইটির পরিবর্তে ক্রমবিকাশ শব্দটি ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

য়ুরোপের বাহিরে IONIAN জাতীয় ব্যক্তিদের (৬০০ খ্রীঃ পূঃ) সর্বপ্রথম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখা যায়। "ইহাদের মধ্যে THALES এবং ANAXIMANDER

অন্যতম ছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিই সর্বপ্রথম (৬১১-৫৪৭ খ্রীঃ পূঃ) ABIOGENESIS মতবাদটি প্রচলন করেন। ইহার দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অজীব হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কীয় ভারতীয় মতবাদসমূহ তারিখ ও কালসহ ইতিপূর্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভারতের বাহিরে অগ্রিগেনট্রামের EPEDOCLES (৪৯৫-৪৩৫ খ্রীঃ পূঃ) সর্বপ্রথম আধুনিক সৃষ্টিক্রম মতবাদের অনুযায়ী মতবাদ প্রচলন করিয়াছিলেন। ভারতের বাহিরে তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, পৃথিবীতে উদ্ভিদের পর প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল। [২০০০ খ্রীঃ পূঃ কালে ইহা ঋষি দীর্ঘতমা ভারতে প্রথম প্রচার করেন।] তিনি আরও প্রচার করেন যে, একটি নিকৃষ্ট জীব হইতে একটি উৎকৃষ্ট জীব পর পর পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়।

য়ুরোপীয় মহাদেশে কিন্তু একশত বৎসর পূর্বেও মানুষ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীতে ইভোলিউসন হয় নাই। তৎকালীন ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর সুদূর অতীতে একটি সুদিনে অধুনা দৃষ্ট সমুদয় জীব একত্রে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর বুকের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। য়ুরোপে লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) এবং চার্লস ডারউইন (১৮৫৯ খ্রীঃ) প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের প্রথম আলোচনা করেন।

ভারতের বাহিরে সৃষ্ট ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের কথা বলা হইল। এইবার ভারতবর্ষে সৃষ্ট তৎ তৎ সম্পর্কীয় মতবাদ সম্বন্ধে বলা যাউক। ইভোলিউসন সম্পর্কীয় আধুনিক মতবাদসমূহের অনুরূপ মতবাদ এই দেশে সর্বপ্রথম ঋষি দীর্ঘতমা তাঁহার ঋক্‌বেদোক্ত সূক্তসমূহে (২০০০ খ্রীঃ পূঃ) আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিক্রম মতবাদী পণ্ডিত। এইবার প্রাচীন হিন্দুগণ

প্রবর্তিত সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীতে আমরা বহুপ্রকার জীব দেখিয়া থাকি। এই সকল জীব সমসাময়িক—এইজন্য হিন্দুরা ইহাদের 'সহজন্মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত ঋগ্বেদোক্ত (২০০০ খ্রীঃ পূঃ) শ্লোকটি এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। এই সকল অধুনাদৃষ্ট জীবকে ঈশ্বর একদিনে পৃথিবীর বুকে ছাড়িয়া দেন নাই, এবং ইহাদের একটি হইতে অপরটিও সৃষ্ট হয় নাই। অধুনাদৃষ্ট সব কয়টি জীবই কোনও এক ক্রম-লুপ্ত জীব হইতে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ বানর হইতে মানুষের সৃষ্টি হয় নাই; তবে উভয়েরই পূর্বপুরুষ ছিল কোন এক বানরারূপ ক্রমলুপ্ত জীব। ঋষি দীর্ঘতমার ঋগ্বেদোক্ত (২০০০ খ্রীঃ পূঃ) নিম্নে উদ্ধৃত সূত্রে এই ক্রমলুপ্ত জীবকে আদি মূল বলা হইয়াছে। অধুনাদৃষ্ট একটি জীব হইতে অধুনাদৃষ্ট অপর একটি জীব সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন জীব-গোষ্ঠীসমূহ হইতে বিবিধ বর্তমান জীব-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ একটি নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর জীব হইতে একটি উৎকৃষ্ট-গোষ্ঠীর জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

"সাকম্‌জানম সপ্তমম্ আহুরেকজম্।
সট্ ইৎ যমাঃ ঋষয় দেবজা ইতি॥"
তেষাম্ ইষ্টাণি বিহিতাণি ধামশঃ।
স্থত্রে রেজন্তে বিকৃতাণি রূপশঃ॥

তাৎপর্য্য ঃ—'সহজন্মা'দিগের মধ্যে সপ্তমও সেই আদিমূল হইতে উৎপন্ন। উহারা সকলে 'সহজন্মা' হইলেও এই জীবটির সৃষ্টি সপ্তম, অর্থাৎ পূর্বতন সাতটি জীবের সৃষ্টির পর ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে উহাদের বাসস্থান বিভিন্ন স্থানে নির্ধারিত হওয়ায়

তৎ তৎ স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী উহাদের আকৃতিও বিবিধ প্রকারের হইয়া গিয়াছে।—ঋগ্বেদ।

অর্থাৎ একটি নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর জীব হইতে একটি উৎকৃষ্ট-গোষ্ঠীর জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে এই সম্পর্কে অপর একটি প্রামাণ্য শ্লোক এবং উহার সংস্কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত করা হইল। এই শ্লোকটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তনের কারণে জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য, ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক জীব-বংশ হইতে অপর জীব-বংশের সৃষ্টি হইয়াছে।

"জাত্যন্তর পরিণামং প্রকৃত্য পুরাৎ।

—পাতঞ্জল দর্শনম্, কৈবল্যপাদ, ১৭৭—

তাৎপর্য্য ঃ—প্রকৃতির খেয়ালে এক জাতি হইতে অপর এক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

পাতঞ্জল (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকারগণ শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নের ভাষ্যে প্রদান করিয়াছেন। এই ভাষ্যে ভাষ্যকার সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রকৃতির বিপর্যয়ে এক জাতি হইতে অপর জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকার বুঝাইয়া বলিয়াছেন, 'যেমন তির্যক (চতুষ্পদ পশু) জাতি হইতে অর্বাক (দ্বিপদ নর ও বানরের পূর্বপুরুষ) জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ইহার পর এই অর্বাক জীব হইতে একটি ধারায় বানর এবং অপর এক ধারায় মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত মূল ভাষ্যটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। এই সকল ভাষ্য হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন যে একটি নিকৃষ্ট-জীব হইতে একটি

উৎকৃষ্ট-জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ইহাদের এইরূপ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে বিবিধ কারণে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া।

"অন্যাজাতির্জাত্যন্তরম্ তদ্রূপ পরিণামঃ—
তির্য্যগ্ জাতী পরিণতানাং মনুষ্য জাতিত্বে
সোহয়ং জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যপুরাৎ
কারস্ত হি প্রকৃতি বম্বিতা তদবয়বাণু—
প্রবেশ আপুরঃ ন চ তস্মাগুম্যম্ভবতীতি
শেষঃ; ইত্যাদি।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ সুচারুরূপেই অবগত ছিলেন যে পৃথিবীতে সত্য সত্য ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমি আরও প্রমাণ করিতে পারি যে, কিরূপ পর্যায়ে বিবিধ গোষ্ঠীর প্রাণী পৃথিবীতে পর পর উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন। ইতিপূর্বে 'জনন-বিভাগ' শীর্ষক নিবন্ধে পৃথিবীতে জীবের প্রথমোৎপত্তি সম্পর্কীয় হিন্দু মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে নিম্নের ঋগ্বেদোক্ত (২০০০ খ্রীঃ পূঃ) বিখ্যাত শ্লোকটি হইতে আমার বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

কো দদর্শ প্রথমম্ জায়মানম্।
অস্থন্বন্তম্ যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুঃ অসৃগাত্মা কসিৎ।
কো বিদ্বাংসম্ উপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥

তাৎপর্য্য ঃ—প্রথম উৎপন্ন জীবকে কে দেখিয়াছে? স্থির জীব (উদ্ভিদ) এবং অস্থির জীবে (প্রাণী) তাহারা কখন বিভক্ত হইল?

কোন সময় হইতে ভূমির দ্বারা তাহাদের দেহ পুষ্ট হইতে থাকে। অর্থাৎ তাহারা কখন জল ত্যাগ করিয়া ভূমির উপর আসিয়া বসবাস করিল। বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট কে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

উপরের শ্লোকটি হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুগণের মতে পৃথিবীর প্রথম জীব ছিল 'না প্রাণী না উদ্ভিদ' রূপ এক প্রথম 'জায়মানম' জীব। প্রথমে ইহারা জলে সৃষ্ট হইয়া জলেই বাস করিত। এই প্রথম জায়মানম জীব হইতে পরে পর পর ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথমে উদ্ভিদ এবং উহার পর প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। [নিম্নের ভাগবতোক্ত শ্লোকটিও এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।] ইহার পর এই উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এই উভয়জীবই কালক্রমে পর পর জল হইতে স্থলে উঠিয়া স্থলবাসী হইয়া পড়ে। প্রাচীন হিন্দুদের এই মতবাদটির সমর্থন নিম্নের ভাগবতোক্ত শ্লোকটিতেও পাওয়া যাইবে। এই শ্লোকে সুস্পষ্ট রূপে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ ও তাহার পর প্রাণী সৃষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সৃষ্ট হয় মানুষ।

পশুবৃক্ষাদিভেদেন
জীবা এব-স্বতঃস্থিতা
সংস্থতৌ ব্যতন্ন স্তোবং
মুক্তৌ চ তর্ৎ স্বরূপতা ॥
তত্র স্থাবর মুক্তেভ্যো
বরা জঙ্গমে মুক্তকা,
তেভ্যো মানুষ মুক্তাচ
বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ ॥

প্রাচীনকালীন আর্য ঋষিগণ তাঁহাদের পরিণাম বা সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদ পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস হইতে আরম্ভ করেন;এবং জীবদিগের জন্ম

বৃত্তান্তে আসিয়া উহা তাঁহারা সমাধা করেন। এইজন্য জীবদিগের পরিণামবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্তিত পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁহাদের মতে জড়পদার্থ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব একই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া আমাদের এই বিশ্বে জাত হইতে পারিয়াছে

[কণাদ ঋষি এবং তাঁহার পরমাণু মতবাদের ভাষ্যকারগণ লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে সুচারুরূপে অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র পৃথিবী লক্ষ অণুপরমাণুর পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ প্রবর্তিত নেবুলার থিওরী তাঁহারা স্বীকার করেন নি। বলা-বাহুল্য যে, আজও পর্যন্ত বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে সুদূর অতীতে সূর্য থেকে ছিটকে পড়া বাষ্পখণ্ড জমাট বাঁধিয়া পৃথিবী আদি গ্রহসমূহ সৃষ্ট করিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ বহু বাষ্পখণ্ড সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের কাহারও কাহারও মতে সূর্যেরই একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী সৃষ্টি করে, তাই আজও উহাকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণের মতে কোটি কোটি অণু ও পরমাণু পূর্বে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রথমে দুইটি অণুর সমন্বয়ে দ্ব্যনুক, তিনটি অণুর সমন্বয়ে ত্র্যনুক, চারিটি অণুর সমন্বয়ে চতুরনুক এবং এইভাবে লক্ষ কোটি অণুর সমন্বয়ে ধীরে ধীরে বর্তমান পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইভোলিউশন অর্থে 'পরিণাম' পরিভাষাটি প্রাচীন হিন্দুগণ এই মতবাদ সম্পর্কেই প্রথম সৃষ্টি করেন। কিন্তু য়ুরোপীয়গণ সাধারণভাবে কণাদ গোষ্ঠীর এই মতবাদটি স্বীকার না করিলেও আধুনিক রুশীয় পণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি রাশিয়ান জার্ণালে প্রকাশিত বি-লেভিন এম্ এস-সি লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানাচার্য 'ও শিমদৎ তাঁহার অনুগামী বৈজ্ঞানিক-গণের সহযোগিতায় গবেষণা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কঠিন ও শীতল পদার্থ-কণিকাসমূহের ঘনীভবনের দ্বারাই পৃথিবী ও গ্রহগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। অতীতে কোন এক সময়ে অগণিত এই ধরণের পদার্থ কণিকা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীর মত ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি বিশাল মেঘের সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে কখনও কখনও সেগুলি আরও খণ্ডিত হইত বটে, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই খণ্ডিত না হইয়া সেগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া আয়তনে বর্ধিত হইতে থাকিল। এইভাবে ক্রমাগত নব নব কণিকা আত্মস্থ করিয়া কতকগুলি পদার্থ রূপান্তরিত হইল গ্রহে, গ্রহগুলি সূর্যকে একই দিকে প্রদক্ষিণ করে* অর্থাৎ সেই প্রাথমিক মেঘটি যে দিক হইতে পাক খাইত সেইদিকে]।

কণাদ গোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ এই সম্পর্কে ইহাও বলিয়াছেন যে, জড়-পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবগণও ঐ একই ভাবে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র অণু-জীবদিগের সমষ্টি দ্বারা (একের সহিত অপরটি যুক্ত হইয়া) সৃষ্ট হইয়াছিল, এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে এক কোষ জীবগণ পরস্পরের সহিত পরস্পরে যুক্ত হইয়া বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করে, এবং পরে এই বহুকোষ জীব হইতে সৃষ্ট হয় মৎস্য। এই মৎস্যগোষ্ঠীর জীবদিগের কয়েকটি স্থলে উঠিয়া উভচর জীব ও তাহার পর সরীসৃপের সৃষ্টি করে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়

* সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগণের জন্য যে পথ আছে তাহা অণ্ডাকার এবং সে পথে বিশ্বের বিবিধ গ্রহ ও উপগ্রহ ঘূর্ণায়ন করে বলিয়া হিন্দুগণ উহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলিতেন। এতদ্ব্যতীত পৃথিবী গোলাকার বলিয়া, প্রাচীন হিন্দুগণ উহার ভূমণ্ডল নাম দিয়াছিলেন।

এই যে তাহারা ইহাও অবগত ছিলেন যে পূর্বতন সরীসৃপ জীব হইতে একই সময়ে দুইটি পৃথক ধারায় পক্ষী এবং স্তনপা জীবের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্পর্কে একটি প্রাচীন প্রামাণ্য আখ্যান ভাগ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (২০০-৫০০ খ্রীঃ) অনুসঙ্গপাদ ৬ অধ্যায়, ৫০-৫৭ শ্লোক হইতে উদ্ধৃত করা হইল। পক্ষী এবং স্তনপা জীবগণ একই সময় দুইটি পৃথক ধারায় পূর্বতন সরীসৃপ জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ পৃথিবীর একই ভূস্তরে একত্রে এই উভয় জীবেরই কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

"ঈশ্বর সর্বপ্রথম যে পরমাণুর সৃষ্টি করেন তাহাই তাঁহার প্রথম সৃষ্টি, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। তাহার পর ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবের সৃষ্টি করেন। তাহার পর পক্ষী ও পশুকুলের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর দেব ও মানবগণের সৃষ্টি হয়।"

[এইরূপ বহু শ্লোক ও উহাদের ভাষ্য হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবীতে যখন প্রথম পরমাণু-জীব (One celled) সৃষ্টি হয় তখন সেইখানে ছিল শুধু জল। ইহার পর জল মধ্যে ঐ প্রথম 'জয়মানম্' পরমাণু-জীব হইতে উদ্ভিদ সৃষ্টি হইলে (অক্সিজেন সৃষ্টির সহিত ?) প্রকৃত রূপ বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট হইতে থাকে। অর্থাৎ হিন্দুদের মতে প্রথমে সৃষ্ট হয় ভূমি জল ইত্যাদি তাহার পর সৃষ্ট হয় 'প্রথম 'জয়মানব' জীব এবং তাহার পর সৃষ্ট হয় বায়ু।]

প্রাণীদিগের এইরূপ বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ হইতে যে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এই সত্য সম্পর্কেও প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ অবগত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন্ জীব-বংশটি প্রথমে এবং কোন্ জীব-বংশটি পরে সৃষ্ট হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধেও তাঁহাদের একটি নির্ভুল ধারণা ছিল। এই সম্পর্কে বহু প্রাচীন শ্লোক বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সন্নিবেশিত

আছে। বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য নিম্নে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে মাত্র চারিটি অনুরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে গরুড়পুরাণ দশম শতাব্দাতে এবং বিষ্ণুপুরাণ ১০০-৪০০ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত হয়।

"চতুরশীতি, লক্ষাণি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
এক বিংশতি লক্ষাণি হ্যণ্ডজা পরিকীর্ত্তিতা।
স্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তৎ প্রমাণতঃ॥
জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যন্থাশ্চ জন্তবঃ।
সর্বেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং সুদুর্লভম্॥

গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায়।

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চ চতুর্লক্ষাণি মানুবাঃ।
সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

নিবন্ধধৃত বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

স্থাবরা ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজ-নবলক্ষকঃ।
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষীণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

—কর্মবিপাক

স্থাবরং বিংশতে লক্ষং জলজং নবলক্ষম্।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষশ্চ দশলক্ষশ্চ পক্ষীণাঃ
ত্রিংশ লক্ষং পশুনাঞ্চ চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ
ততো মনুষ্যত্বাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

উপরের শ্লোক চারিটিতে একটি জীব হইতে অপর জীব সৃষ্ট হইতে (বিভিন্ন মতানুযায়ী) আনুমানিক কত লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। শ্লোক কয়টিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রথমে জলজ জীবের সৃষ্টি হয়, তাহার পর জলজ জীব ডাঙায় উঠিয়া স্থলজ জীব হয়; এই শ্লোক হইতে আরও বুঝা যায় যে, অস্থিক মৎস্য জীবের সহিত বহু নিরস্থিক জলজ জীবও একত্রে স্থলে উঠিয়া বিভিন্ন প্রকার আধুনিক অস্থিক ও নিরস্থিক স্থলজ (বিভিন্ন ধারায়) জীবের সৃষ্টি করে। এই সব শ্লোকে 'পরিকীর্তিতা' এবং 'তথৈবোক্তা' বাক্য দুইটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। এই বাক্য দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, শ্লোকে উল্লিখিত তথ্য বা সত্য তৎকালে প্রচারিত কোনও এক সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় পুস্তক বা মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই শ্লোক কয়টিতে 'কৃমি' বলিতে কৃমি পর্বের অর্থাৎ কৃমি পর্যন্ত যাবতীয় নিরস্থিক জীব এবং 'কূর্ম' বলিতে কূর্মপর্বের যাবতীয় অস্থিক জীব অর্থাৎ কূর্ম পর্যন্ত সমুদয় সরীসৃপ জীবদিগকে বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত শ্লোক কয়টিতে পশু শব্দ দ্বারা স্পষ্টতর চতুষ্পদ তির্যক জীবদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

উপরের শ্লোক কয়টি হইতে মোটামুটিভাবে বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুদের মতে জলজ জীব হইতে স্থলজ জীবের সৃষ্টি হইতে কুড়ি লক্ষ

বৎসর, সরীসৃপ হইতে পক্ষী সৃষ্টি দশ লক্ষ বৎসর এবং উহা হইতে বিবিধ পশু (স্তনপা) সৃষ্টি হইতে ত্রিশ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই পশু জীব হইতে বানরের সৃষ্টি হইতে চারি লক্ষ এবং বানরাকৃতি জীব হইতে (উহাদের কর্মানুযায়ী)* মানুষ সৃষ্টি হইতে আরও চারি লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল।

[এই সকল পৌরাণিক হিন্দু পণ্ডিতদের ন্যায় য়ুরোপীয় পণ্ডিত HAECKEL বিবিধ জীবের উৎপত্তির সময় সম্বন্ধে অনুরূপ কয়েকটি কাল সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝাইবার সুবিধার জন্য ১২৫০ মিলিয়ন বৎসরকে একত্রে একটি কসমিক দিবস (cosmic day) রূপে অবহিত করিয়াছিলেন। কয়েকজন মধ্যযুগের হিন্দু পণ্ডিতও অনুরূপভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে ব্রহ্মার একদিন অর্থে মানুষের পৃথিবীর এক অযুত বৎসর।]

য়ুরোপীয়দের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুগণও এ্যাসট্রনমির সাহায্যে এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বলা হইল। এইবার য়ুরোপীয়গণ প্রবর্তিত অনুরূপ কাল নির্ণয় সম্পর্কে বলা যাউক।

বর্তমানকালীন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ-সমূহের উপর নির্ভর করিয়া বিবিধ জীবের উৎপত্তি সম্পর্কীয় যে সময়ের হিসাব দিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ প্রদত্ত সময়ের খুব বেশী অমিল আছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপীয়দের মতে অনাস্থিকা জীব হইতে মৎস্য উৎপন্ন হইতে ৪০০ মিলিয়ন বৎসর, মৎস্য হইতে উভচর জীবের সৃষ্টি হইতে ৩৩০ মিলিয়ন বৎসর, উভচর জীব হইতে

* এই কর্মানুযায়ী শব্দটি দ্বারা আমরা উহাদের অভ্যাস বা জীবনপ্রথা বুঝিব।

সরীসৃপ সৃষ্টি হইতে ১২৫ মিলিয়ন বৎসর, সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হইতে ৫০ মিলিয়ন বৎসর, স্তন্যপায়ী হইতে বানর সৃষ্টি হইতে ১০০ মিলিয়ন বৎসর এবং বানর জাতীয় জীব হইতে মানুষ সৃষ্টি হইতে প্রায় ১০ মিলিয়ন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এক সুপ্রাচীন মতবাদ আছে যে, ঈশ্বর যিনি সর্বভূতে বিদ্যমান * তিনি প্রথমে মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার পর তিনি কূর্ম [সরীসৃপ, কুম্ভীর, সর্প, টিকটিকি প্রভৃতি এই কূর্মপর্বের অন্তর্গত এক একটি জীব। কূর্ম হইতেছে এই 'কূর্মপর্বের শেষোদ্ভব জীব এই কারণে উহাদের কূর্মপর্বের জীব বলা হয়।] জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে মৎস্য জীব পরে কূর্মপর্বের জীবে [সরীসৃপ জীবে] রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই কূর্মপর্বীয় জীবের জন্মের পর হিন্দুদের মতে ঈশ্বর 'বরাহ' রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইখানেও এই 'বরাহ জীব' দ্বারা আমরা 'বরাহপর্বের' অন্তর্গত যাবতীয় জীবের পূর্বপুরুষ বুঝিব। যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবগণ এই—বরাহ পর্বের অন্তর্গত এক একটি জীব। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে সরীসৃপ জীব হইতে স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত এই পৌরাণিক অবতারবাদ বিবর্তনবাদ সম্পর্কীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমি মনে করি।

* যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

* নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমঃ নমঃ॥

—চণ্ডী

প্রাণীদিগের মানসিক শ্রেণী বিভাগ বুঝাইবার সময় আমরা দেখাইয়াছি যে প্রথমে স্পর্শবেদী জীব, তাহার পর রসবেদী জীব, তাহার পর গন্ধবেদী জীব, তাহার পর শব্দবেদী জীব, তাহার পর রূপবেদী এবং তাহার পর কর্মবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমরা ইতিপূর্বে প্রাণীদিগের যৌন-বিভাগ নিবন্ধেও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যৌন-বিভাগ সম্পর্কীয় বিবিধ শ্লোক হইতে বুঝা গিয়াছে যে, স্বেদজ জীব হইতে অণ্ডজ জীব, অণ্ডজ জীব হইতে জরায়ুজ জীব এবং জরায়ুজ জীব হইতে উহার অন্তর্গত অপরাপর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণ পরিকল্পিত সৃষ্টিক্রম অনুযায়ী একটি ক্রমবিকাশ বৃক্ষের চিত্র প্রদর্শিত হইল। (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) মানসিক এবং যৌন-বিভাগে উল্লিখিত জীববংশসমূহ একত্রিত করিয়া এই হিন্দু ক্রমবিকাশ বৃক্ষটি (Evolution Tree) পরিকল্পিত হইয়াছে। এই ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হইতে হিন্দু মতানুযায়ী জীবদিগের বিকাশধারা সম্যকরূপে বোধগম্য হইবে। তুলনামূলকভাবে আলোচনার জন্য য়ুরোপীয় মতানুযায়ী অপর আর একটি ক্রমবিকাশ বৃক্ষও পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

[হিন্দুমতানুযায়ী ক্রমবিকাশ বৃক্ষে প্রদর্শিত 'স্পর্শবেদী স্বেদজ' জীব বলিতে আমরা অযৌনজ নিরস্থিক জীবদিগকে বুঝিব ; যথা, 'আমিবা' প্রভৃতি এককোষ জীব, 'সিলেণ্টেট্রা,' 'পরিফেরা', প্রভৃতি বহুকোষ জীব, ইত্যাদি। 'স্পর্শবেদী অণ্ডজ' বলিতে আমরা যৌনজ নিরস্থিক জীবদিগকে বুঝিব ; যথা, গলদা, চিংড়ী ইত্যাদি জীব। রসবেদী অণ্ডজ বলিতে আমরা মৎস্য জীবদিগকে বুঝিব। 'গন্ধবেদী অণ্ডজ' জীব বলিতে আমরা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জীব যাহারা মূলতঃ গন্ধবোধ দ্বারা জীবনধারণ করে তাহাদের বুঝিব। শব্দবেদী অণ্ডজ বলিতে আমরা যাবতীয় সরীসৃপ জীবদিগকে বুঝিয়া থাকি ; যথা, কুম্ভীর, কূর্ম, টিকটিকি, সর্প ইত্যাদি।

কর্মবেদী
জরায়ুজ
রূপবেদী
অণ্ডজ
শব্দবেদী
অণ্ডজ
গন্ধবেদী
অণ্ডজ
রসবেদী
অণ্ডজ
স্পর্শবেদী
অণ্ডজ
স্পর্শবেদী
স্বেদজ

নর
একশফ
দ্বিশফ
চতুর্শফ
পঞ্চশফ
ত্রিশফ
চতুর্নখ
বানর
পঞ্চনখ
অর্বাক
শফক্রীব
নখক্রীব
তীর্যক
উভতোদন্ত

একতোদন্ত
অদন্ত
দন্ত

কর্ষবেদী
জরায়ুজ
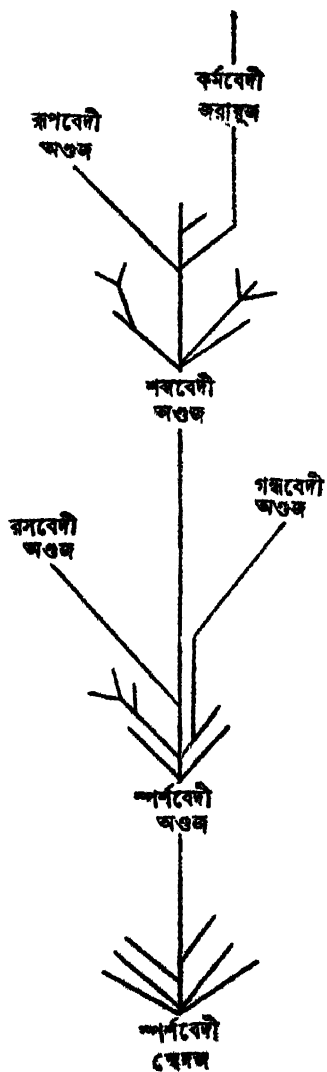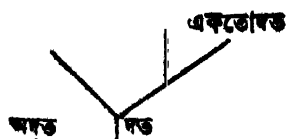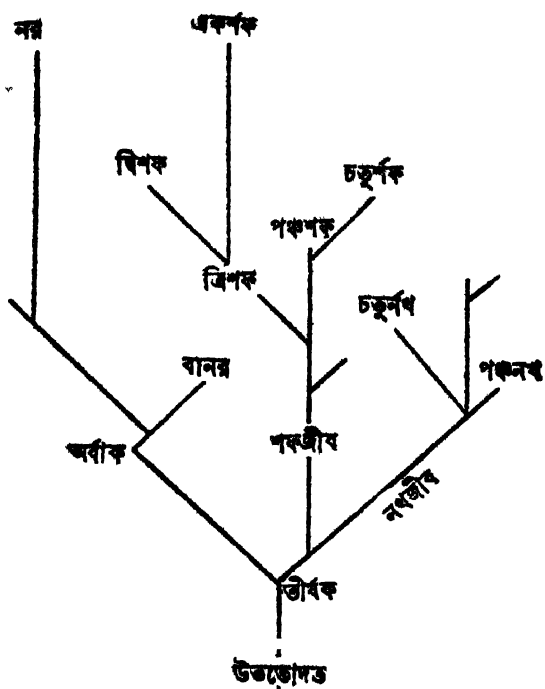
রূপবেদী অণ্ডজ' জীব বলিতে আমরা একমাত্র 'লোমপক্ষপক্ষী' জীবদিগকে বুঝিব এবং 'কর্মবেদী জরায়ুজ' জীব বলিতে আমরা যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবদিগকে বুঝিব।]

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিকাশ মতামতসমূহ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাউক। খুব সম্ভবতঃ চতুর্থ আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থ আশ্রমে জীবন অতিবাহিত করার সময়ই তাঁহারা এই সকল আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেন। তবে এ কথা ঠিক যে দর্শনপ্রাণ প্রাচীন হিন্দুগণ দর্শন আলোচনা কালেই এই সকল মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কীয় আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম সৃষ্টিতত্ত্বের প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে বৈদিক হিন্দুগণ সেই সুদূর অতীতেও কত বেশী চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ঋগ্বেদোক্ত (খ্রীঃ পূঃ ২০০০) ১০।১২৯।১-৭ শ্লোকটি হইতে বুঝা যাইবে।

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, তখন আলোক দ্বারা আলোক আবৃত ছিল এবং রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না; কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ু ব্যতিরেকে আত্মা অবলম্বনে জীবিত ছিলেন। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও চতুর্দিকে জলমগ্ন ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধির দ্বারা

আপন হৃদয় পর্য্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন। রেতধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। উহাদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্ধ্বদিকে রহিলেন। কেহই বা প্রকৃত জানে? কেহই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা কি এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন? কোথা হইতে কি যে হইল তাহা কেহই বা জানে?"

প্রাচীন হিন্দুগণ সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে যে প্রগাঢ়ভাবে আলোচনা করিতেন তাহার অপর প্রমাণ আমরা পাই ভাগবতোক্ত কয়েকটি শ্লোকে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাগবতের শ্লোকটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুগণ তাঁহাদের সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় জ্ঞান তাঁহাদের সৃষ্ট ভ্রূণশাস্ত্র হইতেই মূলতঃ লাভ করিয়াছিলেন। এই ভ্রূণশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত ভাগবতোক্ত শ্লোক ও উহাদের প্রাচীন টীকাসমূহ হইতে তাহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হইবে।

'তাস্ববাৎসীৎ স্ব-সৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসকাল।
তেন নারায়ণ নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥
একো নানাত্বমাব্বিচ্ছন্ন যোগতল্পাৎ সমুত্থিত।
বীর্য্যং হিরন্ময়ং দেবো মায়য়া বসৃজৎ ত্রিধা॥
য একধা ভবতি ত্রিধ ভবতি পঞ্চধা
সপ্তধা নবধা চৈব পুণশ্চৈকদশাস্মৃত
শতঞ্চ দশচিকশ্চ সহস্রানি বিংশতি॥

অনুপ্রাপ্তিয়ং প্রাণাঃ প্রানস্তং সর্ব্বজন্তুষু।
আপনগুমপনাস্তি নর দেবমিবানগা ॥
পিপাসতো ভক্ষতশ্চ প্রমুখং নিরভিদ্যতে।
মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজয়তে।
নাসিকে নিরভিদ্যেবাং দোধুয়তি ন ভস্বাতি।
তত্র বায়ুগন্ধবহো ঘ্রানোণাসি জিঘৃক্ষতঃ।
যদাত্মানি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে অক্ষিণী তস্য জ্যোতীশ্চক্ষুগুণগ্রহঃ ॥
গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞ স্বয়ং হব্যং কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥
হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদ্বানমুভয়াশ্রোম্ ॥

তাৎপর্য ঃ—প্রাণসত্তা সেই জলরাশির মধ্যে (নীর অর্থে জল) হিরণ্ময় বীজরূপে উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষায় সহস্র সহস্র বৎসর কাল বাস করিতে লাগিলেন। উহার পর সেই মহা বীজ উহার দেহে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে অবস্থিত দেখিয়া সন্ততি সৃষ্টির জন্য তত্তৎ স্বাংশাদি জীবকুলকে নিজের নিকট হইতে বিভক্ত বা পৃথক করিবার জন্য দেবতা তীর্যকাদি (তীর্যকজীব প্রভৃতি) বহুরূপে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া যোগ-নিদ্রা স্থান অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা (Dorment) হইতে উত্থিত বা জাগ্রত হইয়া ঐ হিরণ্ময় বীর্যকে স্বশক্তি দ্বারা বিভক্ত করিলেন। ইহার পর উহা বারে বারে (এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, একাদশ, শত, সহস্র) বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র ব্যষ্টি জীবে বা ব্যষ্টি প্রাণে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই ব্যষ্টি প্রাণ একত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকায় উহারা তাহাদের পৃথক সত্তা

হাঁরাইয়া ফেলিয়া মুখ্য জীবে পরিণত হয়। ইহার ফলে অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগমন করে সেইরূপ জীব দেহবর্তী ব্যষ্টি প্রাণসমূহও মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিশ্চেষ্ট হইলে উহারাও চেষ্টা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এই অবস্থায় মুখ্য প্রাণের মৃত্যু ঘটিলে উহার অন্তর্গত ব্যষ্টি প্রাণসমূহেরও মৃত্যু ঘটে। ইহার পর তিনি পান-ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রথমে তাহার মুখ বিভক্ত হইল। অনন্তর মুখ হইতে তালু ভিন্ন হইল। সেই তালুতে পরে জিহ্বার উৎপত্তিও হইয়াছিল। ইহার পর উহার অংশ বিশেষ বিভিন্ন হইয়া বায়ুবাহী গন্ধ-গ্রহণের প্রয়োজনে নাসা ও পরে দর্শনের প্রয়োজনে চক্ষুর আবির্ভাব হইল। ইহার পর উহা ইচ্ছানুরূপ ভ্রমণ ক্রিয়াকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার চরণ যুগল ও নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিতে অভিলাষী হইলে হস্তদ্বয় তাহার দেহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছিল।

উপরোক্ত সৃষ্টি পর্যায় পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে যে, ঐ সকল জ্ঞান প্রাচীন হিন্দু মনীষিগণ তাঁহাদের ভ্রূণ শাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞান হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পরে আমরা বিশদরূপে আলোচনা করিব।

[এই নিবন্ধটির আলোচ্য বিষয় হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে প্রাচীন ভারতীয়গণ জীব সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতদের স্থায়ই ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।]

সৃষ্টিক্রম মতবাদ—হিন্দুদের

পূর্বতন প্রবন্ধে জীবের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে হিন্দুগণ যে অবহিত ছিলেন তাহা বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁহাদের মতবাদ আমরা আলোচনা করিব। নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিভিন্ন জীব-দিগের সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শ্লোকটি পাতঞ্জল (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদানুগ্রহত সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥

তাৎপর্য্য ঃ—দ্রব্য, কর্ম, কাল ও স্বভাব, এই লইয়াই জীব। ইহারা অনুগ্রহ করিলেই জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাদের অনুগ্রহ না হইলে হয় না। দ্রব্য অর্থে এই স্থানে ভূমি বা বাসস্থান বুঝিয়াছি।

উপরের এই শ্লোকটি হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, প্রাচীন হিন্দুদের মতে বাসভূমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, বায়বিক পরিবর্তন এবং জীবদিগের স্বকীয় বা বংশগত প্রচেষ্টা প্রভৃতির কারণে একটি জীব হইতে অপর একটি জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। অধুনাতম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও জীবগণের ক্রমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে হুবহু অনুরূপ মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। শ্বেতাশ্বর উপনিষদ, ১-৩ (১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) গ্রন্থে এই সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, কাল বা যুগ (Ages), স্বভাব (Habit), নিয়তি বা বিপর্যয় এবং সর্বোপরি ইচ্ছা (Will) বিবিধ জীবের উৎপত্তির একমাত্র কারণ।

এই শ্লোকের প্রথমাংশে প্রশ্ন করা হইয়াছে, কিরূপে ও কেন, এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে এবং পৃথিবীতে দৃষ্ট বিবিধ জীবের সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল। উহার শেষোক্ত ছত্র দুইটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহা একমাত্র উপনিষদকারের স্বমত নয়। তাঁহাদের পূর্বতন বা সমসাময়িক কবিগণও (গ্রন্থকার) এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। শেষোক্ত দুইটি ছত্রে বলা হইয়াছে যে, কোনো কোনো কবি বলেন, কাল বা সময় জীব সৃষ্টির কারণ ; কিন্তু অন্যান্য কবিগণ বলেন জীবের স্বভাব Habit ইহার কারণ। এই মত দুইটির উল্লেখ করিয়া উপনিষদকার এই একই শ্লোকে আপন অভিমত স্বরূপ বলিযাছেন যে জীবের ('ভূতঃ যোনিঃ' বা species) সৃষ্টির কারণ চারটি। যথা :—(১) কাল বা সময় (২) স্বভাব বা Habit, (৩) নিয়তি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং (৪) ইচ্ছা বা Will। এই শেষোক্ত কারণ 'ইচ্ছার' সহিত চিন্তার কথাও বলা হইয়াছে। নিম্নে এই শ্লোকটির কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল। শ্লোকটির রচনাকাল ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব বলিয়া জানা গিয়াছে।

কি কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ।
জীবম্ কেন ক চ সম্প্রতিষ্টিতাঃ।
অধিষ্টিতা কেন সুখতরেষু।
বার্তামাহে ব্রহ্মবিত্থা ব্যবস্থাম ॥
কাল স্বভাবো নিয়তি যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।

* * * * *

স্বভাবমেক কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্তে পরিমুহ্যমানা ॥

দার্শনিক পাতঞ্জল ঋষি এবং উপনিষদকারগণ প্রচারিত মতবাদ দুইটি একত্রে পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন যে দ্রব্য বা ভূমি, কর্ম, কাল বা যুগ, স্বভাব, নিয়তি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ইচ্ছা বা চিন্তার দ্বারা পৃথিবীতে বিবিধ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণকারগণও পূর্ব বর্ণিত বহু শ্লোকে বলিয়াছেন যে, একটি নিকৃষ্ট জীব-গোষ্ঠী হইতে একটি উৎকৃষ্ট জীব-গোষ্ঠী তাহাদের কর্মানুযায়ী (কর্মাণি সাধয়েৎ, ইতি বিষ্ণুপুরাণ) সৃষ্ট হইয়াছে।

উপরোক্ত আখ্যান ভাগের সত্যতা সম্বন্ধে এইবার আমরা আলোচনা করিব। পৃথিবীতে এক এক যুগে এক এক প্রকার নৈসর্গিক বিপ্লব দেখা গিয়াছে। বায়বিক এবং অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে যেখানে জল ছিল সেখানে স্থল হইয়া গিয়াছে। কখনও বা ঘন বনানী সরিয়া গিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। নৈসর্গিক এবং বায়বিক বিপ্লবের (নিয়তি) ফলে কেহ গর্তে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বনে, কেহ জলে, কেহ স্থলে, কেহ বা বৃক্ষ-শাখায় আশ্রয় লইয়াছে। বাসস্থানের পরিবর্তনের কারণে জীবগণও তাঁহাদের পূর্বস্বভাবের পরিবর্তন ঘটাইয়া নিজেদের দেহাবয়ব নূতন বাসস্থানের উপযোগী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বংশ-পরম্পরায় ঐরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা কয়েক বা বহুপুরুষ পর তাহাদের দেহাকৃতিও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই সম্পর্কে ঋষি দীর্ঘতমা (২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব) ঋগ্বেদের ১-১৬৪।১৫ সূত্রে জানাইয়া দিয়াছেন যে বাসস্থানের বিভিন্নতা হেতু জীবদিগের আকৃতিও বিভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছে। নিম্নে ঋগ্বেদোক্ত সমগ্র শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইল।

সাকমৃজানম্ সপ্তমম্ আহুরেকজম্।

* * * *

তেষাম্ ইষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ।
স্থত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥

বলা বাহুল্য যে, হিন্দু ঋষিগণ বর্তমান ক্রমবিকাশ মতবাদের মূল কথাই উপরোক্ত শ্লোক-কয়টিতে বলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে জিরাফ একদা ছাগলাকৃতি ছিল। কোনও নৈসর্গিক কারণে বৃক্ষাদি ধীরে ধীরে উচ্চতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ঐ সকল জীবরা পুরুষানুক্রমের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তাহাদের গলদেশ বাড়াইতে থাকে। তাঁহাদের মতে অনুরূপ কারণে হস্তী জীবকেও ধীরে ধীরে তাহাদের নাসিকাটি লম্বা করিয়া শুঁড়ে পরিণত করিতে হয়। অনুরূপভাবে মরুবাসী উষ্ট্রজীবকুল বহুপুরুষের চেষ্টায় বায়ুতাড়িত বালুকণা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের গলদেশ বহু উচ্চে উঠাইয়া লইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কীটাদির গাত্রবর্ণ ও পাখার রঙ, ব্যাঘ্রের গাত্রের ডোরা, বিবিধ প্রাণীর রূপচ্ছটা ইত্যাদিও উহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী সৃষ্ট হইয়াছে। যেরূপ স্থানে যে-প্রাণী বাস করে তাহার ত্বক ও বর্ণও তদনুযায়ী সৃষ্ট হয়। কমবেশী রৌদ্রতাপ এবং আলোছায়ার তারতম্যও জীবদিগের গাত্রবর্ণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই সকল কারণে মরুবাসী জীবের রঙ ধূসর এবং মেরুবাসী জীবের রঙ শ্বেত দেখা যায়।

উপরোক্ত আখ্যানভাগ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাসস্থানের বিভিন্নতা হেতু তাপের পরিবর্তনের জন্য প্রাণীদিগের গাত্রবর্ণ এবং ভূমি ও খাদ্যের পরিবর্তনের জন্য উহাদের দেহাকৃতি বিভিন্ন হইয়া যায়। নূতন বাসস্থান ও আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবগণ তাহাদের স্বভাবেরও আমূল পরিবর্তন সাধন করে এবং ঐরূপ স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করার ফলে পৃথিবীতে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু জীবদেহের এই

পরিবর্তন ধীরে ধীরে বহু পুরুষের চেষ্টায় সমাধা হয়। এক পুরুষের চেষ্টা-লব্ধ সামান্য পরিবর্তন নিশ্চয় তাহাদের কাজে লাগেনি। স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য (acquired character) বংশগত (inherited) হইলে অবশ্য ইহার মূল্য আছে। এই ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের চেষ্টায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় পুরুষ উত্তরাধিকারীসূত্রে অর্জন করিয়া উহা অনুরূপ অভ্যাস ও প্রচেষ্টার দ্বারা তাহারা বাড়াইয়া লইতে পারে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে প্রচেষ্টার দ্বারা জীবদেহের একদিন আমূল পরিবর্তন ঘটান সম্ভব।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বা acquired character বংশগত হয় কিনা। হিন্দু মনীষিগণের মতে সকল ক্ষেত্রে না হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই বংশগত হয়। বংশানুক্রম শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির মতে কোনও কারণে যদি দম্পতি কর্তৃক স্বকীয় জীবনে অর্জিত স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য বীজ-সারকে প্রভাবান্বিত করে তাহা হইলে এক পুরুষের অর্জিত দোষ বা গুণ পরবর্তী পুরুষে নিশ্চিতরূপে অর্পিত হইবে। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রামাণ্য শ্লোক সম্বন্ধে হিন্দু বীজ-বিজ্ঞান ও বংশানুক্রম শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই বিশেষ মতবাদটি বহু বাদানুবাদের পর স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কি কারণে ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে তাঁহারা এখনও আসেন নাই। হিন্দু ঋষিদিগের মতে চিন্তা বা ইচ্ছার দ্বারা যে স্নায়বিক ও তৎসংশ্লিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়া জন্মে তাহার দ্বারাই ('হরমন সৃষ্টির দ্বারা' ?) ঐরূপ অঘটন ঘটিতে পারে। পাতঞ্জল ঋষির (দ্বিতীয় শতাব্দী) মতে এই চিন্তা দুই প্রকার, "ক্লিষ্টাক্লিষ্ট" অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা unpleasant এবং অক্লিষ্ট বা pleasant। জৈন পণ্ডিত

উমাস্বতি (৭৫ খ্রীঃ) এই ক্লিষ্টাক্লিষ্ট শব্দ দুইটির পরিবর্তে প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দু ঋষিগণের মতে চিন্তা ও ইচ্ছা যে প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ-সারকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহা তাঁহারা উপনিষদগ্রন্থে (যদৃচ্ছা, চিন্তা) সুস্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল ঋষি উক্ত "যাদৃশ ভাবনা যস্ত" ইত্যাদি উক্তিও এই মতবাদের সমর্থক। চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি পাঠেও জানা যায় যে, স্নায়ু সম্বন্ধীয় ব্যাধি স্নায়ুর মাধ্যমে বীজ-সারকে প্রভাবান্বিত করিয়া বংশগত হইতে পারে।

নূতন বাসভূমিতে আসিয়া পড়ায় জীবগণের বহুবিধ অসুবিধা ঘটে এবং এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে তাহাদের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। আর্যঋষিগণের মতে স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা গলদেশ উচ্চ করায় জিরাফ জীবের গলদেশ যৎসামান্য লম্বা হইতে পারে কিন্তু উহা বংশগত হয়, বহু পুরুষ যাবৎ "তাহাদের গলদেশ লম্বা হউক" এইরূপ চিন্তা বা ইচ্ছা নিয়ত মনে আনার জন্য। বলা বাহুল্য, অসুবিধা ঘটার জন্যই এইরূপ ইচ্ছা বা চিন্তা জীবের মনে স্থান পাইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ইচ্ছা একপুরুষ করিলেই হইবে না, বহু পুরুষ এইরূপ ইচ্ছা (প্রচেষ্টা সহ) করিলে তবে জীবের বীজ-সার প্রভাবান্বিত হইবে।

এক্ষণে এই হিন্দুমতটির মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য যে, ইচ্ছাবৃত্তির শক্তি অসীম। য়ুরোপে এই সম্বন্ধে ভেক লইয়া বহু পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, খাদ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত তাহাদের পাকস্থলীর রস-পিণ্ড হইতে রস নির্গত করিয়া থাকে। জীবদিগের ইচ্ছার দ্বারা কোনও জানা বা অজানা রস-পিণ্ডের রস নির্গত হওয়া সম্ভব। স্নায়ুর মাধ্যমে এই রস বা Hormone ইত্যাদির দ্বারাই বীজ-

কোষ প্রভাবান্বিত হয় বলিয়া মনে করা যেতে পারে। বীজ-সার স্নায়ুর শক্তির দ্বারাই প্রভাবান্বিত হোক কিংবা উহা রস বা Hormone দ্বারাই প্রভাবান্বিত হোক, এই উভয়বিধ কারণের মূলে আছে জীবদিগের অনুভূতি এবং ইচ্ছা। এইজন্য আর্যঋষিগণ অনুভূতি এবং ইচ্ছাকেও অপরাপর কারণের সহিত জীবসৃষ্টির অন্যতম কারণ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

জীবদিগের এই ইচ্ছা যে বংশগত হয় এবং তদনুযায়ী অঙ্গবিশেষের বর্ধন ঘটিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারতীয় যুদ্ধবিদ মোরগের (Indian fighter) জন্ম। মাত্র পাঁচ বা ছয় শতাব্দীর চেষ্টায় সাধারণ মোরগ হইতে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা সাধারণ মোরগকে দেখিবামাত্র রাগে ফুলিতে ফুলিতে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত স্বজাতীয় মোরগের সহিত যুদ্ধরত থাকে। যুদ্ধের সুবিধার জন্য ইহাদের পায়ের পশ্চাদ্দেশের কণ্টক সাধারণ মোরগ অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ় ও বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। অথচ সাধারণভাবে জীবন ধারণের জন্য উহার প্রয়োজন একেবারেই নাই। কয়েকশত বৎসর পূর্বে সাধারণ মোরগের কয়েকটিকে বাছিয়া লইয়া পুরুষানুক্রমে তাহাদের "মোরগের লড়াই"-এ নিযুক্ত রাখার ফলে তাহাদের এই অপাঙ্গটির এইরূপ বর্ধন ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরুষানুক্রমে তাহাদের লড়াই করার ইচ্ছাও বহুগুণে বর্ধিত হইয়া আজ উহা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই মোরগসকল বাছিবার সময় তাহাদের লড়াই করার ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল, তাহাদের পায়ের কণ্টকের আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের কখনো বাছা হয় নাই। অথচ যুদ্ধ-ইচ্ছার সহিত উহার উপকরণ ঐ কণ্টকও তাহারা বংশানুক্রমে বর্ধিত করিয়া লইয়াছে।

[এই সকল মোরগ পূর্বকালে বংশানুক্রমে নবাব বাদশাহ উমরাহ ও

অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। কারণ মোরগের লড়াই দেখা ছিল তাহাদের একটি বিশেষ প্রমোদ। এক্ষণে উহাদের মাত্র মহীশূর সহরে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এইরূপ এক মোরগকে বঙ্গীয় ভেটারনরি কলেজে আনিয়া উহাকে সাবধানে লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হইয়াছে।]

উপরের তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, জীবের সুবিধা ও অসুবিধা হইতে ইচ্ছা বা কামনা আসে এবং এই কামনার কারণে উহাদের মধ্যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই অভ্যাসজনিত বিবিধ কর্ম তাহাদের দেহ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করিয়া দেয়।

এই কর্ম জীবগণ তাহাদের ইচ্ছামত তো করেই এমন কি মনের অগোচরেও উহা তাহারা করিয়া যাইতে পারে। এই মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা দুই তিন পুরুষের মধ্যে এই দেশেই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বাঙালীদের মুখাবয়বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এবং উহার সহিত পশ্চিম ভারতীয় ব্যক্তিদের আকৃতিগত প্রভেদ সহজেই ধরা পড়ে। এই সকল পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি পরিবার ছয় সাত পুরুষ যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা সত্বেও তাহারা বিবাহাদি সম্বন্ধ সকল সময়েই বাঙালীদের সহিত না করিয়া স্বগোষ্ঠীয়দের সহিতই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও দেখা যায় যে, আজ তাহাদের এবং বাঙালীদের মুখাবয়বের বৈশিষ্ট্যগত কোনও প্রভেদই নেই। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে ইহারা (পুরুষানুক্রমে) তাহাদের মনের অগোচরে মুখের পেশীসমূহ কুঞ্চিত করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরূপ হইতে চেষ্টা করে।

এইস্থলে এ কথাও উঠিতে পারে যে, ইহার জন্য দায়ী একমাত্র

খাদ্য ও জলবায়ু। এই খাদ্য ও জলবায়ু যে বিবিধ প্রকার দৈহিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম তাহা সকল সময়েই স্বীকার্য, কিন্তু ঐ পরিবর্তন বংশগত করিতে হইলে প্রয়োজন হয় ইচ্ছার। এই ইচ্ছা বা চিন্তা চেতন মনের ন্যায় অবচেতন মনেও আসিতে পারে। অবচেতন মনেরও এই ইচ্ছা স্নায়ুর মাধ্যমে রসপিণ্ডের উপর সমভাবেই কার্যকরী হইয়া থাকে। এই কারণে ভারতের প্রদেশ নির্বিশেষে ইংরাজীনবীস (সমকৃষ্টি সম্পন্ন) ব্যক্তিদের মুখাকৃতি ও চালচলন দুই পুরুষের মধ্যেই প্রায় একই রূপের হইয়া যায়। যাঁহারা দেহাকৃতির এই যৎসামান্য পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ একমাত্র জলবায়ু ও খাদ্যাদির কথাই বলেন তাহাদের এইরূপ উক্তির উত্তরে এইরূপ বলা যায় যে, বাঙলা দেশের এমন স্থানও আছে যেখানে বহুসংখ্যক পশ্চিম ভারতীয় পরিবার পুরুষানুক্রমে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা সত্বেও আজও তাহাদের মুখাকৃতির মধ্যে পূর্বতন জাতীয় বৈশিষ্ট্য সহজ চোখেই ধরা পড়ে। একটি বঙ্গদেশবাসী মাড়োয়ারি পরিবারের পিতামহ, পিতা ও পুত্রের ফটোচিত্র বা মুখাকৃতি তুলনামূলকভাবে অনুধাবন করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ধীরে ধীরে তাহাদের দেহের ও মুখের বৈশিষ্ট্য আধুনিক বাঙালীদের অনুরূপ হইয়া আসিতেছে। অপর দিকে এমন অনেক বাঙালী আছে যাহারা পুরুষানুক্রমে রক্তধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু রক্তধারা অক্ষুণ্ণ এবং জাতীয় খাদ্য অপরিবর্তিত রাখিয়াও তাহারা তাহাদের জাতিগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। কয়েক পুরুষের মধ্যে ঐ সকল প্রবাসী বাঙালীদের দেহাকৃতি প্রায় তৎ তৎ প্রদেশীয় ব্যক্তিদের অনুরূপই হইয়া গিয়াছে।

উপরের এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, পারিবেশিক সুবিধা

ও অসুবিধা জলবায়ু ও খাদ্যের সহিত যুক্ত হইয়া ইচ্ছা ও চিন্তা দ্বারা হরমনের মাধ্যমে জীবের বীজ-সারকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে এবং এইজন্য উহাদের ইচ্ছামত স্ব স্ব কর্মানুযায়ী জীবদিগের দৈহিক পরিবর্তনও ধীরে ধীরে বংশগত হয় বা হইতে পারে।

জীবদিগের ইচ্ছা ও তৎপ্রসূত অভ্যাস যে বংশানুক্রমে উত্তরোত্তর *বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা আজ এক পরীক্ষিত সত্য। প্রোটোজয়া প্রভৃতি নিম্নতম এককোষ জীব লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও এক ফিসিক্যাল বা কেমিক্যাল এ্যাকসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি পুরুষানুক্রমে উহাদের মধ্যে ক্রমান্বয়েই বর্ধিত হইয়া থাকে। কয়েকশত পুরুষবাদ অনুরূপ পরিবেশ হইতে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের পূর্ব অর্জিত ঐরূপ বর্ধিত 'প্রতিরোধ শক্তি' তাহাদের মধ্যে সমভাবেই বর্তিয়ে থাকে। অন্যান্য নিম্নতম প্রাণীদের লইয়া পরীক্ষা দ্বারাও এই একইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। য়ুরোপে Pavlov সাহেব এই সম্পর্কে ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করেন। ইনি কয়েকটি শ্বেত ইঁদুরকে এমনভাবে শিক্ষা দেন যাহাতে তাহারা ঘণ্টা ধ্বনি শুনা মাত্র খাদ্যের জন্য খাঁচা হইতে বাহির হইয়া আসিত। এইরূপ অভ্যাস তাহাদের মধ্যে আনিয়া দিতে তাঁহাকে উহাদের তিনশতবার শিক্ষা দিতে হইয়াছিল; ইহার পর এই সকল ইঁদুর ও ইঁদুরীর মিলন দ্বারা তিনি উহাদের সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি করিতে থাকেন, এবং সেই একই সঙ্গে বংশানুক্রমে তিনি উহাদের ঐ একই শিক্ষায় শিক্ষিতও করিয়া তুলেন। দ্বিতীয় পুরুষে উহাদের ঐ কার্যের জন্য আরও কমবার শিক্ষা দিতে হইয়াছে। উহাদের পঞ্চম পুরুষীয় শ্বেত ইঁদুরের ঐ একইরূপ অভ্যাসে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে তাঁহাকে মাত্র ত্রিশটিবার শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। হার্বডের Me Dougall ধেড়ে ইঁদুরের সাহায্যে পরীক্ষা

করিয়া অনুরূপ সুফলই পাইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে ঐ সকল ইঁদুরদের বংশানুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে অবতরণ না করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়া প্রফেসার হ্যারিসনও অনুরূপ উপায়ে এক প্রকার মক্ষিকাকে (Sow flies) কয়েক পুরুষ বাদে অপর আর এক প্রকার গাছের পাতায় ডিম্ব রক্ষা করিতে অভ্যস্ত করাইতে পারিয়াছিলেন।

উপরের তথ্য হইতে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, জীবের ইচ্ছাপ্রসূত অভ্যাস সহজেই বংশগত হইতে পারে। এক্ষণে আমি দেখাইব যে, স্নায়ুর মাধ্যমে দেহাকৃতির অদলবদলও বংশগত হইতে পারে। এই ইচ্ছাপ্রসূত অভ্যাসের সহিত কোনও অঙ্গসংশ্লিষ্ট থাকিলে উহার হ্রাস-বৃদ্ধিও বহু পুরুষ বাদে ঐ জীবের মধ্যে স্থায়ী হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে Dr. Kammerer য়ুরোপের হরিদ্রা দাগযুক্ত কৃষ্ণ-বর্ণের স্যালামেণ্ডার লইয়া উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের তিনি হরিদ্রা বর্ণের পাত্রে পুরুষানুক্রমে পুষিয়া দেখিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে উহাদের চর্মের হরিদ্রা অংশ বর্ধিত হইয়া কয়েক পুরুষ বাদে উহারা পুরাপুরি হরিদ্রা বর্ণের হইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ মৎস্য লইয়াও কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা লাল, নীল ও সবুজ আবর্তনের মধ্যে পড়িয়া মৎস্যদিগকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ হইতে দেখিয়াছেন। মৎস্যদিগের চক্ষু আবৃত করিয়া দিবার পর কিন্তু তাহাদের দেহের পরিবর্তন আর হয় নাই। তাহার পর ইহাদের একটি চক্ষু অন্ধকারে রাখিয়া অপর চক্ষুর উপর সাদা আলো ফেলিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মৎস্যগণ ধূসর বর্ণের হইয়া গিয়াছে। এইরূপে তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইরূপ একই পরিবেশে মৎস্যজীবকে কয়েক পুরুষ

রাখিলে তাহাদের এই বর্ণ স্থায়ী হইয়া যায়। এই অবস্থায় ঐরূপ পরিবেশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মধ্যে ঐ নূতন বর্ণ বংশগত হইতে থাকে। অর্থাৎ এই বিশেষ অবস্থায় তাহাদের বীজ-সার প্রভাবান্বিত হয় এবং এই-জন্যই ঐরূপ স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে, মৎস্যজীব চক্ষু দ্বারা আলোক শুধু দর্শন করে না উহা দ্বারা তাহারা আলোক শোষণ করেও বটে। এই চক্ষুর সহিত জীবের স্নায়ুর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং স্নায়ুর সহিত তথা উহাদের চিন্তার বা ইচ্ছার সহিত রসপিণ্ডসমূহের নিবিড় সম্বন্ধ। আমার মতে এই রসপিণ্ডসমূহ হইতে ক্ষরিত রসদ্বারা বীজ-সার সহজেই প্রভাবান্বিত হয় বা তাহা হইতে পারে।

[প্রাচীন হিন্দুদের এই বৈজ্ঞানিক মতটি পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্ম-প্রচারকগণ অন্যভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রুদ্রস্য চিন্তনাদ রুদ্র বিষ্ণুঃ স্যাৎ বিষ্ণুচিন্তানাৎ' ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণেও অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধ্যানে গান্ধর্ব-কন্যার ব্রাহ্মণরূপ সন্তান প্রাপ্তি সম্পর্কীয় আখ্যান ইহা প্রমাণ করে। ভাগবতের 'যথা পেশ-স্কৃতোধ্যায়ন.........' ইত্যাদি শ্লোকটিও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।]

হিন্দুগণ পরিকল্পিত সৃষ্টিক্রম মতবাদ সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার বর্তমান যুগের পণ্ডিতদের মতবাদের সহিত উহার তুলনামূলক আলোচনা করা যাউক। বর্তমানকালীন পণ্ডিতদের মতবাদের মধ্যে ডারউইনি, লামার্কি এবং ডি'ভেরীর মতবাদ অন্যতম। ইহাদের মধ্যে লামার্ক-এর অভিমতটি বহুলাংশে হিন্দু মতবাদের অনুরূপ। পাশ্চাত্য দেশে লামার্ক (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম সুচিন্তিতভাবে বিবর্তনবাদ

মতের প্রবর্তন করেন, কিন্তু হিন্দু মনীষিগণ তাঁহার বক্তব্য বিষয় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বকালে পৃথিবীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। লামার্ক ও তাঁহার অনুবর্তীগণ বিবর্তনের কারণ স্বরূপ প্রথমত বলেন যে, খাদ্যাদি, পরিবেশ, বাসভূমি এবং জলবায়ুর প্রভেদ হেতু জীবদেহে সামান্য রূপ পরিবর্তন ঘটে। এই সামান্য পরিবর্তন বলিতে তাঁহারা জীবদিগের গাত্রবর্ণ, দেহের হ্রাসবৃদ্ধি, গাত্রচর্মের স্বরূপ প্রভৃতিও বুঝাইয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রকার বাসভূমির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য জীবগণ তাহাদের কোনও কোনও অঙ্গ অধিক চালনা করে এবং কোনও কোনও অঙ্গ আদপেই চালনা করে না। ইহার ফলে অতিব্যবহারের কারণে তাহাদের কয়েকটি অঙ্গের বর্ধন ঘটে এবং অব্যবহারের কারণে কয়েকটি অঙ্গের বিলোপ হয়। সর্পের পদের ক্রমিক বিলোপ এবং জিরাফের লম্বাগলার কারণ স্বরূপ লামার্কিরা যথাক্রমে এই সকল অঙ্গের অব্যবহার ও অতি ব্যবহারের কথা বলেন। কিন্তু লামার্ক স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত এই সকল বৈশিষ্ট্য যে বংশগত বা inherited হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার বিরোধী পণ্ডিতেরা 'কামারের ডান হাতে'র ন্যায় সবল বাহু তার পুত্র পাইতে পারে না' কিংবা 'ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দিলে ঐ ইন্দুরের শাবক লেজহীন হয় না'—এইরূপ বহু উদাহরণ দিয়া তাঁহার মতবাদকে এতদিন অগ্রাহ্য করিতেন। কিন্তু অধুনাতম পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইসকল সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রবিশেষে বংশগত হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, হিন্দু ঋষিগণ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বকালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, লামার্ক (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাহার মতাবলম্বিগণ তাহা হইতে নূতন কিছুই বলেন নাই। এই সম্পর্কীয় তাঁহাদের বর্তমান মতবাদও প্রাচীন আর্য ঋষিদের মতবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র; এমন কি সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য

যে বংশগত হয় তাহা পর্যন্তও আত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু মনীষিগণ সেই প্রাচীন-কালেই বলিয়া গিয়াছেন। উপরন্তু সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বা acquired character কখন এবং কিরূপে বংশগত হইতে পারে সেই সম্বন্ধেও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে হিন্দু ঋষিগণ আরও একটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বাসস্থান এবং আবহাওয়া পরিবর্তন সহসা সংঘটিত হয় নাই। ইহা অতীব ধীরে সমাধা হওয়ায় জীবগণ পরিবর্তিত পৃথিবীর সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারিয়াছে। এই-জন্য হিন্দু ঋষিগণ কাল বা সময়কে সৃষ্টিক্রমের অন্যতম কারণ বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যাইতে পারে পৃথিবীর স্থানবিশেষে বৃক্ষাদি ধীরে ধীরে উচ্চ হওয়ায় জিরাফ জীব ধীরে ধীরে (বংশানুক্রমে) গলদেশ লম্বা করার সুযোগ পাইয়াছিল।

লামার্কি মতবাদ সম্পর্কে বলা হইল, এইবার ডারউইনি (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) মতবাদ সম্পর্কে বলিব। ডারউইনের মতে জীবমাত্রেই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ধর্ম উহাদের বীজ-কোষে নিহিত আছে। পিতা হইতে তাহার প্রতিটি পুত্র ভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। ডারউইন বলেন, পৃথিবীতে অবিরত জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রাম* বহু প্রকারের হইয়া থাকে। খাদ্যাহরণের জন্য সংগ্রাম, প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, হিংস্র জন্তুর সহিত সংগ্রাম, স্বগোষ্ঠীর জীবের সহিত সংগ্রাম, বিপর্যয়ের সহিত সংগ্রাম, বংশরক্ষার্থে সংগ্রাম—পৃথিবীতে সন্তান-সন্ততিসহ বাঁচিয়া বা টিকিয়া থাকিতে হইলে বহুবিধ সংগ্রাম তাহাদের করিতে হয়। ডারউইনের মতে বীজ-কোষের পরিবর্তন-ধর্মজনিত স্বাভাবিকরূপে আহৃত যে সকল পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য জীবদিগের জীবন-সংগ্রামের অনুকূল হয় মাত্র সেইগুলিই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকে, বাকীগুলি ধীরে ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তিনি বলেন যে, এইজন্তে নিকৃষ্ট জীবদের মধ্যে জন্মের হার অধিক। মৎস্য ভেকাদি জীব শত শত ডিম্ব প্রসব করে। এদের সকলগুলি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ইহাদের স্থান সঙ্কুলন হইত না। তাঁহার মতে এদের মধ্যে যাহারা অনুকূল বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মে তাহারাই বাঁচিয়া যায়, বাকীগুলির এমনিই বিনাশ ঘটে। তাঁহার মতে এদের মধ্যে যাহারা স্থানীয় পরিবেশের অনুকূল বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায় তাহারাই বাঁচিয়া থাকিয়া বংশ রাখিয়া যাইতে পারে, এবং এইরূপ প্রথায় বংশানুক্রমে একটি বিশেষ পরিবেশে বাস করিলে তৎসম্পর্কীয় অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির বংশানুক্রমে ক্রমান্বয়ে বর্ধন এবং প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যগুলির লোপ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে বিভিন্নরূপ জীব সৃষ্টির ইহাই একমাত্র মূল কারণ। তিনি আরও বলেন যে, একই বংশীয় জীব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্যান্য কারণে সমুদ্র, পর্বত, বনানী, মরুভূমি প্রভৃতির দ্বারা পরস্পর হইতে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, তাহাদের এই সকল উপদলগুলি তৎতৎ-স্থানীয় পরিবেশের অনুকূল বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় আহরণ করিয়া পৃথক পৃথক জাতীয় জীবে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে এইসব বিবিধ বাধা বা প্রাচীরের (barrier) জন্য নির্বিচার যৌন-মিলন তাহাদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঘটিতে পারে নাই। এইজন্য তাহাদের স্ব-স্ব পরিবেশ অনুযায়ী আহৃত বৈশিষ্ট্যের ধারাও নির্বিচার যৌন-মিলন দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। ডারউইনের মতে এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে যুগে যুগে পৃথিবীতে একটি জীব হইতে অপর একটি জীবের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে।

প্রমাণ স্বরূপ তিনি গৃহপালিত সৌখিন পারাবতসমূহের জন্মের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সাধারণ পারাবতের মধ্যে লম্বা লেজ বা লম্বা ঝুঁটি

পারাবত-দম্পতিদের বাছিয়া উহাদের পুরুষানুক্রমে ঐরূপ প্রথায় যৌন-মিলন ঘটাইলে মাত্র কয়েক পুরুষ বাদে উহারা লম্বাপুচ্ছ বা লম্বাঝুঁটি পারাবত জাতিতে পরিণত হইয়া যায়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বাছাই করার ফলে প্রতি পুরুষেই তাহাদের পুচ্ছ বা ঝুঁটি একটু একটু করিয়া বাড়িয়া গিয়া থাকে। ডারইনের মতে এইখানে যে বাছাই কার্য মানুষ করে, বাহিরে সেই বাছাই কার্য করে প্রকৃতি।

ময়ূরের রঙিন পুচ্ছ, পুং-কীটের রঙিন পক্ষ প্রভৃতির কারণ স্বরূপ ডারইন বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা দৈবক্রমে ঐরূপ রঙ অর্জন করিতে পারিয়াছে, ময়ূরী, স্ত্রী-কীট প্রভৃতি তাহাদেরই পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে এবং এর ফলে মাত্র ইহাদেরই বংশ রক্ষা হয়, যাহারা ঐ সকল গুণের অধিকারী নয় তাহাদের বংশ ধীরে ধীরে লোপ হয়। পুং-হরিণের বৃহৎ শিং, পুং-কোকিলের সুকণ্ঠ প্রভৃতিও তাঁহার মতে ঠিক একই কারণে অর্জিত হইয়াছে। যাহাদের এই সকল গুণ নাই তাহারা বাঁচিয়া থাকিলেও বংশ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। ডারউইনের মতে ময়ূরীর মনোরঞ্জনের জন্য ময়ূরের রঙিন পেখমের সৃষ্টি হইয়াছে। অনুরূপভাবে তাহার মতে স্ত্রীকোকিলের মনোরঞ্জনের জন্য পুং-কোকিলের গলায় মিষ্টি সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। পুং-হরিণ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দৈবক্রমে আহৃত বৃহৎ শিংএর কারণে উহারা অপর হরিণদের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া সহজেই স্ত্রী-লাভ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিত। এই সকলের মতের অসারতা সম্বন্ধে মানসিক বিভাগ শীর্ষক নিবন্ধে বলা হইয়াছে।

সাধারণভাবে ডারউইনের এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহা অচল বলিয়াই মনে হয়। যে স্বল্প পরিবর্তন জীবগণ জন্মের সহিত লাভ করে জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য অত্যল্প।

এতদ্ব্যতীত নির্বিচার যৌন-মিলন নিরোধার্থে যখন তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসেনি। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর নূতন পরিবেশে আসিয়া পড়িলে তাহাদের এই অত্যল্প পরিবর্তন তাহাদের রক্ষা করিতে কখনও পারিবে না। সহসা নূতন কোন এক পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িলে জীবদিগের একমাত্র স্বকীয় চেষ্টাই তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। অপর দিকে ময়ূরের রঙিন পুচ্ছাদি যৌনবাহুল্য মাত্র। যে বাড়তি শক্তি স্ত্রী জাতির সন্তান ধারণ ও পালনে অতি-বাহিত হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে সেই বাড়তি শক্তি ময়ূরের পুচ্ছে, পুং হরিণের শিং-এ এবং মানুষের দাড়ি-গোঁফের সৃষ্টি করে মাত্র। ইহা ছাড়া পতঙ্গাদির রঙিন পক্ষ ছেদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে,ইহার জন্য উহাদের যৌন-মিলন কখনও ব্যাহত হয় না। কোকিলের সুমিষ্ট স্বর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুরের তারতম্য বহুক্ষেত্রে মানুষেরই বোধগম্য হয় না, অতএব পশুপক্ষী সম্বন্ধে এইরূপ কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত জীবের যৌন-আকাঙ্ক্ষা সকল ক্ষেত্রে রূপ গুণের উপর নির্ভরশীল হয় না। এইরূপ বিবিধ কারণের উল্লেখ করিয়া ডারউইনের মতটি বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতও নির্ভুলরূপে আজও পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই।

উপরের তথ্য হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ডারউইন প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তিন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মকে বলা হইয়া থাকে স্বভাব-নির্বাচন, যৌন-নির্বাচন এবং কৃত্রিম-নির্বাচন। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহার এই সকল যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিতে চাহি। যৌন-নির্বাচন যে যৌনবাহুল্য মাত্র তাহা উপরে বিবৃত করা হইয়াছে। স্বভাব-নির্বাচনের অযৌক্তিকতা

সম্বন্ধেও উপরে বলা হইয়াছে ; কিন্তু উহাদের সম্পর্কে আরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। নিম্নে উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক।

জীবদিগের মধ্যে যে যৎসামান্য পরিবর্তন দেখা যায় তাহার কারণ সম্বন্ধে ডারউইন কোনও কথা বলিতে পারেন নি। ডারউইন সাহেবের অন্যতম সমর্থক ভাইসম্যানের মতে বীজকোষ বিভক্ত হওয়াকালীন ক্রোমোসম-সমূহ এলোমেলো (AT RANDOM) ভাবে বিভক্ত হইয়া কোষসমূহে সন্নিবেশিত হয়। এইজন্য অপত্যদিগের দেহাকৃতির মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রোমোসম্-সমূহের সমাবেশ ও কার্যকরণ একটি নির্দিষ্ট পন্থায় সমাধা হইয়া থাকে। অতএব ভাইসম্যান সাহেবের এবংবিধ ব্যাখ্যার মধ্যে তিলমাত্র সত্য নাই। উপরন্তু বর্তমানকালে পিওর লাইন ইনভেষ্টিগেসন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোনও জীবের পৌত্র, পুত্র, পিতা ও পিতামহের দেহের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়, একত্রে তাহার গড়পড়তা লইলে দেখা যায় যে, নূতন জীব সৃষ্টি হইবার মত তিলমাত্র পরিবর্তন উহাদের মধ্যে বর্তায় নি। কাঁকড়া প্রভৃতি জীবকে ঐরূপ পন্থায় কয়েক পুরুষ পালন করিয়া উহাদের খোলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ লইয়া বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, গড়পড়তার হিসাবে উহাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জীবদেহের এই সকল যৎসামান্য পরিবর্তন উহাদের কনষ্টিটিউসন অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং ঐ সকল পরিবর্তন একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া আমি মনে করি। এতদ্ব্যতীত ডারউইন সাহেব বুঝিতে চাহেন নি যে, জীবদেহের এই স্বাভাবিক পরিবর্তন পুরুষানুক্রমে একমুখী হইয়া অগ্রসর না হইলে নূতন জীব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এমন কি এই সম্পর্কে জীবদিগের অপত্যের সংখ্যাবহুল্য ও উহাদের জীবনযুদ্ধের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন

তাহাতেও কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃপক্ষে রাম মারা গেল বলিয়া শ্যামের দেহের কি সুবিধা বর্তাইবে তাহা অনেকেরই পক্ষে দুর্বোধ্য। এই স্বভাব ও যৌন নির্বাচন সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার কৃত্রিম-নির্বাচন সম্বন্ধে বলিব। এই কৃত্রিম নির্বাচনের অসারতা ডারউইন যে কেন বুঝিতে পারেন নি তাহা আশ্চর্যের বিষয়। একথা সত্য যে লণ্ডনের বিবিধ পোষা পায়রা সকল ঐ দেশের রক-পিজিয়ন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ডারউইন এই রক-পিজিয়ন হইতে উদ্ভূত বিবিধ রঙের ও আকৃতির পারাবতের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার সৃষ্টিক্রম মতবাদটি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আদিম পক্ষীদের কয়েকটি তাহাদের পূর্বতন রূপ লইয়া স্কট ও আইরিস উপকূলে গহ্বরের মধ্যে বাস করে। এক্ষণে উহাদের বংশধর রূপান্তরিত পারাবতদের কয়েকটি কিছুকাল পূর্বে পলায়ন করিয়া পুনরায় বন্য-পারাবতরূপে স্বাধীন জীবন যাপন করিতে থাকে। এই সময় ইহারা লণ্ডন সহরের সমুচ্চ অট্টালিকার শীর্ষের খোপসমূহে ইচ্ছামত বাসা বাঁধে। এই সকল খোপকে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত পাহাড়ের গহ্বর মনে করিয়াছিল। এই ভাবে পুরুষানুক্রমে বাস করার পর তাহারা ধীরে ধীরে তাহাদের পূর্বপুরুষ ভিন্ন বর্ণ ও আকারের রক্-পিজিওনের দেহই ফিরিয়া পাইয়াছে। এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল মিউটেসন বা পরিবর্তন পারাবত পোষকরা কৃত্রিম নির্বাচনের জন্য বাছিয়া লয় তাহা আদপেই জীবদিগের স্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। উহা জীব-দেহে উহাদের বীজকোষের দৌর্বল্যের (Germ-weakening) জন্য ঘটিয়া থাকে। ইহা স্বল্প বা অতি আহার এবং কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে ঘটিয়া থাকে। এই একই কারণে বন্য উদ্ভিদসমূহকে অতিরিক্ত সার (Heavy manure) সম্বলিত ভূমিতে রোপণ করিলে উহাদেরও মধ্যে এইরূপ বহু আকস্মিক

পরিবর্তন উপগত হয়। এই সকল বিষয় হইতে ডারউইনের কৃত্রিম নির্বাচনের মধ্যেও কোনও সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। *

[এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতীয় চরক ও সুশ্রুত বহুকাল পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, আহারের তারতম্যজনিত বীজকোষ প্রভাবান্বিত হইতে পারে। উপরোক্ত তথ্যসমূহ হইতে এই সকল সিদ্ধান্ত সত্য রূপে প্রমাণিত হইবে।]

এই ডারউইন এবং লামার্কী মতবাদ ব্যতীত অপর একটি সৃষ্টিক্রম মতও আছে। এই মতটি ডি' ভেরী প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে দৈবক্রমে (Freak ot Nature) সহসা একটি নূতন জীব (By leap) ভূমিষ্ঠ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে ছয় অঙ্গুলিযুক্ত মানুষ দেখা যাইলেও উহাদের সন্তান পাঁচ অঙ্গুলিযুক্তই হইয়াছে এইরূপ নানা কারণে এই মতবাদটি প্রারম্ভেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইব যে, কোনও য়ুরোপীয় মতই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর বা সর্বলোকগ্রাহ্য হয় নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে হিন্দুমতবাদটি বরং উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আধুনিক পণ্ডিতমাত্রেই জীবের ক্রমবিকাশ যে হইয়াছিল তাহা স্বীকার করেন। তবে কিরূপে তাহা সম্ভব হইয়াছিল সেই সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতভেদ। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ অন্যান্য মতবাদের সহিত হিন্দুদের মতবাদটি তাঁহাদের এই সম্পর্কীয় কোনও রচনায় স্থান দেন নাই। কিন্তু আমি মনে করি এই সম্পর্কীয় বিভিন্ন য়ুরোপীয় মতবাদের পার্শ্বে হিন্দু মতবাদটিও সগৌরবে স্থান পাইবার যোগ্য।

---

* ভবিষ্যতে এ্যাটম-বোম বা হাইড্রোজন বোম পরীক্ষার কারণে জীবের বীজকোষ প্রভাবান্বিত হইয়া ভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ উহার দ্বারা বীজকোষ সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত (Damaged) হইতে পারে।

[এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জীবের কোনও একটি অপাঙ্গ যদি উহাদের জীবনধারণের ব্যাপারে অসুবিধার বা সুবিধার সৃষ্টি না করে তাহা হইলে উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। ইহাকে ক্রমবিকাশের "তুষ্ণিভাব" বলা হইয়া থাকে। জীবদিগের বিবিধ (Vestige) অণু-অপাঙ্গ ইহা প্রমাণিত করে। এই সকল অণু-অপাঙ্গর অবস্থিতির প্রকৃত কারণ হিন্দু-বিবর্তন মতের দ্বারাই নির্ভরযোগ্যরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কারণ, এই অবস্থায় জীবদিগের কোনও অসুবিধা বা সুবিধা না হওয়ায় উহাদের পরিপূর্ণ বিলোপের ইচ্ছা জীবদিগের মনে আসে নাই।]

সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় প্রমাণ

আধুনিক . পণ্ডিতগণ সৃষ্টিক্রম বা ইভোলিউসন যে পৃথিবীতে বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রশীল-বিজ্ঞান (Fossil) ভ্রূণ-শাস্ত্র, শরীর-বিদ্যা, পর্যায়-বিদ্যা (Systemetic zoology) প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার সাহায্য লইয়া থাকেন, কিন্তু আমি মনে করি যে সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদ সৃষ্টির জন্য প্রাচীন হিন্দুগণ মূলতঃ এ্যাসট্রোনমি এবং ভ্রূণশাস্ত্রের উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। কারণ তৎকালীন হিন্দুগণ এই দুইটি বিদ্যাতে প্রায় আধুনিক পণ্ডিতদের ন্যায়ই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সৃষ্টিক্রম যে পৃথিবীতে হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আরও বহুবিধ বিদ্যাব সাহায্য লইয়া থাকেন।

প্রথমে আমি এই সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রবর্তিত প্রমাণ আদি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহার পর আমি তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা দেখাইব কিরূপ উপায়ে মাত্র এ্যাসট্রোনমি ও ভ্রূণশাস্ত্রের জ্ঞানের সাহায্যে প্রাচীন হিন্দুমনীষিগণ সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদসমূহ উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর আমি ইহাও দেখাইব যে, এই সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা যে একেবারে অবহিত ছিলেন না, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে সৃষ্টিক্রমের পর্যায় ও মতবাদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে সৃষ্টিক্রম যে হইয়াছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ সম্বন্ধে বলা হইবে। একটি প্রাচীন জীব হইতে যে, আধুনিক জীবের সৃষ্টি

হইয়াছিল তাহা আধুনিক বিজ্ঞানসমূহ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এই বিজ্ঞানের মধ্যে প্রশীল (Fossil) বিজ্ঞান, ভ্রূণশাস্ত্র, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি প্রধান। প্রথমে শরীরবিদ্যা সম্বন্ধে বলা যাউক। শরীরবিদ্যা পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন জীবদিগের অস্থি, কঙ্কাল ও দেহ-যন্ত্রাদির সন্নিবেশের মধ্যে বহুবিধ সামঞ্জস্য আছে। মনুষ্য হইতে মনুষ্যেতর প্রতিটি জীব-দেহে আমরা দেখিতে পাই সেই হাত-পা-নাক চোখ-মুখ-যৌনদেশ ইত্যাদি। একটি মানুষ, একটি গরিলা বা বানর এবং একটি অশ্বের কঙ্কাল পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিলে স্পষ্টত প্রতীত হইবে যে, উহারা একই কোনও পূর্বপুরুষের সন্ততি এবং তাহাদের অঙ্গাদির বিভিন্নরূপ ব্যবহার হেতু উহারা বিভিন্ন রূপের হইয়া গিয়াছে। উহাদের সকলেরই মধ্যে যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি সমভাবেই দেখা যায়। অনুরূপভাবে যাবতীয় নিরস্থিক জীবদিগের দেহাবয়ব পরিলক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেও মূলত বহু সামঞ্জস্য বিদ্যমান। একটি শম্বুকের ভিতরকার খাদ্যনলী বাহির করিয়া উহাকে লম্বা করিয়া লইলে উহা জোঁক, কেঁচো প্রভৃতির ন্যায়ই প্রতীত হইবে। ইহাদের সকলেরই দেহ প্রায় একই প্রকারের, কাহারও দেহ অধিক লম্বা, কেহ অনতিদীর্ঘ, কেহ বা বাসস্থান বা অভ্যাসের কারণে গোল বা স্থূল হইয়া গিয়াছে, এই যা। অপর দিকে এই অস্থিক ও নিরস্থিক জীবগণ সকলেই বহু-কোষ জীব ; অর্থাৎ বহু কোষ-সমষ্টির দ্বারা এই উভয় জীবগোষ্ঠীর দেহ সৃষ্ট হইয়াছে।

এই জ্ঞান সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুগণও অবগত ছিলেন। তাঁহারা একটি প্রাণীর সহিত অপর একটি প্রাণীর এবং তৎসহ প্রাণীর সহিত মনুষ্যের এ্যানাটমী এবং সর্বোপরি প্রাণীর সহিত বৃক্ষের এ্যানাটমীর তুলনামূলক

আলোচনা যে সেই প্রাচীন যুগেও করিতেন তাহা আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি। প্রাচীন বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান ব্যতীত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, জীবমাত্রই ঈশ্বরের চক্ষে সমান, কারণ তাহাদের মধ্যে সেই নাক, চোখ, হাত, পা আজও সমভাবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই দেহাবয়বের সাদৃশ্য ব্যতীত কয়েকটি জীবের দেহে পূর্বলুপ্ত অঙ্গের চিহ্নস্বরূপ বহু Vestige বা অঙ্গাণু দেখাও যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গরুর দ্বিখুর বা চেরা ক্ষুরের উপরে আজও পূর্বলুপ্ত আরও দুইটি ক্ষুরের চিহ্ন-স্বরূপ দুইটি ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ক্ষুর দেখা যায়। দেহ ব্যবচ্ছেদের পর মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নদেশেও পূর্বলুপ্ত লেজের চিহ্ন-স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র অস্থি-খণ্ড আজও দেখা যায়। অনুরূপভাবে সাপের পূর্বে যে পা ছিল তার চিহ্ন আজও উহার অস্থি-কঙ্কালে দেখা যায়। দুই এক জাতীয় সর্প আজও পর্যন্ত উহাদের পিছনের দুইটি পা হারায় নি।

এই বিশেষ প্রমাণটি সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ কোনও প্রকার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বরং এইগুলিকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা গো-জীবকে দ্বিখুর জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের উপরের খোর অপাঙ্গ দুইটি সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য করেন নাই।

শরীর-বিদ্যা সম্বন্ধে বলা হইল, এইবার প্রশীল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিব। হিন্দুগণ সম্ভবত ইহাকে অশ্মীন-বিদ্যা নামে অভিহিত করিতেন। প্রশীল বা অশ্মীন-বিদ্যা ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় অন্যতম প্রমাণ। মানুষ মাটি খুঁড়িয়া ইহা বাহির করিয়াছে। এই বিদ্যাকে ইংরাজিতে বলা হয়—পেলিয়ণ্টোলজী। কোনও জীব-দেহ মাটির তলায় চাপা পড়িয়া কোনও পাথরের সংস্পর্শে আসিলে, ঐ কঙ্কালের প্রতিটি কণা একে
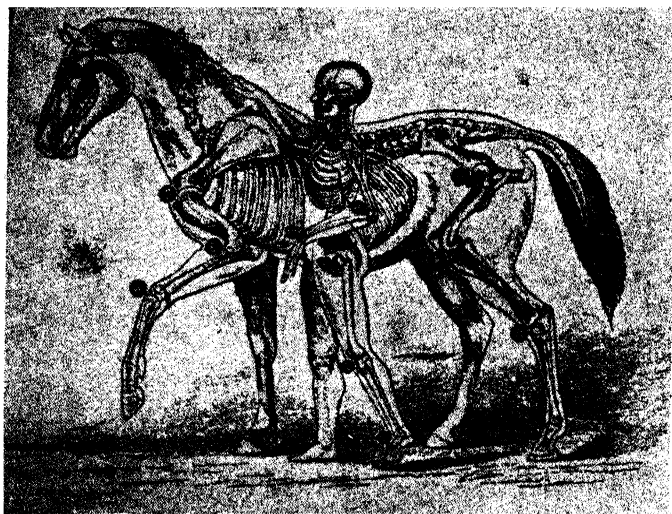
কম্‌প্যারেটিভ্‌ এনাটমি—অশ্ব ও মানুষের

একে বিচ্যুত হয় এবং ঐ প্রস্তরের প্রতিটি কণা কঙ্কালের অস্থিকণা-সমূহের পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করিয়া উহাকে ধীরে ধীরে পাথরে পরিণত করিয়া দেয়। ইহার ফলে আমরা হুবহু অনুরূপ একটি পাথরের কঙ্কাল মাটির তলায় পাইয়া থাকি। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে মানুষ মাটি খুঁড়িয়া উহার বিভিন্ন যুগের ভূতাত্ত্বিক স্তর হইতে বহুবিধ প্রাচীন জীবদিগের প্রশীল-কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। শম্বুক, ঝিনুক প্রভৃতি কয়েকটি নিরস্থিক জীবের শক্ত খোলা বা কোষ থাকিলেও বহু নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে অস্থি বা কোষ থাকে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বহু প্রাচীন নিরস্থিক জীবের সন্ধান মাটির নিম্নতম স্তরে পাইয়া থাকি। লক্ষ বৎসর পূর্বে হয় ত কোনও এক নরম প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া কেঁচুয়া সদৃশ জীব চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরে ঐ প্রস্তর কঠিনতর হইয়া আজও পর্যন্ত উহার চিহ্ন আপন বুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই সকল লম্বা দাগ বা চিহ্ন হইতে উহারা কি প্রকারের জীব ছিল তাহা বুঝা যায়। এই প্রশীল-বিজ্ঞানের মূলসূত্র যে হিন্দুগণ অবগত ছিলেন তাহা আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি। হয়ত কয়েকটি প্রশীল কঙ্কালও তাহারা মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে জোর করিয়া কোনও কিছু বলা আজ আর সম্ভব নয়।

এতদ্ব্যতীত আরও একপ্রকার জীবের প্রতিকৃতি আমরা প্রাপ্ত হই। আগ্নেয়গিরি-উদ্গত গলিত সীসার বা মরুভূমি প্রবাহিত বায়ুকণার তলায় পূর্বকালে বহু প্রাচীন জীবদিগের সমাধিলাভ ঘটিত। কিছুকাল পরে উহাদের পচ্যমান নশ্বর দেহের বিলুপ্তি ঘটিলেও ঐ স্থানে ঐ জীব-দেহের অনুরূপ একটি ছাঁচ থাকিয়া গিয়াছে। মানুষ মাটি খুঁড়িয়া ঐ ছাঁচের একস্থানে ফুটা করিয়া উহার মধ্যে গলিত সীসা বা plaster of paris ঢালিয়া দিয়া হুবহু অনুরূপ একটি জীবের প্রতিকৃতি প্রস্তুত

করিয়া লইয়াছে। এই প্রাচীন জীবের এই সকল প্রতিকৃতি হইতে উহার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা অবগত হইয়া থাকি।

পুরাকালে পৃথিবীর গোলার্ধে বহু তৈল হ্রদ দেখা যাইত। বহু প্রাচীন জীবদিগের এই সকল তৈল-হ্রদেও সমাধি ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেরু ও মরু প্রদেশের বহু জীবন্ত চতুষ্পদ প্রাণী যুগ যুগ ধরিয়া বালুকণা বা বরফের তলায় চাপা পড়িয়া আছে। তৈল ও বরফের তলায় থাকায় উহাদের মাংস ও চর্ম প্রভৃতি আজও পর্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। ঐ সকল দেশের মানুষ তৈল ও বরফ খুঁড়িয়া ঐ সকল প্রাণী-দিগকে বাহির করিয়া লইয়া আজও পর্যন্ত তাহারা উহাদের মাংস ভক্ষণ করে। এই সকল জীব ব্যতীত কোনও কোনও প্রাচীন কীটের দেহ বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করিয়াছেন। রজন একপ্রকার গাছের আঠা। এই আঠার তলায় বহু প্রাচীন কীটের দেহ আজও পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন জীবদিগের প্রশীল-কঙ্কাল মাত্র আমরা ভূমির তলা হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।

পৃথিবীর মৃত্তিকা-তলের এক একটি স্তর সৃষ্ট হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে। এক একটি স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে তাহার একটি হিসাব আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। এই ভূমির সর্বনিম্ন স্তরে আমরা কেবল-মাত্র নিরস্থিক জীবদিগের চিহ্ন পাইয়া থাকি, এবং উহার উপর স্তরে আমরা নিরস্থিক জীবদিগের চিহ্নের সহিত পাইয়া থাকি কেবল-মাত্র মৎস্যের প্রশীল-কঙ্কাল। এই স্তরের উপরের স্তরে আমরা নিরস্থিক জীব, মৎস্য এবং সরীসৃপ জীবদিগের সন্ধান পাইয়া থাকি। ইহার উপরকার স্তরে পূর্বোক্ত জীবদিগের সহিত স্তন্যপায়ী পশু এবং পক্ষীদের

প্রশীল-কঙ্কাল একত্রে একই স্তরে আমরা দেখিতে পাই ; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সরীসৃপ জীব হইতে বিভিন্ন ধারায় স্তন্যপায়ী পশুর এবং পক্ষীর উদ্ভব একই সময়ে হইয়াছিল। ইহার উপরের স্তরের মৃত্তিকায় আমরা বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী ও তাহার উপরের স্তরে বানর এবং সর্বোপরি স্তরে আমরা মানুষের প্রশীল-কঙ্কাল অন্যান্য জীবের প্রশীল-কঙ্কালের সহিত পাইয়া থাকি। এইভাবে কিরূপ পর্যায়ে একটির পর একটি নিকৃষ্ট জীব হইতে উন্নত জীবের উদ্ভব পৃথিবীতে হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত হইয়া থাকি। ভূস্তরের এক একটি স্তরের সম্ভাব্য বয়স অনুমান করিয়া ঐ সকল স্তরে প্রাপ্ত জীবদিগের স্বষ্টিকালও আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি। এইরূপে একটি জীব হইতে অপর জীব স্বষ্টি হইতে কত লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে তাহাও আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি।

[কখনও কখনও অবশ্য ভূমিকম্পাদি নৈসর্গিক কারণে নীচের মৃত্তিকা উপরে এবং উপরের মৃত্তিকা নীচে নামিয়া বা উঠিয়া গিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ জীবদিগের প্রশীল-কঙ্কালগুলিও উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া গিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের স্তরসমূহ ঐভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় তাঁহারা এইরূপ ওলট্‌-পালটের কারণ সহজেই নির্ণয় করিয়া লইতে পারিয়াছেন।]

এক্ষণে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বষ্টিক্রম সম্পর্কীয় প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে প্রদত্ত সময়ের হিসাবের সহিত বর্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমিত সময়ের হিসাবের একটুমাত্র গরমিল দেখা যায় নাই। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশেষে আমরা আলোচনা করিব।

[মাটি খুঁড়িয়া আমরা দুই প্রকারের জীবের সন্ধান পাইয়া থাকি ; যথা, ক্রমলুপ্ত এবং অধুনালুপ্ত। যে-সকল প্রাচীন জীবের বংশ এখনও

বর্তমান আছে কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের ঐসকল পূর্বপুরুষদের দেহের সহিত ক্রমিক পরিবর্তনের কারণে তাহাদের বর্তমান বংশধরদের দেহের সাদৃশ্য কম বা নেই তাহাদের বলা হইয়া থাকে ক্রমলুপ্ত জীব। যে সকল প্রাচীন জীবের বংশ নানা কারণে ঐ প্রাচীন কালেই সম্পূর্ণ-রূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের বংশ নাই বা যাহারা নির্ব্বংশ, তাহাদের বলা হইয়া থাকে অধুনালুপ্ত জীব।]

প্রতিটি ভূস্তরের গঠনকালকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এক একটি যুগ রূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা এই সকল যুগকে পৃথক পৃথক নামেও অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দুগণ কিন্তু এ্যাসট্রোনমির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারে ঐ সকল যুগকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উহাদের যথাক্রমে তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ, রূপ ও কর্ম সম্পর্কীয় যুগ। জীবদিগের মানসিক ও জনন—শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কীয় প্রবন্ধে এই সকল যুগের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি প্রভৃতি আধুনিক যুগ এবং তৎপূর্বেকার কৃত যুগ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

এই প্রশীল-বিন্থা হইতে জানা যায় যে, উহাদের কয়েকটির বিনাশের কারণ ছিল অতিবাড় বা অতি-ভার। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয়—Over-specialisation। পূর্বকালীন ডায়নোসিরাস প্রভৃতি বহু অতিকায় সরীসৃপের বিনাশ এই কারণেই ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখিত অধুনালুপ্ত ঘৃণিবান জীবটি (কঙ্কাল) ডাইনেসিরাস জাতির কি না, সেই সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

এই বিন্থা হইতে আরও জানা যায় যে, নূতন যুগ ও পরিবেশের সহিত

তাল রাখিয়া বা খাপ খাওয়াইয়া যাহারা চলিতে পারে নাই, তাহারাই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রমাণ বা চিহ্ন, উদ্ভিদাদির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বায়বিক পরিবর্তন প্রভৃতি কখন কি কারণে ঘটিয়াছিল তাহাও এই ভূস্তরসমূহ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়া থাকে। তবে এই সকল জটিল বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুদের কতটা জ্ঞান ছিল তাহা আজ বলা শক্ত।

সৃষ্টিক্রমের তৃতীয় প্রমাণ আমরা পাই ভ্রূণ-শাস্ত্র বা embryology হইতে। মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবের জন্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম জরায়ুর অভ্যন্তরে পুং-বীজ ও স্ত্রী-বীজ একত্রে মিশিয়া বারেবারে বিভক্ত হইয়া পিণ্ডাকার বহু-কোষ জীবের সৃষ্টি করে। পরে উহা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া মৎস্য-জীবের ন্যায় এক জীবে পরিণত হয়। কয়েক মাস পরে উহা কতকাংশে সরীসৃপ জাতীয় এক জীবে রূপান্তরিত হয় এবং আরও কিছুকাল পরে উহাদের চতুষ্পদ ও বানরদের মাঝামাঝি একটি জানোয়ারের মত দেখায়; এই সময় উহাদের দেহে একটি ছোট লেজও সংযুক্ত থাকে। পরিশেষে উহারা মানুষের আকৃতি পাইয়া মানুষ হইয়া বাহির হইয়া আসে। এইখানে যে পরিবর্তন সাধিত হইতে সহস্র কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা মাতৃজঠরের মধ্যে মাত্র দশমাস দশ দিনে সম্পন্ন হয়। এই ভ্রূণ-শাস্ত্র হইতে দেখা যায় যে, মৎস্যের ক্ষেত্রে এই ভ্রূণের মৎস্যেই পরিসমাপ্তি ঘটে। সরীসৃপের ক্ষেত্রে মৎস্যের মধ্য দিয়া আসিয়া কোনও এক সরীসৃপ জীবে উহার সমাপ্তি ঘটে। কুকুর প্রভৃতির ক্ষেত্রে উহা যথাক্রমে মৎস্য ও সরীসৃপ জীবের মধ্য দিয়া আসিয়া কুকুর প্রভৃতি জীবে শেষ হয়। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে জীব যতই উন্নত হউক না কেন উহার জন্ম-পর্যায় সংক্ষিপ্তাকারে ভ্রূণের বৃদ্ধির মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভ্রূণ-শাস্ত্র

হইতে পৃথিবীতে কোন জীবটি প্রথমে ও কোন জীবটি পরে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন জীব হইতে কোন জীবের উদ্ভব হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি। যে পর্যায়ে আমরা মাটি খুঁড়িয়া পর পর নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট জীবের সন্ধান পাই সেই একই পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যেও আমরা একটি নিকৃষ্ট জীব হইতে একটি উৎকৃষ্ট জীবকে রূপান্তরিত হইতে দেখি। এই জন্য ইংরাজিতে বলা হয় যে ontogeny repeats phylogeny, অর্থাৎ ভ্রূণ সম্পর্কীয় বর্ধন উহাদের ক্রমশীল সমাবেশের পুনরুক্তি মাত্র।

[হিন্দুদিগের অবতারবাদ সম্ভবতঃ এই ভ্রূণ-শাস্ত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা না হইলে পর পর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, অর্ধেক পশু অর্ধেক নর জীব প্রভৃতি তাঁহারা পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।]

ভ্রূণ শাস্ত্র সম্বন্ধে যে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব-বর্তী পরিচ্ছেদের পরিশেষে উদ্ধৃত ভাগবতোক্ত শ্লোকটি অনুধাবন করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, তৎনিহিত ক্রমবিকাশের পর্যায় সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাখ্যা তাঁহারা এই ভ্রূণ-শাস্ত্রের সাহায্যেই প্রদান করিতে পারিয়াছেন।

[জীবদিগের বর্ধনের প্রারম্ভে উহাদের নিকষিত বীজ ঠিক নিম্নতম এক কোষ প্রাণী প্রোটজোয়ার মতই দেখিতে থাকে। ইহার পর এই বীজ বারে বারে বিভক্ত হইয়া একটি গোলাকার বলের ন্যায় কোষ-পিণ্ডের সৃষ্টি করে। প্রায়শঃক্ষেত্রে এই গোলাকার কোষ-পিণ্ডটি একটি ফাঁপা গোল বলের ন্যায় দেখিতে হয়। কখনও কখনও অবশ্য ঐ গোলাকার পিণ্ডের মধ্যে কোন ফাঁক থাকেনি। উহা তখন নিরেট বলের
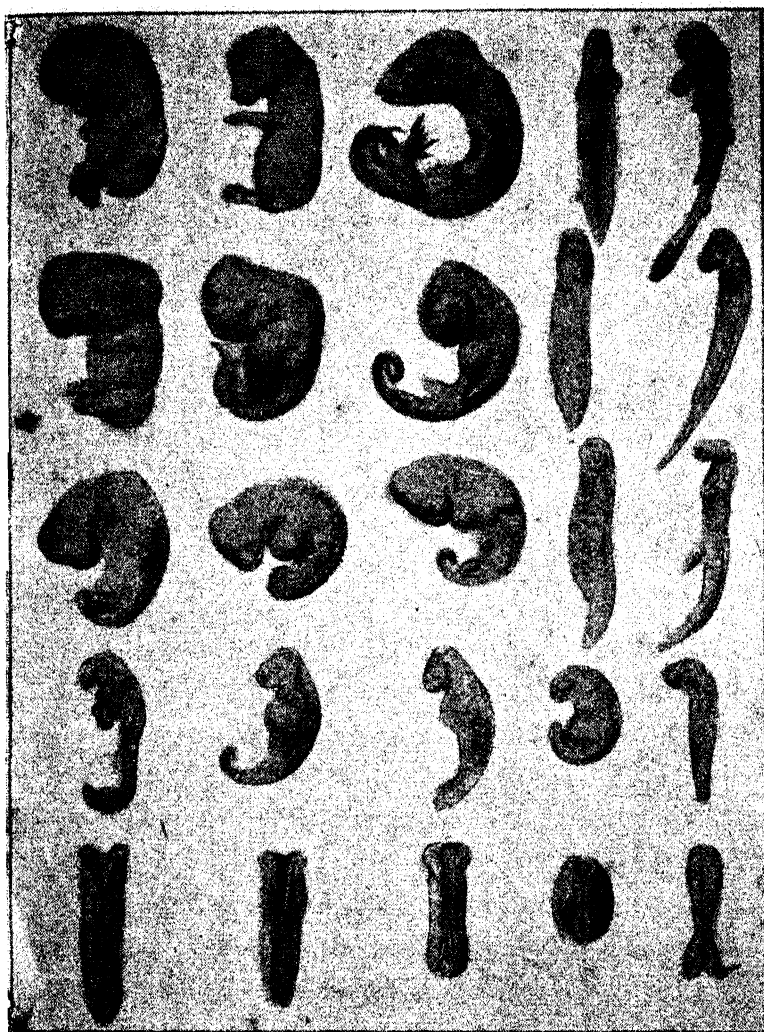
মানুষ শশক লিজার্ড্ নিউট্ ডগ্ ফিস্
বিবিধ জীবের ভ্রূণের ক্রমিক বৃদ্ধি (নিম্ন হইতে উপরে দেখুন)

মত দেখিতে হইয়াছে। তবে যদি ঐ বীজের মধ্যে খাদ্যাংশের প্রাচুর্য থাকে তাহা হইলে কোষসমূহ উহারই একাংশে একটি রেকাবের সৃষ্টি করে এবং তাহার পর উহা হইতে ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ঘিরিয়া পূর্বের ন্যায় গোলাকার বলের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আজকালকার ভল্‌ভেক্স জাতীয় জীব প্রায় হুবহু অনুরূপ আকারেরই হইয়া থাকে। জীবাদিগের বর্ধনের এই বিশেষ অবস্থাকে ইংরাজীতে বলা হয় (Morula) এবং ব্ল্যাষ্টুলা (Blatusla)।

তবে বহু জীবের এই কোষ-পিণ্ড একটি ছিদ্রযুক্ত (Hole) রবারের বলের মত দেখিতে হয়। এই সময় এই বেলের একটি অংশ উহার ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়া দুইটি কোষ-স্তর যুক্ত (Ectoderm, Endoderm) প্রায় অর্ধচন্দ্রাকার বলের মত হইয়া পড়ে। এই সময় ইহাদের সহিত দুইটি কোষস্তর যুক্ত হাইড্রা প্রভৃতি জীবের তুলনা করা যাইতে পারে। এইজন্য Haeckel সাহেব বহু কোষ জীবদের হাইপথেটিক্যাল এন্‌-সেষ্টার জীবের নাম দিয়াছিলেন গ্যাষ্ট্রিয়া (Gastræa)। ইহার পর এই একটোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম নামক দুইটি কোষের সহযোগে উভয়ের মধ্যে মেসোডার্ম (Mesoderm) নামক অপর একটি কোষস্তরের সৃষ্টি হয়। এই এক্টোডার্ম কোষস্তর হইতে আমাদের ত্বক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয়াদির উত্তম অংশ প্রভৃতি, এণ্ডোডার্ম হইতে জীবের ফুস্‌ফুস, লিভার প্রভৃতি এবং মেসোডার্ম হইতে পেশী, অস্থি প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া থাকে।]

বিবর্তনবাদের চতুর্থ প্রমাণ হইতেছে পর্যায়-বিদ্যা; ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় সিসটেমেটিক জুলজী। জীবদিগের শ্রেণী বিভাগের ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। পুস্তকের প্রথমাংশেই এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। উহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা যুরোপীয়দের ন্যায় এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এই

বিদ্যার সাহায্যে বিবিধ প্রাণীদিগের নিকট বা দূর সম্পর্ক সম্বন্ধে সহজেই অবহিত হওয়া যায়।

বক্তব্য বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যোনি (Species) কাহাকে বলে। প্রায় সম আকৃতির যে সকল জীব পরস্পরের মধ্যে যৌন-মিলন ঘটাইয়া অনুরূপ অপত্যের জন্ম দিতে সক্ষম, সেই সকল জীবকেই একই যোনির জীব বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বয়স ও লিঙ্গজনিত প্রভেদ ব্যতীত অন্য কোনও প্রভেদ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কোনও দুইটি যোনির জীব যদি কষ্টে যৌনসঙ্গম ঘটাইতে পারে এবং তৎজনিত অশ্বেতরের ন্যায় যৌন-শঙ্কর জীব উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাদেরও একই যোনির জীব বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে এই সকল বিবিধ যোনির জীবদের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের দেহাকৃতির পারস্পরিক সাদৃশ্য অনুযায়ী উহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (Group) সহজেই বিভক্ত করা যাইতে পারে। একই প্রকার এক একটি গোষ্ঠীকে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ জেনাস বলিয়াছেন। এইভাবে যথাক্রমে তাঁহারা সম-আকৃতির জেনারাকে এক একটি ফেমিলিতে, সমাকৃতির 'ফেমিলিস্'কে এক একটি অর্ডারে, সমাকৃতির 'অর্ডারস্'কে এক একটি ক্লাশে এবং সম আকৃতির ক্লাশকে তাঁহারা এক একটি ফাইলামের অন্তর্গত করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয়রাও যে অনুরূপভাবে এক, দ্বি, ঃ চতুঃ ও পঞ্চ শফ জীবদের একত্রে শফ জীব এবং চতুঃ ও পঞ্চ নখ জীবকে একত্রে নখ জীব বলিতেন এবং তাহার পর এই শফ ও নখ এই উভয় গোষ্ঠীর জীবদের একত্রে তাঁহারা যে উভতোদতঃ জীব বলিতেন তাহা বিবিধ ব্যাখ্যা সহ পুস্তকের প্রথমাংশে আমি বিবৃত করিয়াছি। অনুরূপ-ভাবে এই পুস্তকের অন্যান্য পরিচ্ছেদে ষষ্ঠপদী, অষ্টপদী, শতপদী,

বহুপদী প্রভৃতি জীবকে একত্রে গণ্ডুপদী জীব বলা হইত এবং এই মুপূরিকা, গণ্ডুপদী, কোশস্থা প্রভৃতি জীবকে একত্রে অনাস্থিকা জীব বলা হইত এবং এই অস্থিক ও অনস্থিক জীবদের যে একত্রে বহুকোষ বা মুখ্য জীব বলা হইত তাহাও আমি প্রমাণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পরিচ্ছেদে এই ইংরাজী, 'স্পিশিশ, জেনাস, অর্ডার, ক্লাশ ফাইলাম প্রভৃতির অনুক্রমিক সংস্কৃত পরিভাষাও (জাতি, কুল, বংশ, গ্রাম, দ্বীপ, প্রভৃতি) যে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাও আমি প্রমাণ করিয়াছি।]

এই পর্যায়-বিদ্যা হইতে পৃথিবীতে যে ক্রমবিকাশ দ্বারা জীব সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমিবা আদি এককোষ যুক্ত জীবকে আমরা 'এককোষ জীব' বলি। কিন্তু পৃথিবীর বাকি জীব সকল বহুকোষ জীব। ইহা হইতে বুঝা যায়, এককোষ জীব হইতেই বহুকোষ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বহুকোষ জীব আবার নিরস্থিক ও অস্থিক জীবে বিভক্ত। একটি নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর জীব হইতেই উৎকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি হয়। এইজন্য ধরিয়া লওয়া যায় যে, নিরস্থিক জীব হইতেই অস্থিক জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য বিপরীত বিবর্তন দ্বারা ক্ষেত্র-বিশেষে উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট জীবেরও সৃষ্টি হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চতুষ্পদ সরীসৃপ হইতে পদহীন সর্পের সৃষ্টি বা চতুষ্পদ স্থলজ স্তনপা হইতে পদহীন মৎস্যাকার জলজ হোয়েল জীবের সৃষ্টির কথা বলা যাইতে পারে। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে এইগুলিকে নিকৃষ্ট জীব মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইহাদের উৎকৃষ্ট জীবদেরই সমগোষ্ঠীয় জীব বলা হইয়া থাকে। এইজন্য জীবের শ্রেণীবিভাগ করার সময় উহাদের দেহের গঠনের সহিত আভ্যন্তরিক অঙ্গাদির গঠন সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই অস্থিক জীবগণকে সংক্ষেপে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা

যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরামিষাশী গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জীবদের আমরা অক্রব্যাদ বা (Non-carniaora) বলিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে গরু প্রভৃতি যারা জাবর কাটে তাহাদের আমরা রোমন্থক জীব (Ruminant) এবং অশ্ব প্রভৃতি যারা জাবর কাটে না তাহাদের আমরা অরোমন্থক বলি। এই রোমন্থক এবং অরোমন্থক এই উভয় গোষ্ঠীর জীবকে একত্রে বলা হয় "অক্রব্যাদ বা নিরামিষাশী" জীব। অপর দিকে ব্যাঘ্র সিংহ কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জীবকে একত্রে বলা হয় "ক্রব্যাদ বা মাংসাশী" জীব। এই ক্রব্যাদ জীবদের মধ্যে বিড়াল ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে একটি গোষ্ঠীতে এবং কুকুর প্রভৃতি জীবকে অপর এক গোষ্ঠীয় জীবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, বিভিন্ন ধারায় ইহারা পূর্বতন এক ক্রব্যাদ জীব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে, অক্রব্যাদ ও ক্রব্যাদ এই উভয় জীবই কোনও এক প্রাচীন অস্থিক জীব হইতে পৃথক ধারায় উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য এই পর্যায় বিদ্যাকে সৃষ্টি ক্রমের একটি বিশেষ প্রমাণ-রূপে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

বিবর্তনবাদের পঞ্চম প্রমাণ মধ্যবর্তী জীবসমূহ। এই মধ্যবর্তী জীবদিগের অন্যতম দৃষ্টান্ত ভেক জীব। মৎস্য হইতে সরীসৃপের জন্মের মধ্যকালে যে সকল জীবের উদ্ভব হইয়াছিল ভেক তাহাদের একটি। ইহাদের জন্ম-ইতিহাস লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, মৎস্য হইতে উভচর এবং উভচর হইতে সরীসৃপের উদ্ভব হইয়াছে। বাচ্চা ভেক ব্যাঙাচি অবস্থায় ঠিক মাছের মতই জলে সন্তরণ করে। এই সময় তাহারা কান্‌কোর ন্যায় যন্ত্রের সাহায্যে মাছের মতই জল হইতে শ্বাস গ্রহণ করে। পরে ব্যাঙাচি জীবই লেজ খসাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া ভেক-এ পরিণত হইয়া ফুসফুসের সাহায্যে বায়ু হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। এই

ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, যে পরিবর্তনটি সাধিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল তাহা আজ মাত্র কয়েকদিনে সম্পাদিত হয়।

সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীবদিগের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটি ডিম্বের বা জরায়ুর মধ্যে সমাধা হয় তাহাই ভেকের ক্ষেত্রে বাহিরে আসিয়া সমাধা হয়। প্রমাণস্বরূপ এক প্রকার ভেক পৃথিবীতে আজও দেখা যায় যাহাদের ডিম্ব হইতে ব্যাঙাচি নির্গত না হইয়া ক্ষুদ্রাকার ভেকই Frogling নির্গত হইয়া থাকে।

প্রজাপতি মশক প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের জন্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, উহাদের বৃত্তাকার ডিম্ব হইতে প্রথমে শুক-কীট বা Larvaর জন্ম হয়। ইহাদের আকার থাকে তখন কেন্নো বা শুঁয়াপোকা প্রভৃতির ন্যায় লম্বা। বচ্চাবস্থায় উহাদের কেহ কেহ (মশকাদি) জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, কেহ বা পাতায় পাতায় ভ্রমণ করে। ঐ সকল শুককীটই পরে প্রজাপতি মশক প্রভৃতি জীবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্তন হইতে ইহারা কোন্ প্রকার জীব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝা গিয়া থাকে।

[এই সকল রূপান্তরক্ষম জীব সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুদের যে সম্যক ধারণা ছিল তাহা আমি প্রাণীদিগের জনন-বিভাগ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। যতদূর বুঝা যায়, প্রাচীন হিন্দুগণ এই সকল বিষয়ও তাহাদের সৃষ্টিক্রম মতবাদ প্রতিষ্ঠাকালে বিবেচনা করিয়াছিলেন।]

মধ্যবর্তী জীবদিগের মধ্যে হাঁসঠুঁটো Duckbill এবং কীট-ভুক বা Anteater প্রভৃতি জীবকেও ধরা হয়। সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী জীবদিগের বা পক্ষীর উদ্ভবের সময় যে-সকল মধ্যবর্তী জীব জন্মগ্রহণ করে ইহারা তাহাদেরই বর্তমান বংশধর। ইহারা স্তন্যপায়ী হইলেও ইহাদের কাহারও কাহারও পক্ষীজীবের ন্যায় চঞ্চু আছে এবং ইহাদের কেহ কেহ

বাচ্চার বদলে ডিম প্রসব করে। এইরূপ এক জীব হইতেই সম্ভবত পরবর্তীকালে কাঙারু প্রভৃতি তদপেক্ষা উন্নত স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি হয়। কাঙারু জীবেরা ডিম্ব প্রসব না করিলেও উহারা অপরিণত শাবক প্রসব করে। এই অপরিণত শাবকদের ধারণ করিবার জন্য ইহাদের উদরের নিম্নে এক প্রকার চর্ম পেটিকা আছে। ইহাদের শাবকদের বর্ধনের কিছু অংশ জরায়ু মধ্যে ও কিছু অংশ ঐ চর্ম পেটিকাতে ঘটিয়া থাকে। ইহার পর এই স্তন্যপায়িগণ আরও উন্নত হইয়া উচ্চ স্তন্যপায়ী হইলে উহাদের শাবকদের দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে থাকে। এই উচ্চ স্তন্যপায়ীদের আকৃতির সহিত উহাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপদের আজ আর বিশেষ সাদৃশ্য নাই। অপর দিকে পক্ষীকুলও এই সরীসৃপ জীব হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য শাবক বা ভ্রূণ অবস্থায় কোনও কোনও পক্ষীর দাঁত দেখা গিয়াছে। পরে এই দাঁত বিমুক্ত হইয়া উহাদের ঠোঁট পুরাপুরি পক্ষী চঞ্চুতে পরিণত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া মাটি খুঁড়িয়া আমরা এমন বহু প্রাচীনকালের পক্ষী বা পক্ষীর অনুরূপ জীবের কঙ্কাল পাইয়াছি, যাহাদের তখনও পর্যন্ত দাঁত বর্তমান ছিল। মানব যে বানররূপ জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাব প্রমাণস্বরূপ জন্মের পর মানব-শিশুর পায়ের চেটো বানরের পায়ের ন্যায় আজও ফ্লেক্সিবেল দেখা যায়।

উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীত সৃষ্টিবাদ সম্পর্কীয় আরও বহু প্রমাণ আছে। ইহাদের একটি প্রমাণ জীবদিগের instinct বা সহজাত প্রেরণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইলিশ ও বিলাতের ইল (Ell) মাছের কথা বলা যাইতে পারে। ইলিশ মাছ সমুদ্রের মাছ হইলেও পুরাকালে উহারা নদীর মিষ্ট জলে বাস করিত। এইজন্য বাচ্চা পাড়িবার সময় তাহারা প্রতি বৎসর সমুদ্রের লবণ জল ত্যাগ করিয়া নদীর মিষ্ট জলে ফিরিয়া আসে। বাচ্চা

পাড়িয়াই তাহারা পুনরায় সমুদ্রে ফিরিয়া গিয়া থাকে এবং পরে উহাদের বাচ্চারাও তাহাদের অনুগামী হয়। অপর দিকে ইল মাছ আসলে ছিল সমুদ্রের মাছ, কিন্তু পরে তাহারা নদীর মিষ্ট জলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। এইজন্য আজও তাহারা অনুরূপভাবে বাচ্চা পাড়িবার সময় সমুদ্রে পাড়ি দিয়া থাকে। বাচ্চা পাড়িবার সময় জন্মভূমির কথা স্মরণ হয় বলিয়াই তাহারা এইরূপ বিপদ বরণ করিয়াও স্থানান্তরে দল বাঁধিয়া প্রস্থান করে। সম্ভবত এই কারণেই নারীরাও সন্তান প্রসবকালে পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই পছন্দ করিয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুগণও জীবদিগের এই প্রেরণা বা ইন্‌ষ্টিক্‌ট্ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন যে, বৃহৎ মৎস্যগণ ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং মৎস্যদিগের এই স্বভাব সাধারণভাবে মনুষ্যদিগের মধ্যেও দেখা গিয়া থাকে। এইজন্য রাজার অভাবে অরাজকতা দেখা যাইলে, সবল মানুষ দুর্বল মানুষকে উৎপীড়ন করে। এইজন্য প্রাচীন হিন্দুরা দেশে অরাজকতা হইলে উহাদের "মৎস্য-ন্যায়" বলিতেন।

জীবদিগের এই ইনিষ্টিঙ্কটের প্রভাব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ বহুবিধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মনুষ্যের সহিত শ্বাপদগণও যদি আশৈশব পুরুষানুক্রমে বাস করে, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্যোচিত ইনিষ্টিঙ্কট্ প্রাপ্ত হয়। আশৈশব পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এই জন্য দেখা গিয়াছে যে, বৌদ্ধ-মঠগুলিতে "চটক্" পক্ষিগণ মনুষ্যের হাতের নাগালের মধ্যে নির্ভয়ে বাসা বাঁধিলেও মঠগুলি বাহিরে ঐরূপ কার্য তাহারা কখনও করে নাই। প্রাচীন তপোবনসমূহে বনানীর মধ্যে আর্য ঋষিগণ এই একই কারণে শ্বাপদগণের সহিত বংশানুক্রমে বাস

করিতে পারিয়াছিলেন। অধুনাকালেও দেখা যায় যে, পল্লী-অঞ্চলের কয়েকটি পরিবারের সহিত দু'একটি বিষাক্ত গোক্ষুরা "বাস্তু সর্প" নামে অভিহিত হইয়া পুরুষানুক্রমে একত্রে বসবাস করিতেছে এবং কোন পক্ষই কোন পক্ষের কোনও ক্ষতি বা অনিষ্টের (ধর্মীয় কারণে) চিন্তা করে না। সম্প্রতি পুরী তীর্থক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে সমস্ত বানর সরকারী আদেশে হত্যা করা হইলে উহাদের অবশিষ্ট কয়েকটি বানর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে আশ্রয় লয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন প্রেরণা তাহারা অর্জন করিরাছে যে, ঐ মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিবার কোনও চিন্তাও তাহারা করে না। জীবগণ যে মনুষ্যোচিত ইনিষ্টিঙ্কট্ অর্জন করিতে পারে তাহা কুকুর-প্রতিপালকগণ ভালরূপেই জানেন।

উপরোক্ত এই ইনিষ্টিঙ্কট্ সমভাবে ও সমপর্যায়ে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে দেখা গিয়ে থাকে। ইহা হইতে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, মনুষ্যগণ মনুষ্যেতর জীব হইতেই কালক্রমে জাত হইয়াছে।

এই বিবর্তনবাদ প্রমাণ করিবার জন্য বর্তমান কালে কয়েকটি রাসায়নিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন এক একটি বর্ণহীন রক্তসার বা blood-serum প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহা নিকট আত্মীয়ের দেহে প্রবিষ্ট করাইলে উহা যত শীঘ্র বিনষ্ট হয়, দূর আত্মীয়ের দেহে প্রবেশ করাইলে উহা তত শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। এই রক্ত-সার বিভিন্ন জীবের দেহে প্রবেশ করাইয়া কোন জীবটি কাহার কত নিকট আত্মীয় তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই পরীক্ষা সর্বপ্রথম করেন কেমব্রিজের প্রোফেসার নাটাল (Nuttall)।

সৃষ্টিক্রমের অপর এক প্রমাণ হইতেছে গোত্রানুক্রম। ইংরাজীতে ইহাকে আটাভিজম্ (Atavism) বলা হইয়া থাকে। পিতৃ বা

মাতৃকুলের কাহারও দেহের বর্ণ শ্বেত দেখা যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ ঐরূপ এক কৃষ্ণকায় বংশে একটি শ্বেতবর্ণ শিশুর জন্ম হইতে দেখা গেল। এইরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, ইহাদের কোন এক উর্ধ্বতম পুরুষের দেহের বর্ণ শ্বেত ছিল এবং এই শ্বেতবর্ণ কয়েক পুরুষ উহাদের বীজ-কোষে সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ এই অধস্তন পুরুষোদ্ভব শিশুটির মধ্যে দৈবক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপভাবে এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোনও আর্য রক্তসম্ভূত ভারতীয় পরিবারের এক পুত্রের মুখাবয়ব হুবহু চীনা জাতীয় ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, অতি প্রাচীনকালে কয়েকটি হিন্দু-পরিবারের মধ্যে মঙ্গলীয় রক্ত মিশ্রিত হইয়াছিল এবং উহা বহুকাল উহাদের বীজ-কোষে সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ এই বিশেষ বালকটির মধ্যে দৈবক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারিবারিক ও জাতি গোত্রানুক্রমের ন্যায় জৈব-গোত্রানুক্রমও দেখা গিয়া থাকে। মানুষ যে কোনও এক লোমশ জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা তাহাই প্রমাণ করে। রুশ-দেশীয় কুকুর মানুষ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচীন হিন্দুগণও এই গোত্রানুক্রমের মূল সত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণবর্ণের হয়, শূদ্র জাতীয় ব্যক্তির বর্ণ যদি কটা হয়, আর যবন জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি বামনাকার হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহাদের রক্তে অন্য জাতীয় ব্যক্তির রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে।

[অধুনাকালে 'রেডিও কারবন এজ (Age) টেষ্ট' দ্বারাও জীবের প্রশীল কঙ্কালসমূহের পারম্পারিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।]

সৃষ্টি পর্যায়—হিন্দুমতে

ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে হিন্দু সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদসমূহ এ্যাসট্রোনমী এবং ভ্রূণ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। এই উভয় শাস্ত্রসম্ভূত জ্ঞানের সহিত তাঁহারা হিন্দু গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী অনুমানেরও সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ পর্যায়ে একটির পর একটি জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিপাদ্য বিষয়টি নিম্নের ভাগবতোক্ত শ্লোক হইতে সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

তাস্বাৎসীত স্ব সৃষ্টাসু সহস্রাং পরিবৎসরকাল
তেন নারায়ণ নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবঃ
একো নানাত্বমম্বিচ্ছন্ন যোগতল্পাৎ সমুত্থিত।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা॥
য একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা।
সপ্তধা নবধা চৈব পুণশ্চৈকাদশাস্মৃত
শতঞ্চ দশদিকশ্চ সহস্রাণি বিংশতি॥
অনুপ্রতিয়ং প্রানাঃ প্রানান্তং সর্ব্বজন্তু॥
আপনপ্তমপনাস্তি নর দেবাসিবানগা॥

উপরের শ্লোকটি এবং উহার প্রাচীন ভাষ্যসমূহ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীর প্রথম জীব বীজাকারে সমুদ্রজলে সৃষ্ট হয়।

টীকাকারগণ এই বীজটিকে পৃথিবীর প্রথম এককোষ প্রাণীরূপে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ঐ সময় স্ত্রীপুরুষ ভেদ ছিল না। এই-জন্য ইহাদের মাত্র পুরুষ বা স্ত্রী বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহারা বিবিধ জীবের সৃষ্টির জন্য বারে বারে বিভক্ত হইতে থাকে। হিন্দুদের মতে এইরূপে সৃষ্ট শত শত জীব পরে একত্রে সংলগ্ন হইয়া বহু কোষ জীবের সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য এই জ্ঞান তাঁহারা ভ্রূণ শাস্ত্র হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে অনুমান দ্বারা তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, ঐরূপ পর্যায়েই পৃথিবীতে জীবসমূহ পর পর সৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা স্বচ্ছ জলের মধ্যে আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবদেরও বারে বারে বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া থাকিবেন। এই উভয়বিধ পরিদর্শন দ্বারা তাঁহারা জীবদিগের সৃষ্টিক্রম সম্পর্কীয় মতবাদের মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তাহারা বিবিধ এক-কোষ জীবদের পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কলোনি তৈয়ারী করিতেও দেখিয়া থাকিবেন। হিন্দু পরমাণু-বাদের স্রষ্টা কনাদ ও তাঁহার শিষ্যদের ন্যায় সম্ভবতঃ ভাগবতকার বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিকালে এই সকল জীবরাই পরস্পর যুক্ত হইয়া বহুকোষ উন্নত জীবসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালে এই সকল ব্যষ্টি-কোষ ঘন সন্নিবিষ্ট ও ক্ষুদ্রাকার হইয়া নিজেদের পৃথক সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিয়া একটি মাত্র জীবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই মতবাদ ভাগবতকার সুস্পষ্টরূপেই উপরোক্ত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

[বহু য়ুরোপীয় আধুনিক পণ্ডিতদের মতে পরবর্তীকালে এক-কোষ জীবের মধ্যে কয়েকটি বারে বারে বিভক্ত হইয়াও পূর্বের ন্যায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহারা একত্রে সংলগ্ন

থাকিয়া বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কনাদ প্রভৃতি হিন্দু মনীষিগণ এই সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঐরূপ শত শত জীব কালক্রমে একত্রে সংলগ্ন হইয়া বাস করার কারণে বহুকোষ জীবের সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, আমিবাস্বরূপ জীবগণই গোলাকার হইয়া ঐ ভাবে বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ মনে করিতেন যে, প্রথমে সুবিধার জন্য আমিবা হইতে কেশদা জীবদিগের সৃষ্টি হয়। উহার পর এই কেশদা জীবগণই (Flagælata) পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করিয়াছে। ঋগ্বেদের একটি বিখ্যাত সুক্তে ইহাদেরই রশ্মি (Flagælata ?) যুক্ত রেতধা (রেতঃ বা বীজধারী) জীব বলা হইয়াছে মনে হয়। ঐ সুক্তে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, এই পিণ্ডকার জীবসমষ্টির নিম্নে, উর্ধ্বে ও দুই পার্শ্বে রশ্মির ন্যায় শুয়া নির্গত হইতে দেখা (?) যাইত। তবে এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পিত কি'না তাহা বিবেচ্য। কারণ ঐরূপ দুরূহ জ্ঞান ঐ যুগে অর্জন করা সম্ভব ছিল কি'না সেই সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিতে পারে। তবে 'ভলবেক্স' জাতীয় ঐরূপ এককোষ জীবগণের কোনও পিণ্ডকার সমষ্টি (colony) তাঁহারা যদি জলের উপর দেখিয়া থাকেন তা' হইলে সে কথা স্বতন্ত্র।]

এইবার আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন হিন্দু মতবাদটির মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর প্রথম জীব ছিল এককোষ প্রাণী 'আমিবা' যাহাদের স্ত্রী পুরুষ ভেদ ছিল না। এইজন্য প্রাচীন ঋষিদের কেহ কেহ ইহাদের মাত্র পুরুষ (রেতধারী পুরুষ—ঋগ্বেদ) এবং কেহ ইহাদের মাত্র স্ত্রী বা মাতা (সুশ্রুত) বলিয়া অবহিত করিয়াছেন। এই জীব মধ্যে মধ্যে দুইভাগে

বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। এই দুইভাগের প্রতিটি ভাগও আবার দুই-ভাগে বিভক্ত হয়। কালক্রমে আত্মরক্ষা বা অন্য কোন কারণে ইহাদের কেহ কেহ গাত্রে একটি মুখাংশ এবং খাদ্য আহরণ ও সঞ্চরণের কারণে উহার নিম্নে একটি শুঁয়া বা কেশের সৃষ্টি করে। বংশ বৃদ্ধি কালে কিন্তু ইহারা এই শুঁয়া গুটাইয়া লইয়া গোলাকার হইয়া 'আমিবা'র ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিত এবং তাহার পর পুনরায় তাহারা পূর্বানুরূপ আবরণ ও শুঁয়াধারী জীবে পরিণত হইয়া যাইত। এই প্রকারের জীব আজও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের বলা হয় flagillate জীব। ইহাকেই ভারতীয় প্রাচীন বৈদ্যগণ কেশদা নামে অবহিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদে সম্ভবত ইহাকেই রশ্মিযুক্ত রেতধা জীব অর্থাৎ 'শুঁয়াযুক্ত বীজ' জীব বলা হইয়াছে। এই সকল জীবদের কেহ কেহ পরে পরস্পরের সহিত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া উপনিবেশ সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে থাকে। এইরূপভাবে বাস করায় উহাদের বংশবৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। ফলে বংশরক্ষার জন্য ঐ সকল উপনিবেশ হইতে কয়েকটি বীজ-জীব শুঁয়া গুটাইয়া গোলাকার রূপে বহির্গত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া অনুরূপ অপর আর এক ঔপনিবেশিক প্রাণীর সৃষ্টি করে। কিন্তু এইরূপভাবে একটি মাত্র বীজের পক্ষে বড় বড় উপনিবেশের জন্ম দেওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হইত না। এই-জন্য এইরূপ দুইটি বীজ একত্রে মিশিয়া অধিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া বহুভাগে বিভক্ত হইয়া অনুরূপ উপনিবেশসমূহের সৃষ্টি করিত। সকল ক্ষেত্রে একটি উপনিবেশ নির্গত দুইটি বীজ যে একত্রে মিলিত হইত তাহা নহে। বহুক্ষেত্রে একটি উপনিবেশের একটি বীজ অপর একটি উপনিবেশের একটি বীজের সহিত জলে ভাসিতে ভাসিতে

মিলিত হইত। ইহার কারণ বংশরক্ষা করিবার জন্ম উহাদের ঐরূপ মিলন ছিল অপরিহার্য। এই গোলাকার বীজ-জীব সকল ছিল গতি-হীন। এই কারণে একটির সহিত অপরটির মিলনে বহু অসুবিধা ঘটিত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পরে ইহারা দুই প্রকারের বীজ ছাড়িতে থাকে। কয়েকটি বড় গোলাকার বীজ এবং কয়েকটি শুঁয়া বা লেজসহ সরু ক্ষুদ্রাকার বীজ। এই ছোট বীজটি তাহার লেজের সাহায্যে ছুটিয়া গিয়া বড় গোলাকার বীজে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে শক্তিশালী করিত, এবং তাহার পর এই সম্মিলিত বীজ বারে বারে বিভক্ত হইয়া অনুরূপ একটি উপনিবেশ জীবের সৃষ্টি করিত। বংশ-বৃদ্ধির সুবিধার্থে যেমন ইহাদের স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছিল তেমনি খাদ্যাহরণের সুবিধার্থে ইহাদের খাদ্যনলীরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই উপনিবেশ জীবদের বাহিরের জীবদের খাদ্যহরণের সুবিধা থাকিলেও উহাদের অভ্যন্তরের জীবদের খাদ্যাহরণের অসুবিধা ঘটিতে থাকে। এই কারণে তাহারা উপনিবেশের মধ্যে একটি খাদ্যনলীর ন্যায় ফাঁক রাখিতে আরম্ভ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্র দুইটি হইতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাইবে। ঐ খাদ্যনলী বা ফাঁকের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইত এবং ঐ জল হইতে ভিতরের কোষ সকল আহার সংগ্রহ করিত। সম্ভবতঃ এইজন্যই আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থে খাদ্য-নলীকে মহাস্রোত এবং ধমনীসমূহকে সাধারণভাবে স্রোত নামে অবহিত করা হইয়াছে। আধুনিক স্পঞ্জিলা, সিলেণ্টেট প্রভৃতি জীব ঐরূপ এক অধুনা-লুপ্ত জীবেরই বংশধর। পরে এই পৌষ্টিক জীবদিগের কোষ সকল সংখ্যায় বহুগুণে বর্ধিত ও ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র হয়। ইহার ফলে পাতলা গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া একটি কোষ হইতে অপর কোষে খাদ্য প্রেরণ সম্ভব হইতে থাকে। এই কারণে উহাদের বাহিরে কোষ-গুলি শুঁয়া হারাইয়া গোলাকার হইয়া পড়ে। কিন্তু খাদ্যনলীর চতুর্দিকের
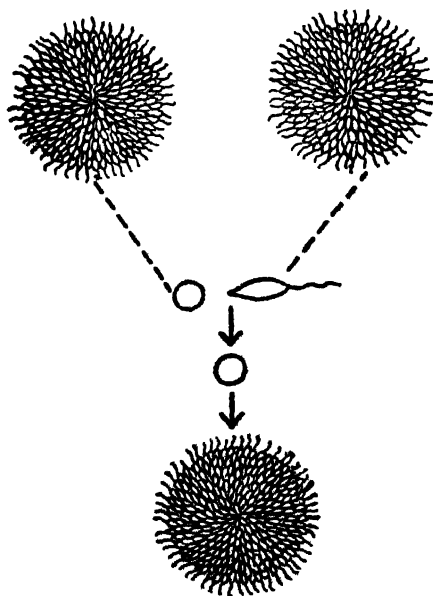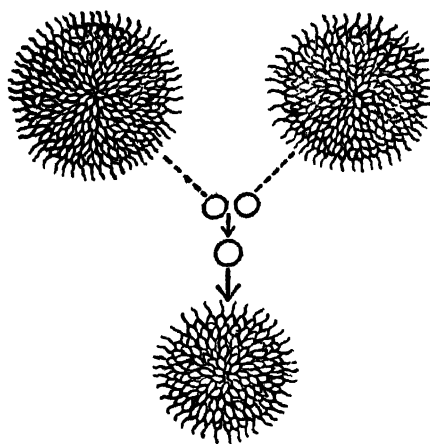
কোষগুলির শুঁয়া খাদ্যাহরণের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কারণে আজও জীবদিগের খাদ্যনলীর চতুর্দিক ঘিরিয়া শুঁয়াসহ কোষ দেখা যায়।

[এতদ্ব্যতীত এই সকল জীবদিগের ভিতরের কোষগুলি বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষা স্বভাবতঃই অধিক আহার পাইত। এইজন্য জীব-

দেহের অভ্যন্তরের কোষস্তরটি উহার বাহিরের কোষস্তর অপেক্ষা বর্ধিত ও লম্বা হইয়া পড়ে। ইহার ফলে স্থান সঙ্কুলনের জন্য উহা ক্রমান্বয়ে কুণ্ডলী
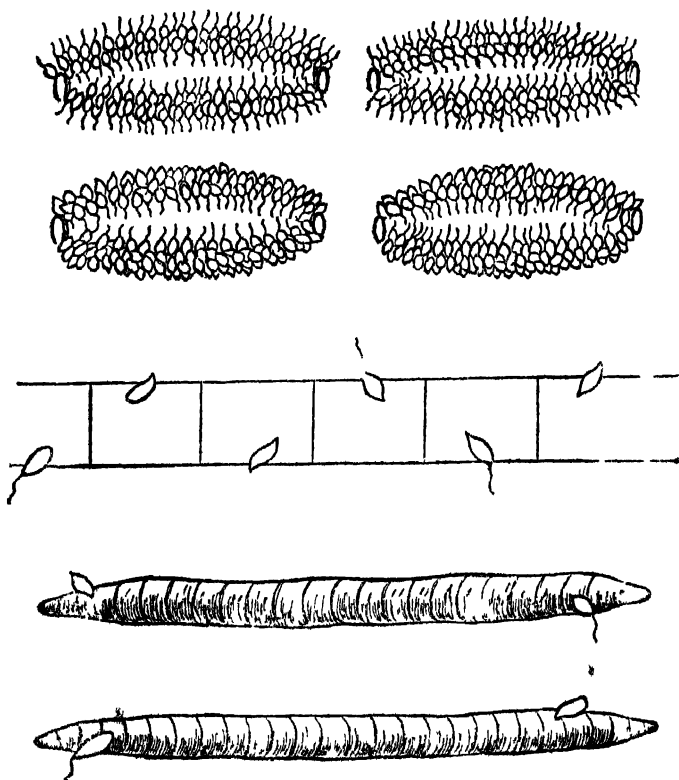
পাকাইয়া উন্নত জীবদের দেহে দৃষ্ট, স্টমাক্ ইনটেস্টাইন প্রভৃতি সম্বলিত কুণ্ডলীকৃত খাদ্যনলীর সৃষ্টি করিতে থাকে।]

উপরোক্ত পরিবর্তন ব্যতীত পৌষ্টিক জীবদিগের মধ্যে আরও একটি পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে উহাদের জনন-কোষগুলি উহাদের সারা দেহে ছড়াইয়া থাকিত। তাহাতে ঐ বীজগুলির বাহিরে আসিবার অসুবিধা হইত। এইজন্যই পরে উহাদের বিশেষ বিশেষ স্থানে বীজাধারের সৃষ্টি হয়। এই সকল বীজাধারের ছিদ্র মুখের মধ্য দিয়া সহজেই (পুরুষের ক্ষেত্রে) বীজসকল বহির্গত কিংবা (স্ত্রীর ক্ষেত্রে) প্রবিষ্ট হইতে পারিত।

[সর্বপ্রথম এই পুং ও স্ত্রী বীজ পৃথক পৃথক ভাবে পতিত হইয়া জলে ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইত। কিন্তু জীব আরও উন্নত হইলে এই স্ত্রী ও পুং জীবের জননকার্যের জন্য দৈহিক মিলনের প্রয়োজন হইতে থাকে।]

হিন্দুদের মতে এক-কোষ জীবসমূহ যেমন একত্রে মিলিয়া ঔপনিবেশিক প্রাণীর সৃষ্টি করিল, তেমনি ঐরূপ কয়টি প্রাণী অগ্রপশ্চাৎ মিলিয়া আরও বৃহৎ প্রাণীর সৃষ্টি করিত। তাঁহাদের মতে প্রথম অবস্থায় এইরূপ দুইটি বা ততোধিক ঔপনিবেশিক প্রাণী অগ্রপশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া বাস করিত এবং ইহার ফলে ইহাদের কয়েকটি মিলিয়া একটি লম্বা জীবের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুদের এইরূপ ধারণা সত্য বলিয়াই মনে হয়। যত দুর বুঝা যায এই কারণে এই লম্বা জীবের দেহ কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমে এইরূপ জীবের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে একটি স্ত্রী ও একটি পুং বীজাধারের ব্যবস্থা থাকিত, কারণ জীবদিগের দেহ-কোষগুলি একীভূত হইয়া যাওয়ায় পৃথক বীজাধারের প্রয়োজন হইয়াছিল। অধুনাকালের ফিতা ক্রিমিজীব বহুলাংশে এই প্রকরের জীব। পরে

বোধ হয় ইহাদেরই একদলের ঐরূপ প্রকোষ্ঠসমূহ অপ্রয়োজনীয় বিধায় নষ্ট হইয়া উহারা কেঁচুয়ার ন্যায় ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়; উহাদের প্রত্যেকের দেহের উপর ও নিম্নে যথাক্রমে একটি পুং ও একটি স্ত্রী বীজাধার অবশিষ্ট থাকে মাত্র, উহাদের বাকী বীজাধারগুলি বিবিধ প্রকোষ্ঠের বিলুপ্তির সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক কেঁচুয়াদি এই প্রকার জীব। ইহাদের দেহ যে পূর্বে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ তাহাদের দেহে আজও পর্যন্ত গোলগোল নূপুরের মত দাগ দেখা যায়।* জীবদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম এই কেঁচুয়ার মধ্যে সম্মুখগামী গতি পরিদৃষ্ট হয়। এই কেঁচুয়া প্রভৃতি জীব নিজেদের বারেক স্ত্রী এবং বারেক পুরুষরূপে কার্যকরি করিয়া থাকে। কিন্তু পরে অধিকতর দৈহিক উন্নতির কারণে ইহাদের পূর্বপুরুষদের কেহ-কেহ পুং-বীজাধার এবং উহাদের কেহ কেহ স্ত্রী-বীজাধার হারাইয়া ফেলিয়া প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী-পুরুষে বিভক্ত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ যে স্ত্রী সে স্ত্রী-ই এবং যে' পুরুষ সে পুরুষ-ই হইয়া যায়। আধুনিক গলদাচিংড়ি প্রভৃতি জীব এই প্রকৃতির জীব।

প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন যে, বহু এককোষ জীব একত্রে উপনিবেশিক প্রাণীরূপে বাস করার ফলে পরবর্তীকালে পরস্পর পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিরূপে যুক্ত হইয়া বহুকোষ জীবের সৃষ্টি করে, এবং ইহারও বহু পরে এইরূপ কয়েকটি প্রায় একীভূত ঔপনিবেশিক প্রাণী একত্রে অগ্রপশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া বাস করার ফলে আরও বৃহৎ

* মনুষ্য-দেহেও দুইটি প্রকোষ্ঠের চিহ্ন বর্তমান, ডায়ক্রাম উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী পার্টিসান। সম্ভবত আদিম পৌষ্টিক জীব-দেহেরও প্রকোষ্ঠগুলির পার্টিশন ভেদ করিয়া অনুরূপভাবে খাদ্যনলী বিস্তারিত ছিল। চিপিটক ক্রিমি অন্ত্রের দেহের সুপচ্য খাদ্য শোষণ করিয়া আহার করে, এইজন্য উহাদের খাদ্যনলী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাদের দেহের প্রকোষ্ঠগুলি আজও বর্তমান।

লম্বাকৃতি প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন হিন্দু মনীষীদের মতে মনুষ্যসহ প্রতিটি উন্নত জীবের দেহ বহু অণুজীবের সমষ্টি মাত্র। এইজন্য প্রাচীন ভারতে জীবের অণুত্ব কিংবা বিভূত্ব স্বীকার্য এই সম্পর্কে তর্ক বিতর্কের অন্ত ছিল না। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বেই প্রামাণ্য শ্লোকসহ আমি আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই সকল হিন্দুমতের মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যাক।

অধুনাকালেও আমরা এই সকল এককোষ প্রাণীদের বহু ভলভেক্স জাতীয় উপনিবেশ দেখিয়া থাকি। ইহারা একত্রে একটি অখণ্ড জীবের মত বাস করিলেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ কলোনি হইতে কয়েকটি অণু-কোষ বাহির হইয়া আসিয়া পৃথক জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহাদের কেহ কেহ ঐ সকল কলোনি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া পুনরায় অনুরূপ এক কলোনিরও সৃষ্টি করিয়াছে। সম্ভবত পূর্বতন (বংশানুক্রম ?) অভ্যাসজনিত ইহাদের অপত্যগণ পূর্বের ন্যায় একক জীবন যাপন না করিয়া (বিভক্ত হওয়ার পর) কলোনি জীবনই যাপন করিতে থাকে। Oyster প্রভৃতি বহু নিরস্থিক জীবগণের দেহে এই সম্পর্কে এক অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের দেহ হইতে কয়েকটি অণুকোষ বাহির হইয়া আসিয়া উহাদের খাদ্যনলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পর ঐ খাদ্যনলী হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ইহারা পুনরায় উহাদের দেহাভ্যন্তরে (tissue) প্রবেশ করে। ঐ সকল পৃথকীকৃত অণুকোষও উহাদের দেহের মধ্যে যত্রতত্র ঘুরাফিরা করিয়া প্রয়োজনমত দেহের বিভিন্নাংশে খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে, কখনও এই সকল অণুকোষকে বহির্গত হইয়া আসিয়া উহাদের দেহ এবং খোলের মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া বহিরাগত ব্যাকটিরিয়া

জীবদের ধ্বংসকার্যে রত হইতেও দেখা যায়। কেঁচুয়া জীবদের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল জীবেরও দেহ হইতে কয়েকটি অণুকোষ (creepling cells) অনুরূপভাবে অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া উহাদের চর্মের উপরিভাগে আসিয়া উহাদের চর্মের পরিষ্করণ কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রভৃতি জীবদের দেহের কোষ সকল ঘনসন্নিবেশিত হওয়ায় উহারা তাহাদের সত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহাদের জনন-কোষ এবং রক্তের শ্বেতকণাসমূহ তাহাদের পৃথক সত্তা আজও পর্যন্ত হারায় নি। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি জীবের জন্ম সম্পর্কীয় ব্যবস্থাসমূহও এই সম্পর্কে প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্তনপা জীবসমূহের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কোষ সমষ্টি উহাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সৃষ্টি করে। যেহেতু উহাদের কয়েকটি বিশেষ কোষ-সমষ্টি দ্বারা বাহু সৃষ্টি হইয়াছে সেইহেতু উহাদের ঐ হাত কাটিয়া দিলে উহার আর পুনর্গঠন হয় না। কিন্তু নিম্নতম অস্থিক জীবদিগের দেহকোষ সকল এখনও ঐরূপ সমষ্টিগতভাবে পৃথকীকৃত হয় নাই। এইজন্য টিক্‌টিকির লেজ কাটিয়া দিলে উহার পুনর্গঠন আজও সমাধা হয়। অপর দিকে Sea-squirts জীবদিগের দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাদের ঐ প্রতিটি খণ্ড হইতেই অনুরূপ দুইটি গোটা জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল জীব 'বাডিঙ' (Bud) দ্বারা অনুরূপ এক জীবের সৃষ্টি করে তাহাদেরও উদাহরণ রূপে এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে এক্ষণে নখ, চুল, চর্ম ও অস্থি (ক্ষত বা ভগ্ন হইলে) আজও পর্যন্ত পুনর্গঠিত হইতে দেখা যায়। নিরস্থিক জীবদের ক্ষেত্রে অক্‌টোপাস জীবদের কোনও বাহু কর্তিত হইলে উহার বাহু গঠন হইতে দেখা যায়। অনুরূপ-ভাবে তারা-মাছের দেহ মধ্যস্থল হইতে কাটিয়া দুইভাগ করিয়া দিয়া

দেখা গিয়াছে যে, উহাদের ঐ দুইটি ভাগ হইতেই পূর্বতন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ দুইটি অনুরূপ তারা-মাছের সৃষ্টি হইয়াছে। 'সেগমেনটেড ওয়ার্ম' জীবদের দৈহিক ব্যবস্থা হিন্দুমতটি অধিকতররূপে সমর্থন করিবে। কয়েকটি জলজ-পোকার (Autolytus Cormntus) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উহাদের পিছন দিকে দুইটি হইতে চল্লিশটি পর্যন্ত পৃথক জীব প্রত্যেকের আপন আপন মস্তক সহ একীভূত ভাবে পর পর সংলগ্ন থাকিয়া একটি গোটা জীবের ন্যায়ই চলাফিরা করে। কিন্তু ইহাদের জীবন পথের কোনও এক সময় পিছনের জীবগণ উহাদের সম্মুখের নেতৃজীবটির আদেশ আর না মানিয়া উহা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পৃথক পৃথক জীব রূপে জীবন যাপন করিতে সুরু করে।
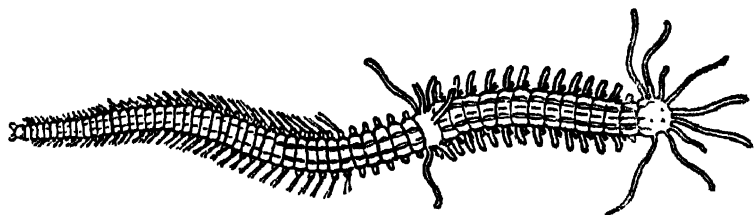
এইরূপ একটি জীবের প্রতিকৃতি উপরের চিত্রে উদ্ধৃত করিয়াছি। সম্যক রূপে উহাকে পরিলক্ষ্য করিলে আমার বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাইবে। চিপিটক [বহু Planaria কিন্তু সকলে নহে] কৃমিদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বর্ধনের পর সহসা এক সময়ে উহাদের পিছনের অংশ সম্মুখের অংশের সহিত আর অগ্রসর না হইয়া ভূমি চাপিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ উহারা এইভাবে টানাটানি করিয়া পরস্পর হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি পৃথক জীবে পরিণত হইয়া যায়।

কেঁচুয়া জীবগণের দেহও দুই টুকরা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ দুইটি টুকরা হইতেই দুইটি পূর্বানুরূপ গোটা কেঁচুয়া জীবের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে।

[এই পুস্তকের ২৮৮ পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি যে, প্রাচীন হিন্দু-পণ্ডিত-দের এক দল বলিতেন যে, জীবের অণুত্ব (একক প্রাণ) স্বীকার্য এবং উহাদের অপর দল বলিতেন যে, জীবের বিভূত্ব (সমষ্টিগত তথা ব্যাপ্ত প্রাণ) স্বীকার্য। ঐ নিবন্ধে আমি ইহাও বলিয়াছি যে, ঐরূপ তর্ক-বিতর্ক কদাপি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে স্থান পায় নাই। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে H, G. Wells প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রচিত সায়েন্স অব লাইফ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (চতুর্থ অধ্যায়) এই একই প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, জীবদেহ ইন্‌ডিভিজুয়ালিটির (Supressed Indivi-suality) পর্যায়ে পড়ে না কমিউনিটির (Cell-Community) পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের এই প্রশ্ন সম্বন্ধে হিন্দু-মনীষিগণ বহু পূর্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন।]

এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণ করা যায় যে, পূর্বকালে কয়েকটি জীব পরস্পর অগ্রপশ্চাৎ সংলগ্ন (একটির মুখের সহিত অপরটির পিছন) হইয়া অধুনা দৃষ্ট বহু-কোষ জীবের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং উহারও বহু পূর্বে ঐ সকল জাব বহু অণু জীবের সমষ্টি দ্বারা অনুরূপভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল। এইভাবে আমরা নির্ভুলরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুগণ এই সম্পর্কে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা একেবারে উপেক্ষা করা কোনও ক্রমেই উচিত হইবে না।

[এই পৌষ্টিক জীবগণ আকারে বর্ধিত হওয়ার পর উহাদের খাদ্যনলী বা "মহাস্রোত' হইতে বহু সঙ্কীর্ণ নলী ও উপনলী উহাদের শাখা-প্রশাখা সহ সারাদেহে ছড়াইয়া দেহের প্রতিটি কোষে খাদ্য সরবরাহ করিত

এবং উহাদের কতকগুলি দূষিত দ্রব্য ঐ সকল কোষ সমষ্টি হইতে বহন করিয়া বাহিরে অপর এক ভিন্ন পথে বহির্গত করিয়া দিত। ইহার পর জীব আরও উন্নত হওয়ায় কালক্রমে এই সকল উপনলী ও উহাদের শাখা-প্রশাখা রক্ত-ধমনী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সম্ভবত এইরূপ ধারণার জন্যই আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থে এই সকল রক্ত ধমনী ইত্যাদিকে কোন এক বাগিচার জল সরবরাহের নালা-উপনালার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরও পরে এই রক্ত চলাচলের ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সমাধা হওয়ার জন্যই হৃদ্‌পিণ্ড (Pumping station) ফুস্‌ফুস্‌ (Refinery) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ভাগবত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, রস, রূপ, গন্ধ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের দেহের কয়েকটি করিয়া কোষ পরিবর্তিত হইয়া গন্ধেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতির সৃষ্টি করে।* অর্থাৎ পৌষ্টিক জীবদের কয়েকটি সাধারণ কোষ রস-কোষ, গন্ধ-কোষ প্রভৃতিতে (রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রস, গন্ধেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধ ইত্যাদি, ইতি ভাগবত) রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই সকল কোষ জনন-কোষের ন্যায় প্রথমে ঐ জীবদিগের সারা দেহের উপরিভাগে ছড়াইয়া ছিল। আজও পর্যন্ত যে রসকোষসমূহ মৎস্য প্রভৃতি জীব-দেহের সারা অঙ্গে অবস্থান করে তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। পরে উন্নত জীবদের দেহের সম্মুখের অংশের ব্যতীত অন্যান্য অংশের কোষেন্দ্রিয় সকল নিষ্প্রয়োজন বিধায় (স্পর্শ-কোষ ব্যতীত) বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্বে এই সকল ছড়ানো কোষেন্দ্রিয় হইতে

---

* এইখানে উল্লেখযোগ্য যে সৃষ্টির প্রকরণ সম্বন্ধে বলিবার সময় ভাগবতকার চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা না বলিয়া উহাদের স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়, গন্ধেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ ঐসময় জীবদিগের সুগঠিত চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নাই।

যে-যে পথে উহাদের তড়িত-বার্তা দেহাভ্যন্তরে প্রেরিত হইত, সেই সেই পথে অবস্থিত সাধারণ কোষগুলি* স্নায়ু প্রভৃতিতে এবং উহাদের সংযোগ স্থলগুলি স্নায়ু-পিণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই সকল স্নায়ু-পিণ্ডের সংযোজক দণ্ডকে আমরা স্নায়ু-দণ্ড বলিয়া থাকি। পরে জীবদেহের সম্মুখাংশের একটি স্নায়ু-পিণ্ড অতি ব্যবহারের কারণে বর্ধিত হইয়া মস্তিষ্কের সৃষ্টি করিয়া উন্নত জীবের জন্ম দেয়।]

কালক্রমে মস্তিষ্কসহ প্রধান ইন্দ্রিয়াধারসমূহ জীবদিগের সম্মুখাংশে স্থান গ্রহণ করার একটি কারণও হইয়াছিল। জীবদিগের ফরওয়াড্ মুভমেণ্ট-এর জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্বে পৌষ্টিক জীবগণ তাহাদের মণ্ডপাকার দেহাকৃতির কারণে যেদিকে ইচ্ছা পরিক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু কেঁচুয়া প্রভৃতি জীবে আসিয়া ইহারা এই ফরওয়াড্ মুভমেণ্ট আয়ত্ত করে। গলদাদি জীবে আসিয়া উহাদের সম্মুখ গতি পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তাহার ফলে চক্ষুসহ মাথার সৃষ্টি হইতে থাকে।

এই সকল নিরস্থিক বা 'অনস্থিকা' জীবগণ কখনও জলে থাকিয়া, কখনও স্থলে উঠিয়া, কখনও বা গর্তাদিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বাসস্থানের প্রভেদ হেতু বিভিন্ন আকারের হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বহু দেহাগত সাদৃশ্য আজও বর্তমান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শামুক জীবের কথা বলা যাইতে পারে। উহারা আত্মরক্ষার্থে বা অন্য কোনও কারণে দেহ-নির্গত রসের সাহায্যে

---

*সর্বপ্রথমে জীবের চর্মই স্নায়ুর কাজ করিত। কারণ ঐ সময় বহির্জগতের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল না। পরে এই প্রাথমিক ব্যবস্থা বৃহতি স্নায়ু-মণ্ডলীর সৃষ্টি করে।

কিংবা বাহিরের কোষগুলি শক্ত করিয়া কোষ বা খোলের সৃষ্টি করিয়া কুণ্ডলী আকার প্রাপ্ত হইলেও উহাদের দেহ ঐ কোষ হইতে বাহির করিয়া লম্বা করিলে তাহাদেরও অন্যান্য নিরস্থিক জীবদের ন্যায় লম্বা জীব দেখায়। তবে বহু জীবদেরই দেহ পূর্ববর্ণিত কারণে কয়েকটি অংশে (Segments) বিভক্ত। তেঁতুলে বিছা প্রভৃতি জীবদের বিভাগ বা Segments বেশী, কাঁকড়া বিছার ক্ষেত্রে উহারা একত্রিত হইয়া স্বল্প বিভাগে বিভক্ত। কাঁকড়া জীবের দেহের বিভাগ একটি মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নয়। গর্তে বাস করার সুবিধার জন্য উহাদের পদাঙ্গসহ নিম্নাংশ বা প্রকোষ্ঠ উপরে উঠাইয়া দেহের দাড়া যুক্ত উপরাংশের সহিত পুরুষানুক্রমে সংযুক্ত রাখায় কালক্রমে ঐ দুইটি বিভাগ ঘন-সংলগ্ন হইয়া একটি বিভাগের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব বাসস্থানের প্রভেদ হেতু এক একটি জীব বংশ এক এক প্রকার দেহাকৃতি লাভ করিয়াছে। এই বিশেষ সত্যটি যে প্রাচীন হিন্দুগণ অবহিত ছিলেন তাহা নিম্নের শ্লোক হইতে বুঝা যায়। এই সূক্ত বা শ্লোকটির রচয়িতা ঋষি দীর্ঘতমা—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৫ ; ২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব।

সাকম্‌জানাম্‌ সপ্তমম্‌ আহুরেকজম।

* * * * *

তেষাম্‌ ইষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ।

স্থত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥

তাৎপর্য্য ঃ—সহজন্মাদিগের মধ্যে সপ্তমও সেই আদিমূল হইতে উৎপন্ন। বাসস্থানের বিভিন্নতা হেতু তাহাদের আকৃতিও বিভিন্ন রূপ হইয়া গিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে উপরোক্ত কোনও একটি নিরস্থিক জলবাসী

জীব হইতে পরে বাসস্থানের প্রভেদ হেতু আসফিয়কসাস্ জাতীয় একটি জীবের সৃষ্টি হয়। ইহাদের মেরুদণ্ড নাই, সেইস্থানে নোটকর্ড নামে স্থূল মাংসের একটি অনুরূপ দণ্ড আছে। সেই দণ্ডের চারি পাশের বা বা পিছনকার কোষ সমষ্টি পরে শক্ত হইয়া মেরুদণ্ডের সৃষ্টি করে এবং ঐ নোটকর্ডটি বর্তমান স্নায়ু-দণ্ডে পরিণত হয়। এই জাতীয় একটি তৎকালীন জীব নদীর খর-স্রোতের সহিত বংশানুক্রমে যুদ্ধ করার ফলে উহারা মেরুদণ্ডের সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে মৎস্যানুরূপ জীবে পরিণত হইয়া যায়।

এই সময় মৎস্যই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। পরে কোনও এক নৈসর্গিক বিপ্লবের কারণে পৃথিবীর নদী-নালা ও জলা শুকাইয়া যাওয়ায় তাহাদের কেহ কেহ বাধ্য হইয়া ডাঙ্গায় আসিয়া পড়ে। আজও পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে একপ্রকার মাছ দেখা যায় যাহারা খাদ্য-অন্বেষণের জন্য স্বল্পকাল ডাঙ্গায় আসে। জল হইতে শ্বাস লইবার জন্য মাছের Gill বা কান্‌কো আছে। বায়ু হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য ফুস্‌ফুস্ তাহাদের নাই। এই অবস্থায় তাহাদের কেহ-কেহ স্বল্প জলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং উহাদের কেহ-কেহ বারে বারে ডাঙ্গায় উঠিয়া তাহাদের কান্‌কোর পাশের পাতলা চামড়া দিয়া বায়ু হইতে শ্বাস লইবার চেষ্টা করে। কৈ, মাগুর, কুঁচে প্রভৃতি জলে ও স্থলে সমভাবে থাকিতে সক্ষম কয়েকটি মৎস্য আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মাছের পটকাগুলিই ভিন্নরূপে ব্যবহারের কারণে ফুস্‌ফুসে্ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বিলাতে এক প্রকার মাছ আছে তাহাদের lung fish বা ফুস্‌ফুস্ মাছ বলে। জল হইতে শ্বাস লইবার কান্‌কো এবং বায়ু হইতে শ্বাস লইবার ফুস্‌ফুস্ এই উভয় ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে আছে। জলের জন্তুর ডাঙায়

চলা-ফেরার অসুবিধা আছে। এই সময় তাহার ডানার সাহায্যেই চলাফেরা আরম্ভ করে। ইহার ফলে বহু পুরুষ পরে এই ডানাগুলি শক্ত ও মোটা হইয়া চারিটি পায়ে পরিণত হইয়া যায়। জলে ইচ্ছামত দেহশুদ্ধ মাথা ঘুরান যাইত। কিন্তু স্থলে সমস্ত দেহ সহ মাথা ঘুরানরও অসুবিধা আছে। সুতরাং চারিদিক দেখিবার জন্য তাহারা কেবলমাত্র মাথাটিই ঘুরাইবার চেষ্টা করে। কয়েক শত পুরুষ পরে তাহাদের এই চেষ্টা সফল হয় এবং মাথা দেহ হইতে পৃথক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তাহারা তখন হইয়া যায় একপ্রকার সরীসৃপ জাতীয় জীব।

পৃথিবীতে এই সরীসৃপই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, মাছের উপর তাহাদের স্থান। এই সকল চতুষ্পদ সরীসৃপদের কোনও কোনও বংশ গর্তে ঢুকিয়া বাস করিতে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের পা বুকের সহিত লেপট্াইয়া দিয়া বুকে হাঁটিতে হইত। এইরূপে পায়ের আর কোনও কাজ না থাকায় বা উহাদের অব্যবহারের কারণে বহু পুরুষ পরে পা চারিটি দেহের সহিত জুড়িয়া গিয়া শেষে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। দেহ-ব্যবচ্ছেদের পর সাপের পূর্বলুপ্ত পায়ের স্পষ্ট চিহ্ন আজও আমরা দেখিতে পাই। আমেরিকায় একপ্রকার সাপ আছে তাহাদের পিছনের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পা-দুইটি এখনও লুপ্ত হয় নাই। এই সকল সরী[illegible]দের মধ্যে যাহারা স্ফীতবক্ষ হইয়া গোলাকার গহ্বরে বাস করিতে থাকে, তাহারা কচ্ছপ হইয়া যায় এবং উহাদের যাহারা পরে পুনরায় জলে নামে তাহারা কুমীর জীবে পরিণত হয় এবং উহাদের বাকীগুলি যাহারা পূর্বের ন্যায় ভূমির উপর বাস করিতে থাকে তাহারা টিকটিকি গোহাড়গিল প্রভৃতি জীব-ই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এমনই যে যাহা হারানো যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। এইজন্য কুম্ভীর জীবগণ মৎস্যের ন্যায় অধিকক্ষণ

জলে বাস করিতে অপারগ। তাহাদের মাঝে মাঝে জলের উপর মাথা তুলিয়া নিঃশ্বাস লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

[অনেকের মতে মাছ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রথমে ভেকাদি উভচর জীবের সৃষ্টি করে। এই উভচর জীবের সকল গোষ্ঠীই ভেকের মত দেখিতে নয়, উহাদের কয়েকটি বান মৎস্যের মত দেখিতে। ভেক শাবক বা বেঙাচি অবস্থায় মাছের মত দেখিতে হয় এবং জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। এই সময় তাহাদের মাছের মত কান্‌কো ও লেজ থাকে, পরে এই কান্‌কো ও লেজ অপসারিত করিয়া তাহারা ব্যাঙ-এ পরিণত হয়। মাছ হইতে সরীসৃপের উৎপত্তির সময় যে-সব মধ্যবর্তী বা মাঝামাঝি জীবের জন্ম হইয়াছিল ব্যাঙ বা ভেক তাহাদের একটি।

ঐ সময় এই উভচর জীবগণ ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সরীসৃপ-দের জন্মের পূর্বে তাহারাই পৃথিবীর জলাভূমিসমূহের অধীশ্বররূপে বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে যে পৃথিবীতে ২৫০,০০০ প্রকার যোনীর পতঙ্গ, ৩,০০০ প্রকার মৎস্য, ১০,০০০ প্রকার পক্ষী আছে, সেইখানে এক্ষণে মাত্র ১,০০০ প্রকার এই উভচর জীব দেখা যায়।

ইহার পর নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এই সরীসৃপ জাতি হইতে প্রায় একই সঙ্গে দুই প্রকার জীবের উৎপত্তি হয়। যথা:— পশু (স্তন্যপায়ী) ও পক্ষী। এই সময় সহসা বোধ হয় পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া যায় এবং ইহার ফলে পৃথিবীর এক অংশের উষ্ণতা কমিয়া উহা শীতল হইয়া পড়ে। সরীসৃপ জাতির রক্ত পক্ষী ও স্তন্যপায়ী অপেক্ষা অনেক কম উষ্ণ। সরীসৃপরা সেইজন্য শীত মোটেই সহ্য করিতে পারে না; গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের আধিপত্য বেশী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের কেহ কেহ শীতকালে গর্তের ভিতরে থাকিয়া খাদ্য ব্যতীত বাঁচিয়া থাকে। এই সময় তাহারা মৃতের ন্যায়

জীবন যাপন করে। পৃথিবীর এই অংশ সহসা শীতল হইয়া যাওয়ায় ইহাদের কতক পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে যাইয়া বাস করে, কতকগুলি কুম্ভীরের ন্যায় জলে আশ্রয় নেয় কারণ জলের তলদেশে তাপের সমতা আছে। তবে খাদ্যান্বেষণ বা অন্য কোন কারণেও তাহাদের পক্ষে জলবাসী হওয়া অসম্ভব নয়। প্রমাণস্বরূপ গ্যালোফিগাস টিকটিকিরা অধুনাকালেও খাদ্যান্বেষণের জন্য জলে নামে। কেহ-কেহ নানা কারণে সর্পের ন্যায় গর্তে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু উহাদের অপর একটি দল প্রাণের দায়ে মরিয়া হইয়া উহাদের শীতল রুধিরকে উষ্ণতর করিয়া শীতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়। * এই উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ সময়েই তাহাদের ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত। ছুটাছুটিতে শরীরের রক্ত গরম থাকে, শীতও লাগে কম। এইজন্য নানা প্রণালীতে তাহারা ছুটাছুটি করিত। সরীসৃপরা পা থাকা সত্ত্বেও চলিবার সময় সমগ্র পা ও বুক মাটিতে ঠেকাইয়া চলে। ছুটিবার সুবিধার জন্য এই সময় তাহাদের দেহটিকেও পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে হয়। দেহটি ভূমি হইতে উপরে উঠায় উহাদের স্থূল লেজটি পাতলা ও ছোট হইয়া যায় এবং এই একই কারণে তাহাদের পা চারিটিও শক্ত ও সরল হইয়া উঠে। এইভাবে বংশানুক্রমে বসবাস করার ফলে উহাদের একদল নিম্ন স্তন্যপায়ী জীবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তবে এই সম্বন্ধে বহুবিধ

* এই সময় সরীসৃপদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল যে, পৃথিবীর এমন কোনও স্থান ছিল না যেখানে তাহাদের দেখা যাইত না। পৃথিবী হঠাৎ শীতল হওয়ায় লক্ষ লক্ষ সরীসৃপদের মৃত্যু ঘটে। সেই-যুগের মাটি খুঁড়িয়া উহাদের রাশি রাশি প্রশীল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

মতামত আছে। অন্যান্য মতের সহিত আমার স্বকীয় মত সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নিবন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক বর্তমানকালীন ক্যাঙারু কীটভুক, হাঁসঠুটো প্রভৃতি মধ্যবর্তী জীবগণ উহাদেরই বংশধর। ইহাদের মধ্যে হাঁসঠুটো প্রভৃতি জীবগণ এখনও সরীসৃপদের ন্যায় ডিম্ব প্রসব করে।

এই সরীসৃপদের একটি বংশ নিম্ন স্তন্যপায়ীদের জন্ম দেয়, কিন্তু উহাদের অপর এক বংশ জন্ম দেয় পক্ষীজীবদের। যে সকল ডাইনো-সিরাসের ন্যায় সরীসৃপ দুই পদের উপর ভর দিয়া হাত উপরে উঠাইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করে তাহারাই পরে পক্ষী জীবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। উহাদের হাত দুইটি ক্রমাগত বায়ুর সহিত সংঘাতের কারণে বহু পুরুষ বাদে পাখায় পরিণত হয়। তবে ভূমিতে হাত উঠাইয়া ছুটাছুটি করায় কিংবা বৃক্ষের শাখায় শাখায় অনুরূপভাবে লাফালাফি করায় পক্ষীর উদ্ভব হয় তাহা আজ বলা বড় শক্ত। উড়ার সুবিধার জন্য উহাদের অস্থিগুলি ফাঁপা এবং উহাদের দেহে বায়ুস্থলী (air sac) বর্তমান। প্রথমাবস্থার পক্ষীদের সহিত সরীসৃপদের আরও বহু সাদৃশ্য ছিল, এমন কি ঐ সময় উহাদের দাঁতও অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু প্রয়োজনের অভাবে উহা পক্ষী-চঞ্চুতে পরিণত হয়। মাটি খুঁড়িয়া আমরা পক্ষী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী বহু জীব-কঙ্কাল আজও পাইয়া থাকি। পরে ঐ সকল পক্ষী প্রকৃত পক্ষীর জন্ম দেয় এবং সরীসৃপ বংশের অপর শাখা হইতে উদ্ভূত নিম্ন স্তন্যপায়ীরা জন্ম দেয় উচ্চ স্তন্যপায়ীদের।

বস্তুত পক্ষে এই নিম্ন স্তন্যপায়ী হইতেই উচ্চ স্তন্যপায়ীদের জন্ম হয়। নিম্ন স্তন্যপায়ীরা সম্ভবত লাফাইয়া চলিত। উহাদের সব কয়টি পা সমান ছিল না মনে হয়। তবে এই সকল জীবরা আরও উন্নত হইয়া উচ্চ স্তন্যপায়ীর জন্ম দেয়। এই উচ্চস্তনপা জীবগণের পদচতুষ্টয় সমান উচ্চ ছিল এইজন্য উহারা সমান্তরাল বা তীর্যক গতিতে আহার গ্রহণ
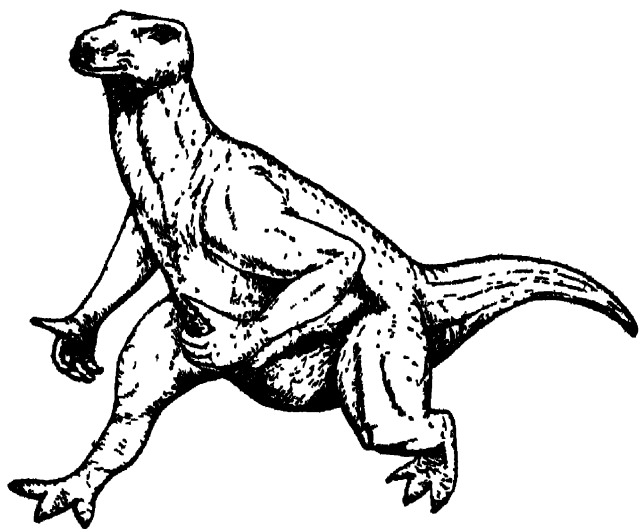
ডাইনোসিরাস জাতীয় ক্রমলুপ্ত জীব (পক্ষী জীবের উদ্ভব)

মৎস্য জীব হইতে সরীসৃপ জীবের উৎপত্তির পরিচায়ক
(Goggle-eyed Peliophthalmus)

করে। বহুকাল যাবৎ এই উষ্ণশোণিত তীর্যক জীবেরাই ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীর এই অংশের বরফ যুগ কাটিয়া যাওয়ায় পৃথিবীর অপর অংশ হইতে পলাতক সরীসৃপরা দলে দলে ফিরিয়া আসে। এই সরীসৃপ হইতে আত্মরক্ষার্থে কিংবা অন্য কোনও কারণে এই তীর্যক বা উচ্চ স্তন্যপায়ীরা নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। কেহ ছুটাছুটি করিয়া বা পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদের কেউ বা বৃক্ষে আশ্রয় লয়। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি পৃথিবীব্যাপী বরফ-যুগের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীর সকল অংশে ইহার প্রকোপ ছিল সমান। ফলে যাবতীয় অতিকায় সরীসৃপ মরিয়া যায়। সরীসৃপদের বিনাশের পর এই তীর্যক জীব বা উচ্চ স্তন্যপায়ীরা কিছুদিন একেবারে নিঃশত্রু ছিল। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ঘরোয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তদুপরি নানা প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত ত ছিলই। ইহার ফলে উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবগণ অতি উচ্চ স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়। তবে এই উন্নতি তাহারা একদিনে করেনি, একলক্ষ বছরেও নয়। আরও সময় লাগিয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গরু বা ঘোড়ার কথা বলা যাইতে পারে। গরু বা ঘোড়ার প্রথমে ক্ষুর ছিল না। উহাদের পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট চারিটি থাবা ছিল। এই সকল ছাগলাকার জীব গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করিয়া খাইত। কিন্তু এই সময় পৃথিবীতে আবার একটি বিপ্লব হয় এবং উহাতে অধিকাংশ গাছ মরিয়া গিয়া পৃথিবীর কয়েকটি অংশ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। গাছের পাতার বদলে তখন তাহাদের ঘাস খাইয়া বাঁচিতে হয়। ফলে তাহাদের দাঁত ত বদলালই, পা-ও বদলাইয়া গেল। শত্রু ভয়ে ইহাদের একদল সর্বদাই ছুটিয়া বেড়াইত। ছুটার সুবিধার জন্য তাহাদের পাঁচটি অঙ্গুলি জুড়িয়া গিয়া প্রথমে

চারিটি ; পরে দুইটিতে দাঁড়ায়, ঠিক গরুর মতন। গরুর খণ্ডিত বড় ক্ষুর ও উহার উপরকার দুইটি ছোট ক্ষুর ইহা প্রমাণিত করিবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল তাহারা গরু ছাগল প্রভৃতি হইয়া রহিল, কিন্তু উহাদের একটি দল পুরুষানুক্রমে একটি অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করায় ঐ একটি অঙ্গুলি ব্যতীত বাকি অঙ্গুলিগুলি তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই বিশেষ জীবকেই আমরা একশফ বা এক ক্ষুরো অশ্বজীব বলিয়া থাকি। ঘোড়ার যে ক্ষুরটি অতি ব্যবহারের কারণে স্থূল হইয়া গিয়াছে মাত্র সেইটিকেই আজ আমরা দেখিতে পাই। এই সকল জীবগণ নখের উপর ভর দিয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করার ফলে এই নখগুলিই শক্ত ও মোটা হইয়া ক্ষুরে পরিণত হয়। এইজন্য প্রাচীন হিন্দুগণ বলিয়াছেন যে, নখজীবগণ ব্যাঘ্র, কুকুর আদি পঞ্চ নখ ও খরগোস আদি চতুর্নখ প্রভৃতি জীবের পূর্বপুরুষ এবং এই শফ জীবগণ এক-শফ বা ঘোড়া, দ্বিশফ বা গবয় ইত্যাদি এবং চতুর্শফ বা হাতী জীবের পূর্বপুরুষ। পণ্ডিতদের মতে হস্তী জীবের প্রথমে শুঁড় ছিল না, পরে অনুরূপ অপর এক কারণে উহাদের শুঁড়ের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে বৃক্ষ সহসা উচ্চ হইতে থাকায় উহারা তাহাদের নাসিকাটি ক্রমাগত বাড়াইয়া শুঁড় তৈয়ারী করিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ মাটি খুঁড়িয়া আমরা পূর্বকালীন বে-শুঁড় হাতির ও পাঁচ, চার ও তিন থাবাযুক্ত ঘোড়ার প্রশীল-কঙ্কাল আজও পাইয়া থাকি। এই সকল উচ্চ স্তন্য-পায়ীদের কয়েকটি দল নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে ও খাইতে থাকে। এই কারণে তাহাদের দাঁত ও মুখ বদলাইয়া যায় এবং যাহারা আত্মরক্ষার্থে ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহারা গণ্ডার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দুর্বল জীবরা কিন্তু অন্য উপায়ে

আত্মরক্ষা করিতে থাকে। তাহারা নিরামিষাশী থাকিলেও পলাইবার জন্য পায়ের জোর বাড়ায়, কেহ বা ধারাল দাঁত বা শিং তৈয়ারী করিয়া লয়। এই কারণে বাঘ, সিংহ, হরিণ, মহিষ, গণ্ডার, খরগোস প্রভৃতি বহু জন্তু আমরা দেখিতে পাই। বস্তুত পক্ষে কিন্তু উহাদের সকলেরই উদ্ভব একই কোন জন্তুবিশেষ হইতে। একই ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, বংশানুক্রমে নানারূপে বদলাইয়া একই জীবগোষ্ঠী হইতে ঐ সকল বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হইয়াছে।

এই সকল তীর্যক জীবদের মধ্যে যাহারা বরফ-যুগের পর সরীসৃপদের ভয়ে বা অন্য কোনও কারণে গাছের উপর আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা অর্বাক জীবে পরিণত হইয়া যায়। যাহারা বসিয়া আহার করার ফলে খাদ্য উপর হইতে নিম্নে গ্রহণ করে তাহাদের বলা হয় অর্বাক জীব। এই পূর্বকালীন অর্বাক জীব হইতেই বানরের অনুরূপ জীবের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ ইহাদেরই দ্বিপাদ জীব বলিয়াছেন। এই দ্বিপাদ জীবগণ ছিল বর্তমানকালীন বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ। এক সময় অপর আর এক বিপ্লবের ফলে কয়েক স্থানে বন দূরীভূত হইয়া যায় এবং ইহার ফলে এই দ্বিপাদ জীবেরা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিতে বাধ্য হয়। মাটিতে নামার ফলে তাহাদের হাতের কাজ আর থাকে না এবং তাহারা পায়ে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। ডাল ধরিবার জন্য পা হাতের ন্যায় ব্যবহৃত না হওয়ায় উহা পুরাপুরি পা-ই হইয়া যায়। ইহা ছাড়া উহাদের লেজটিও অব্যবহারের জন্য ছোট হইয়া আসিয়া কয়েক সহস্র পুরুষ বাদে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। প্রমাণ-স্বরূপ দেহ-ব্যবচ্ছেদের পর মানুষের মেরুদণ্ডের শেষাংশে লেজের অবশিষ্ট অংশ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের অপর দুইটি পা হাতের ন্যায়ই ব্যবহার হইতে থাকে, ফলে উহারা যথাক্রমে মানুষে পরিণত হয়।

এই বিশেষ বিকাশ ধারার পরিচয়ই আমরা ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি। নিম্নে এই সম্পর্কীয় অপর আর একটি শ্লোক ব্যাখ্যা সমেত উদ্ধৃত করা হইল।

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্॥

এই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করিতে অভিলাষী হইলে তাহার হস্তদ্বয় বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ পদ-চতুষ্টয়ের দুইটি পদ হস্তরূপে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে হস্তের সৃষ্টি হয়। বিবিধ অসুবিধা দূর করণার্থে ইচ্ছা এবং তৎজনিত অভ্যাসই যে জীব সৃষ্টির কারণ তাহা ভাগবতে অন্যান্য রূপক শ্লোকেও বিবৃত করা হইয়াছে।

মানুষ সৃষ্টিই পৃথিবীর শেষ সৃষ্টি বলা যায় না। কারণ মনুষ্য-উকুন (Man's lice) নিশ্চয়ই মানুষ জন্মের পরে সৃষ্টি হইয়াছে। হয়তো এই মানুষ হইতে একদিন অতি মানুষের সৃষ্টি হইবে। তবে এই বিবর্তন-বাদ হইতে একটি বিশেষ শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হই। এই শিক্ষাটি হইতেছে এই যে, পরিবর্তনশীল জগতের সহিত যাহারা খাপ খাওয়াইয়া না লইতে পারে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই বন্য-মানুষ হইতে আদিম মানুষ এবং আদিম মানুষ হইতে বর্তমান সভ্য মানুষের সৃষ্টি হইতে যেমন আমরা দেখিয়াছি তেমনি বহু পিছনের মানুষকে আগাইয়া আসিয়া সম্মুখের মানুষদের পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। পৃথিবীর পরিবর্তন বিরোধী মানুষ মাত্রকেই আমি এই সম্পর্কে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিব।

এই ক্ষেত্রে অপর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুষ্পের অপরূপ রূপ কি কেবলমাত্র মক্ষিকাকে আকৃষ্ট করিবার

জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। অশ্বকুল কি সত্য সত্যই মনে-প্রাণে চাহিয়াছিল যে তাহাদের পাঁচটি খুর একে একে লুপ্ত হইয়া একটি মাত্র ক্ষুরে পরিণত হউক? কিন্তু যতদূর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রতীত হইবে প্রাকৃতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাদের নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য-মূলক ইচ্ছা (Purpose) এই সকল বিবর্তনের মধ্যে স্থান পায় নি। তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঈশ্বর বলিয়া কোনও ব্যক্তি বা বস্তু কি আছে যাহার ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি তাহা যুগ যুগ ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণও দিতে পারেন নি। ইহার উত্তর পৃথিবীতে দিতে পারেন একমাত্র ভারতীয় দার্শনিক মহাপুরুষগণ। আমি বিশ্বাস করি এইরূপ বহু মহাপুরুষ পূর্বের ন্যায় আজও ভারতবর্ষে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার অধিকার আমি আজও প্রাপ্ত হইনি, তাই এই সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও আমি পারিনি। তবু আমি আশা করি, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো একদিন মিলিবে এবং সেইদিন পৃথিবীর সমুদয় মানুষ যা কিছু হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষ উপনিবেশিক জীবদের ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সুখে দুঃখে একটি অখণ্ড একক মানুষের ন্যায়ই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবে।

ওঁ তৎসৎ

গ্রন্থ-পঞ্জি

(১) ঋক, সাম, ও যজু এই ত্রয়ীবেদ এবং পরবর্তীকালে অথর্ব ঋষি সঙ্কলিত অথর্ববেদ। যজুর আরণ্যক, বৃহদারাণ্যক ইত্যাদি গ্রন্থ। বৈদিক উপনিষদ, যথা—ঈশা, কেন, কঠ, তৈত্তীরিয়, ঐতরেয় ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌশিতক। আর্য উপনিষদ, যথা—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ ও মৈত্রী ; এবং তৎসহ এই সকল গ্রন্থের কৌষিতকি, শ্রীমৎশঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণের প্রাচীন ভাষ্যসমূহ, ব্রাহ্মণ সামুতনিকা, বেদ প্রভৃতির সায়ন, শঙ্কর ও অন্যান্য মনীষীর প্রাচীন ভাষ্য এবং বাঃ সংহিতা, তৈং সংহিতা কর্মবিপাক ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ।

(২) সুশ্রুত, বৃদ্ধ সুশ্রুত, চরক, নিদান সুশ্রুত নাগার্জুন, পরিভাষা প্রদীপ, আত্রেয় সম্প্রদায়ের আয়ুর্বেদ গ্রন্থ, বনৌষধিদর্পণ ইত্যাদি ; কবিরাজ গঙ্গধার কৃত বৈদ্যগ্রন্থ, উয়ুনউল অম্বা ফিতুল কাতুল অৎবা প্রভৃতি আরব্য গ্রন্থ যাহাতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

(৩) রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু, বৃহৎ বিষ্ণু, মার্কণ্ড, অগ্নি, গরুড়, ভবিষ্য, পদ্ম, নিবন্ধধৃত বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড আদি বিবিধ পুরাণ, ভাগবৎ, মাধবচার্য কৃত ভাগবৎ তাৎপর্য এবং ভাগবতের দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় ভাষ্য ও টীকাসমূহ, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ।

(৪) পাণিনি, অমরকোষ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি অভিধান, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পাতঞ্জল মহাভাষ্য ও উহাদের প্রাচীন টীকা। বেদান্তদর্শন এবং উহার ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতি কৃত টীকা ও পদ্মবোধিনী টিপ্পনী, বিবিধ জ্যোতিষশাস্ত্র, বরাহমিহির ইত্যাদি মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্র, স্বরোদয়

প্রভৃতি যোগশাস্ত্র, বেদের শঙ্কর ও শায়ন ভাষ্য ও ভানুমতী টীকা, অনুসঙ্গপাদ, চণ্ডী ও গীতা এবং বৌদ্ধজাতক।

(৫) গজায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, হংসোপনিষদ, জৈন কবি উমাস্মতি রচিত তত্ত্বার্থিগম এবং হংসদেব রচিত গ্রন্থাদি—লাদায়ন ও দলভ্য রচিত গ্রন্থ ও ভাষ্য, মৃগপক্ষীশাস্ত্র, শৈণিকশাস্ত্রম্, সঙ্গীতদর্পণ, সঙ্গীত কল্পদ্রুম, শ্রীধর রচিত কিরণবলী টীকা, উদয়ন রচিত কণ্ডলী, ছান্দোগ্য প্রাপ্যতক চৈতন্যম—গুণরত্ন, তর্করহস্য দীপিকা জৈনমতম্ জয়ন্ত ন্যায়-মঞ্জুরী, অর্ণিকা ৭ ভূতচৈতন্যপশ্চ, মহামুনি প্রশস্তপদ, গৌরপাদ কৃত গৌর-পাদকারিকা, শ্রমদভাগবৎ প্রতিপাদ্য, জীবগোস্বামী (১৫৬০—৭০), পরমাত্ম সন্দর্ভ শঙ্করচার্য, তস্য গুরু গোবিন্দপাল, তস্য গুরু গৌরপাদ কৃত ভাষ্যসমূহ।

(৬) স্যার রাধাকান্ত দেব মহারাজা বাহাদুর কৃত শব্দকল্পদ্রুম, নগেন্দ্র বোস কৃত বিশ্বকোষ, শ্রীযামিনীভূষণ রায় কৃত বিষতন্ত্রম্, পণ্ডিত কালীপদ বেদান্তবাগীশ কৃত পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শন, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ কৃত সুশ্রুত সংহিতের ব্যাখ্যা, শ্রীএকেন ঘোষের প্রবন্ধসহ হরপ্রসাদ লেখমালা।

(৭) অপরাপর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও পুঁথি যাহাদের উল্লেখ পুস্তকের আখ্যান ভাগে করা হয়েছে।

(৮) Animal Kingdom by J, Stuart Thomron M. Sc, Ph. D, F. R. S. E ; Zoology by Parker and Haswell, Science of life, Edited by H. G. Wells and others. Evolution by Lull ; A Picture Book of Evolution by C. M. Beadnell C. B., K. H. P., M. R. C. S. (Eng.) ; Animal Psychology, By Mangaret Osborn, Animals and men by David Katz, Social Behaviour in Animal by N. Tinbargem, Books on History of Biology by A.

Locy Ph, D., Sc. D. and others, similar other Books on Zoology published in Europe and America in defferent periods, Positive Science of the Hindoos by Dr. Brojendra Nath Seal Ph. D., Books on Sociology by Dr Binoy Sarkar.

(৯) প্রাণী-বিজ্ঞান ও উহার ইতিহাস সম্পর্কীয় অপরাপর গ্রন্থ যাহাদের নাম পুস্তকের আখ্যান ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে ।

(১০) Bell. J. C. 1906, The Reactions of the cray-fish, Harvard, Psych. Studies, Vol. 2. p. 915.

1910, Neue Untersuchungen uber den Lichtsinn bei wirbellosen Tieren. Bd. 136. S. 282.

(১১) Mc. Cook, H. C., 1889—1893. American Spiders and Their Spinning Work, 3 Vols.

Pritchett, A. H. 1904, Hearing and Smell in Spiders. Am. Nat, Vol. 88, p. 859.

1894, Zur. Physiologie und Psychologie der Actinien, Bd, 59, S, 415.

1892 Der Geschmacksinn der Actinien, Zool. Anz. Bd. 15, S. 334.

(১২) 1894, Zur physiologie und Phychologie der Actinien, Bd. 59, S, 415, 1892. Der Geschmacksinn der Actinien, Zool. Anz, Bd. 15, S, 334.

(১৩) 1895, Vebes die Schallper caption der Fische, pfluegers Arch, Bd. 61. S. 450.

1896, Ein weiterer versuch ueber der angeblicbe Horenlines, Glockenzeichens durch die Fishche, Ibid, Bd. 63, S. 581.

(১৪) The sense of taste has for its special taste buds,

similar in general character to the end buds in the skin and composed of narrow rod-shaped cells. In fishes these are widely distributed in the mouth, bronchial cavities and on the outer surface of the head and in some fishes over almost the whole surface of the body.—Zoology by Parker and Haswell.

(১৫) These fishes become strikingly bluish on blue ground, greenish on green ground and so forth, adapting themselves to blue, green, yellow, orange pink and brown and less successfully to red. The colour-changes are brought about by certain pigment-controlling mechanism in the skin which are connected with the sympathetic nervous system. But the colour stimulus acts through its effect on the eyes : the changes do not occur if the eyes are covered......if one eye is on the black ground and the other on the white ground, the skin becomes grey.—Animal mind.

(১৬) Ordinarily we mean when we say that an animal is sensitive to difference in wave length that such stimuli play a role in the adjustment of the animal to food, sexual objects, sheltre, escape from the enemies etc. i. e. that such stimuli initiate actively in arcs which end "in the striped muscles." Because the changes of colour are produced not by such arcs, but by the sympathetic nervous system, Weston thinks colour vision not produced.—Animal mind.

(১৭) 1818, Sur les Sensations des insectes, Recneil, Zool. Suisse, T. 4. No. 2.

1914, McIndoo, N. E. The Olfactory Sense of the Honey Bee, Jour, Exper. Zool. Vol. 16, p. 265.

1914, The Olfactory Sense of the Hymenoptera, Proc. Nat Acad, Sci., Philadelphia, April, 1914.

1914. The Olfactory Sense of Insects, Smithsonian Misc. Col., Vol. 63. P. I.

(১৮) 1889, Ueber die Empfindlichkeit einiger Meerthieregegen Riech-stoffe, Biol, Cent., Bd. 8. S. 743.

(১৯) 1818. Sur les Sensation des insectes. Recneil Zool, Suisse, T. 4. No. 2.

(২০) 1903, The Instincts, etc,, III. Auditory Reactions of Frog. I bid, Vol. 1. p. 627.

(২১) 1908, Untersuchungen ueber die Ausdehnung des pupillomotorisch wirksamen Bezirkes der Netzhaut und ueber pupillo motorischen Aufnahmsorgane. Ibid. Bd. 58, S. 182.

Breed, F. S. 1911. The Development of Certain Instincts and Habits in Chicks, Behav. Monographs, Vol. 1. No. I. Serial No. 1.

1912. Reactions of Chicks to Optical Stimuli, Jour. Animal Behav. Vol. 2. p. 280.

(২২) (a) "Breed using coloured screens through which colour passed and offering a 'choice of passages differently illuminated obtained evidence of colour discrimination in the chick."

(b) For days, Hess found that the makinal effect was produced by the yellow rays for the towls by the yellow green.—"Animal Mind".

(২৩) মহাবোধি সোসাইটী হলে প্রদত্ত কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার শ্রীযুত হরিসাধন ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহারিক ধর্ম-সম্পর্কীয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তৃতা। এই বক্তৃতাতে হিন্দু শাক্ত-সম্প্রদায়ের দেবী পূজার কয়েকটি প্রাচীন মন্ত্রের উল্লেখ তিনি করেছেন। এই মন্ত্রে দেখা যায় যে, জীবদেহের পঞ্চকোষ অর্থাৎ পাঁচ প্রকার কোষের (cell) কথা বলা হয়েছে ; যথা—ইন্দ্রিয়-কোষ (Sensory cell), জ্ঞান-কোষ (Brain cell) প্রভৃতি। উপরন্তু প্রতিটি কোষকে প্রাণ-কোষ বা প্রাণময় কোষরূপে ঐ সকল শ্লোকে বিবৃত করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল শ্লোক এই পুস্তকের মানসিক-বিভাগ এবং বীজ-বিজ্ঞান শীর্ষক অধ্যায়ের বিচার্য বিষয়ের অন্যতম প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।